যুব-সমস্যা

ও

তার শরয়ী সমাধান

আব্দুল হামীদ আল-মাদানী

সূচীপত্র

বিষয়	*পৃষ্ঠা*
ভূমিকা	২
প্রারম্ভিক কথা	৪
যুবক ও বেকারত্ব	১০
বেকারত্ব প্রসূত দুঃখ-জ্বালা	২২
যুবক এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও প্রগতি	২৯
যুবক ও পরিবেশ	৪৭
যুবক ও প্রচার-মাধ্যম	৬৪
যুবক ও শিক্ষা-ব্যবস্থা	৮০
যুবক ও অনুকরণ-প্রবণতা	৮১
যুবক ও বন্ধুত্ব	৯৯
যুবক ও খেলাধূলা	১১২
যুবক ও গান-বাজনা	১২২
যুবক ও যৌবন	১২৬
নজরবাজি	১২৮
যুবক ও নারী-প্রেম	১৩৪
প্রেম-রোগের চিকিৎসা	১৪৬
পবিত্র প্রেম	১৫৬
ব্যভিচার	১৫৮
ব্যভিচারের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ও ভয়ঙ্কক পরিণতি	১৬১
সমকাম	১৬৯
পশুগমন	১৭০
হস্তমৈথুন	১৭১
স্বপ্নদোষ	১৭৫
যুবক ও বিবাহ-সমস্যা	১৭৭
যুবক ও মনের আঁধার	১৮০
তকদীরে হয়রান	১৮১
যুবক ও অন্ধ-গোঁড়ামি	১৮৫
পরিশিষ্ট	২০০

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

প্রত্যেক জাতির জন্য তার যুব-সমাজ হল সকল প্রগতি ও উন্নয়নের প্রধান স্তম্ভ। যুব-সমাজই হল জাতির মেরুদন্ড, জাতির ভবিষ্যৎ এবং আগামী দিনের আশার আলো।

যুব-সমাজ হল জাতি ও উম্মাহর গর্ব। যে যুবক আল্লাহর দ্বীনের আলোকে আলোকপ্রাপ্ত, কিতাব ও সুন্নাহ-ভিত্তিক ইসলামী চরিত্রে চরিত্রবান, পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রগতিশীল। এমন উন্নত যুবককে নিয়েই উম্মাহ গর্ব করে।

জীবনে সব শ্রেণীর মানুষেরই সমস্যা আছে। সমস্যা আছে যুবক ও তরুণ-সমাজের। সে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে অনেক যুবকই ঘায়েল হয়ে পড়ে। অথচ সমস্যা যতই জটিল হোক না কেন, চেষ্টা ও পথ জানা থাকলে তার সমাধান সহজ হয়ে যায়। ইসলাম হল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে আসা মানুষের জন্য এক পূর্ণ জীবন-বিধান; যাতে আছে জীবনের সব ধরনের সমস্যার সমাধান।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, অজ্ঞানতা অথবা খেয়াল-খুশীবশে বহু যুবক মনে মনে এই ধারণা পোষণ করে যে, জীবনের এটাই হল আনন্দের মুহূর্ত। এ সময়টাই হল স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ লুটার সময়। এরপরে বার্ধক্য এসে পড়লে জীবনের আর কোন স্বাদ ও সাধ অবশিষ্ট থাকবে না। অতএব এ সময় আমোদ-আনন্দ করে নিয়ে বৃদ্ধ হলে আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য করা যাবে এবং যৌবনকালের সকল বিষয়ের ক্ষতিপূরণ করে দেওয়া যাবে।

অথচ এমন চিন্তাধারা প্রকৃতত্ব থেকে বহু ক্রোশ দূরে। কারণ মহান সৃষ্টিকর্তার আনুগত্যময় জীবনেই প্রকৃত আনন্দ নিহিত আছে। কেউ তা মানুক, চাহে না মানুক।

দ্বিতীয়তঃ এ জীবনের কোন বিকল্প নেই, কোন পরিবর্ত নেই। এ সময় যে আবার ফিরে আসবে তা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

'যৌবন বসন্ত-সম সুখময় বটে,
দিনে দিনে উভয়ের পরিণাম ঘটে।
কিন্তু পুনঃ বসন্তের হয় আগমন,
ফিরে না ফিরে না কভু, ফিরে না যৌবন।'

এ বয়সের যে মূল্য, মান ও মর্যাদা আছে, তা জীবনের অন্য কোন বয়সে নেই। এ জন্যই কিয়ামতের মাঠে লোকেদের অবস্থা যখন সঙ্গিন হবে এবং প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার দূরের সূর্য মাথার উপরে মাত্র এক মাইল দূরে এসে উপস্থিত হবে, তখন মহান আল্লাহ কয়েক শ্রেণীর মানুষকে সম্মানের সাথে তাঁর আরশের নীচে ছায়া দান করবেন। এদের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ হবে সেই যুবকদল, যারা তাদের যৌবনকাল আল্লাহর আনুগত্যে অতিবাহিত করেছে। *(বুখারী ৬৬০, মুসলিম ১০৩১ নং)* সুতরাং ইলাহী এ পুরস্কারের কাছে পার্থিব যে কোনও সুখ ও সম্পদ অতুলনীয়।

তৃতীয়তঃ মানুষ কাল কিয়ামত কোর্টে তার আয়ু ও যৌবনকাল কোথায় কিভাবে অতিবাহিত করেছে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। তাহলে যে ব্যক্তি তার যৌবনকালকে আল্লাহর অবাধ্য থেকে রঙ্গরসে কাটিয়ে দেবে, সে ব্যক্তি ঐ জিজ্ঞাসার উত্তরে কি বলবে?

চতুর্থতঃ মানুষের যৌবনকাল হল শক্তি, সামর্থ্য, সজীবতা, উদ্যম ও কর্মোদ্যোগের সময়কাল। এই সময়কাল অতিবাহিত হলে মানুষ ধীরে ধীরে দুর্বলতার দিকে ঢলে পড়ে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ, যিনি তোমাদেরকে দুর্বলরূপে সৃষ্টি করেন, দুর্বলতার পর তিনি শক্তি দেন, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।" *(সূরা রূম ৫৪ আয়াত)*

সুতরাং এ কথা কোন জ্ঞানী বলতে পারে না যে, শক্তি ও সজীবতার অবস্থায় অবহেলা করে দুর্বল ও বৃদ্ধ অবস্থায় সে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করবে।

পঞ্চমতঃ এ কথার নিশ্চয়তা কোথায় যে, যুবক অবশ্যই বৃদ্ধকাল পর্যন্ত সুস্থভাবে বেঁচে থাকবে। কারণ, এমনও তো হতে পারে যে, সে যুবক অবস্থাতেই কোন ব্যাধি অথবা দুর্ঘটনা-কবলিত হয়ে ইহজগৎ চিরদিনের মত ত্যাগ করে যাবে।

অতএব জ্ঞানী যুবকের উচিত হল, মহানবী ﷺ এর এই উপদেশ ঘাড় পেতে মেনে নেওয়া। তিনি বলেন, "পাঁচটি জিনিসের পূর্বে পাঁচটি জিনিসকে গনীমত (অমূল্য সম্পদ) জেনে কদর করো; তোমার মরণের পূর্বে তোমার জীবনকে, তোমার অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে, তোমার ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসর সময়কে এবং তোমার দারিদ্রের পূর্বে তোমার ধনবত্তাকে।" *(আহমাদ, কিতাবুয যুহদ, হাকেম, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে ১০৭৭ নং)*

ইসলাম ও মুসলিমদের দুশমনরা বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যম ও চিত্তবিনোদনমূলক কেন্দ্র ও যন্ত্রের মাধ্যমে যুব-সমাজকে এমন মাতিয়ে রেখেছে যে, উক্ত কদর করার মত ফুরসৎ তাদের নেই। নেই কিছু ভেবে ও বিবেক করে দেখার মত এতটুকু অবসর। ঐ সবের মাধ্যমে ওরা তাদেরকে পুনঃ পুনঃ এমন আফিং খাইয়ে ফেলছে যে, চৈতন্যপ্রাপ্ত হওয়ার সুযোগটুকুও নেই। এই সংকট-মুহূর্তে প্রয়োজন আছে প্রতিকার ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার। তাদের জীবন ও যৌবনে সৃষ্ট নানা সমস্যার শরয়ী সমাধান দানের।

আমাদের উলামা ও চিন্তাবিদ্গণ যে এ প্রয়োজন দূর করার কাজে পিছিয়ে আছেন তা নয়। এ মর্মে তাঁরা বহু কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁদের সেই সাগরের দিকে বেগবান্ আমার চেষ্টার এ এক ক্ষুদ্র নদী। আল্লাহর কাছে আশা এই যে, তিনি যেন এ নদীর পানি দ্বারা যুব-সমাজের পিপাসিত হৃদয়সমূহকে পরিতৃপ্ত করেন এবং তাদের জীবনের সকল সমস্যাকে দূর করে দিয়ে নিজের পথে টেনে নেন। আমীন।

বিনীত-
আব্দুল হামীদ ফাইযী
আল-মাজমাআহ
সঊদী আরব
১৩/৩/১৪২১হিঃ ১৫/৬/২০০০খ্রীঃ

প্রারম্ভিক কথা

মানুষ তার প্রকৃতিগত সৃষ্টিবৈচিত্রে পর্যায়ক্রমে যে সব জীবন লাভ করে থাকে তন্মধ্যে শৈশব ও কৈশর জীবনটাই সব চাইতে নির্মল ও বিঘ্নহীন। শিশুকিশোর মনে পিতা-মাতার স্নেহাশিস্ সুখের ঢেউ তোলে। পিতামাতার সর্বপ্রকার সুখ ও সমৃদ্ধিই তার হৃদয়-কুসুমকে দোলা দেয়। এ সময়কার সকল ভূত-ভবিষ্যৎ ন্যস্ত থাকে অভিভাবকের উপর।

অবশ্য এর পরবর্তী জীবনই হল বড় মধুর, বড় তিক্ত, বড় সুখময়, বড় জ্বালাময়। বড় কোমল, বড় কঠিন। বড় চাঞ্চল্যময়, বড় চিন্তাময়। এ পর্যায়ে এসে তরুণ মন সকল প্রকার, শৃঙ্খল এড়াতে চায়। ছিন্ন করতে চায় সকল বন্ধন। যৌবনের উন্মাদনার ঐ পাগলা ঘোড়া উল্লংঘন করতে চায় সকল বাধা-বিপত্তিকে। ছন্নছাড়া বাঁধন হারা হয়ে বিচরণ করতে চায়। লাগামহীন প্রবৃত্তির প্রবণতা। হাওয়ার তালে তালে দুলে ওঠা সমুদ্রের তরঙ্গমালার মত, ঝড়ো হাওয়ার ক্ষিপ্র গতির মত, বাদলা মেঘের পাগলা বারিপাতের মত, সুউচ্চ পর্বতের বাধাহীন জলপ্রপাতের মত বুকে এসে প্রতিহত হয় তারুণ্যের মনোবল, যৌবনের যৌনজ্বালা, তাজা শক্তির শৌর্য ও বীর্য।

'তুমি কে? তুমি মদোম্মত্ত মানবের যৌবন,
তুমি বারিদের ধারা জল মহাগিরির প্রস্রবণ।'

জীবনের এই পর্যায়ে বল্গাহীন পাগলা ঘোড়ার লাগাম জরুরী। এমন কুলকুল তান নদীর দুকুলে বাঁধ হওয়া আবশ্যিক। যৌবনের এ চাঞ্চল্যময় ক্ষিপ্র গতিকে নিয়ন্ত্রণ করা অবশ্যই দরকার। তা না হলে বিপদ অনিবার্য। পরিণাম বড় মন্দ।

মানুষের মন বড় মন্দপ্রবণ হলেও বৃদ্ধের তুলনায় যুবকের মন বড়ই সরল। বৃদ্ধের মনে যে কট্টর মনোভাব ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থাকে তা দূর করা ততটা সহজ নয়, যতটা সহজ একজন যুবকের মন থেকে তা দূর করা। সুতরাং জীবনের এ পর্যায়ে যুবক যে তরবিয়তী বিশেষ তালীম পাওয়ার যোগ্য তা বলাই বাহুল্য। যদিও এ উচ্ছৃঙ্খলতার যুগে এ কাজ ততটা সহজ নয়। মেনে নেওয়া ও মানানো উভয় কাজের ক্ষেত্রেই পরিবেশ আমাদের প্রতিকূলে। তবুও মানতে হবে, মানাতে চেষ্টা করতে হবে। হেদায়াত আল্লাহর হাতে। আর সহজ নয় বলেই কিয়ামতের সে ছায়াহীন প্রখর রৌদ্রতপ্ত প্রান্তরে এমন যুবক আল্লাহর ছায়ায় আশ্রয় পাবে, যে তার ঐ যৌবনকালকে আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে অতিবাহিত করে। সত্যই তো, যে রাজপথে চলে সে তার মত নয়, যে 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার' লংঘন করে উদ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হয়।

অবশ্য সংস্কার ও সংশোধনের পথে যেমন যুবগোষ্ঠীর নিজস্ব মন ও ঐকান্তিক আগ্রহ থাকা দরকার, ঠিক তেমনি আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা দরকার বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ সমাজের। নচেৎ মসজিদের ইমাম যুবক হলে যদি বৃদ্ধরা দূরে দূরে থাকে এবং বৃদ্ধ হলে যুবকদল তাঁর কাছ না ঘেঁসে, তাহলে অভীষ্ট ফল যে লাভ হবে না তা বলাই বাহুল্য। সমাজে বিভিন্নমুখী অবনতি ও অজ্ঞানতার অন্যতম মৌলিক কারণ হল, যুবক ও বৃদ্ধদের মাঝে ব্যবধান ও বিচ্ছিন্নতা। এই

বিচ্ছিন্নতার ফলে এককে অপরের মজলিসে বসতে দেখা যায় না। বয়োজ্যেষ্ঠরা যুবকদের পাপাচরণ দেখেও যেন হতবাক ও অক্ষম সেজে তাদেরকে তাতে বাধা দিতে সাহস করে না। তরুণদের সদাচরণ ও সংশোধনের ব্যাপারে তারা নৈরাশ্য প্রকাশ করে। যার ফলশ্রুতিতে বৃদ্ধের মাঝে যুবকদের প্রতি কেমন এক প্রকার বিদ্বেষ, বিরাগ ও বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয় এবং যুবক চাহে ভালো হোক অথবা মন্দ তার প্রতি কোনও ভ্রূক্ষেপও করে না। কখনো বা একটি যুবকের অসদাচরণ দেখে সমগ্র যুব-সমাজের উপর একই কুধারণা রেখে থাকে। ফলে প্রত্যেক যুবক ও তরুণের প্রতি তার মন ভেঙ্গে যায়। যার কারণে সমাজ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যুবক ও বৃদ্ধ একে অপরকে অবজ্ঞা, ঘৃণা, অশ্রদ্ধা ও অস্নেহ দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। আর এই মহা আপদ তখন গোটা সমাজকে গ্রাস করে ফেলে।

কিন্তু এই ব্যাধির প্রতিকার করতে যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলকেই সেই চেষ্টা রাখা উচিত, যাতে তাদের আপোসের উক্ত ব্যবধান ও বিচ্ছিন্নতা দূরীভূত হয়। আর সকলেই যেন এই বিশ্বাস রাখে যে, যুবক ও বৃদ্ধের মিলিত প্রচেষ্টায় গঠিত সমাজ একটি মাত্র দেহের ন্যায়; যার কোন এক অঙ্গ বিকল হলে সারা দেহ বিকল হয়ে যেতে পারে।

যেমন বৃদ্ধদের উচিত, যুবকদের ব্যাপারে তাদের কর্তব্য ও স্কন্ধে অর্পিত ভার সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং যুবকদের সদাচরণের ব্যাপারে তাদের হৃদয়ে ঘনীভূত নৈরাশ্যকে দূর করা। যেহেতু আল্লাহ তাআলা সকল বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান। কত পথভ্রষ্টকে তিনি সুপথ-প্রাপ্ত করেছেন। যারা অপরের জন্য সুপথের দিশারী ও সমাজ সংস্কারক রূপে পরিচিত হয়েছে। যুবকদেরও কর্তব্য, যেন তারা তাদের বৃদ্ধ ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি রাখে। তাদের মতামতকে সম্মানের চোখে দেখে, তাদের নির্দেশনা সাদরে গ্রহণ করে। যেহেতু বৃদ্ধরা দীর্ঘ জীবনের বহু ঘটনাঘটনের মাধ্যমে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে; যা যুবকরা করতে পারেনা। অতএব যদি নবীনদের উদ্যম ও শক্তির সাথে প্রবীণদের অভিজ্ঞতা ও হিকমত সংযুক্ত ও মিলিত হয় তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় সমাজ সাফল্য ও মর্যাদা লাভ করবে। *(মিন মুশকিলাতিশ শাবাব, ইবনে উসাইমীন ১৬-১৭পৃঃ)*

তরুণ ও যুবকদল সমাজের শক্তি ও বাহুবল। তরুণের উপরেই সন্নিবিষ্ট থাকে সমাজের বহু আশা, আকাঙ্খা ও ভরসা। যে কোন জাতিই তার যুবগোষ্ঠীকে নিয়েই গর্ব করে থাকে। জাতির অমূল্য সম্পদ তার যুবশক্তি। অতএব এমন সম্পদের অপচয় হতে দেওয়া কোন জাতিরই উচিত নয়। তাই বিশেষ করে এ অমূল্য সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বর্তায় দ্বীনের আহ্বায়ক ও সংস্কারকদের উপরে। উলামা সমাজ যুবশক্তির ব্যাপারে যত্নবান না হলে, সে শক্তির যে অপচয় ও অপব্যবহার হয়, বর্তমান জাতির অবস্থাই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সমাজ গঠনের প্রাথমিক স্তর থেকেই যুবগোষ্ঠী ও তার চিন্তাধারার উপর সমীক্ষা করা এবং তার মঙ্গলময় দিককে সমৃদ্ধি দান করা ও অমঙ্গলময় দিকের সংশোধন ও পরিবর্তনের চেষ্টা করা সমাজ সংস্কারকের সমুচিত কর্তব্য। যেহেতু আজকের কাঁচা যুবক আগামী কালের পুরুষ ও সমাজ। যুব সমাজ এমন এক ভিত্তি, যার উপর উম্মতের ভবিষ্যত প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাইতো শরীয়ত যুবগোষ্ঠীর প্রতি যত্নবান হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। যুবকের যুবাবস্থা সময়কালকে বড় মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছে। যেহেতু যুব সমাজ যদি সত্যের

উপর প্রতিষ্ঠিত হয়; যার উপর উম্মতের ভবিষ্যত প্রতিষ্ঠিত, তাহলে সমাজের প্রভূত কল্যাণের আশা করা যাবে। ঐ যুব সমাজের ধর্মনিষ্ঠা ও সুন্দর চরিত্রে উম্মতের জ্যোতির্ময় ভবিষ্যত উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এবং বর্তমানের প্রকৃত ও মুসলিম ও ওলামা সমাজের উপযুক্ত ওয়ারেস ও প্রতিনিধি হবে তারাই।

বর্তমান যুবসমাজের প্রতি যদি সমীক্ষ্য দৃষ্টিতে দেখা যায় তাহলে সাধারণভাবে পরিদৃষ্ট হবে যে, ঐ সমাজে তিন প্রকার যুবক রয়েছে, সত্যানুসারী ও ধর্মনিষ্ঠ, সত্য ও ধর্মত্যাগী, এবং এই দুয়ের মাঝে দোটানায় দোদুল্যমান যুবক।

ধর্মনিষ্ঠ ও সত্যানুসারী যুবক, যে কলেমা তওহীদের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখে, তার দাবী অনুসারে কাজ করে, ধর্মে প্রগাঢ় বিশ্বাসী ভক্তি ও প্রেমের সহিত আত্মসমর্পণকারী, ধর্মীয় অনুশাসনে সন্তুষ্ট, স্বধর্ম নিয়ে গর্বিত, ইসলামের অনুসরণকে যে চির কল্যাণ ও মুক্তিদাতা ভাবে এবং এই ধর্ম থেকে বহির্গত হওয়াকে যে চির ক্ষতিকর ও সর্বনাশী মনে করে।

যে যুবক আল্লাহকে বিশ্বাস করে; যিনি তার ও সমগ্র আকাশ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। যেহেতু সে আল্লাহর বহু নিদর্শন লক্ষ্য করে; যাতে তার নিকট আল্লাহর অস্তিত্বে কোন সন্দেহ ও দ্বৈধের অবকাশ থাকে না। সুতরাং সে এই বিস্ময়কর বিশাল জগতের সৃষ্টি-বৈচিত্র এবং তার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা-ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা করলে তার স্রষ্টার অস্তিত্বের, তাঁর পরিপূর্ণ বিজ্ঞান ও শক্তির এবং তাঁর মহা প্রকৌশলের স্পষ্ট দলীল ও প্রমাণ খুঁজে পায়। কারণ, এই বিশ্ব-জাহান অযাচিতভাবে আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়ে যায়নি। এই বিশাল বিশ্ব এক সুন্দর ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার অনুবর্তী। যে শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মের কোন পরিবর্তন ও বিবর্তন নেই। সারা বিশ্ব ঠিক সেই নিয়মেই চলছে, যে নিয়মে চলতে সৃষ্টিকর্তা তাকে আদেশ করেছেন। "কিন্তু তুমি আল্লাহর নিয়মের কোন পরিবর্তন পাবে না এবং আল্লাহর বিধানে কোন ব্যতিক্রমও দেখবে না।"*(কুঃ ৩৫/৪৩)* "দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবেনা; সুতরাং আবার তাকিয়ে দেখ কোন ত্রুটি দেখতে পাও কিনা? অতঃপর তুমি বার বার তাকাও তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ এবং ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে।" *(কুঃ ৬৭/৩-৪)*

সুতরাং যদি এ বিশ্বচরাচর সুশৃঙ্খল ও সুনিপুণ ব্যবস্থাযুক্ত হয় তাহলে তা কোনক্রমেই অযাচিতভাবে সৃষ্টি হতে পারে না। যেহেতু অযাচিতভাবে সৃষ্ট বস্তুর ব্যবস্থা-বিধানও অযাচিত হয়। যার ফলে যে কোন মুহূর্তে তাতে বিবর্তন ও বিশৃঙ্খলা ঘটে।

যে যুবক আল্লাহর সমূদয় ফিরিশ্তাকুলের উপর ঈমান রাখে। যেহেতু কুরআন ও সুন্নায় তাঁদের বিভিন্ন গুণাবলী, ইবাদত ও কর্তব্যাদি সম্পর্কে বহু বিবরণ এসেছে। অতএব তাঁদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

যে যুবক আল্লাহর সমূদয় রসূলের উপর এবং তাঁর অবতীর্ণ সমূহ আসমানী কিতাবের উপর বিশ্বাস রাখে। যেহেতু তা হল মানুষের সরল পথের দিশারী এবং এ ছাড়া মানুষ জ্ঞান, ইবাদত, অধিকার ও ব্যবহারের যাবতীয় বিস্তারিত বিষয়াবলীকে জানতে অক্ষম ছিল।

যে যুবক আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত সকল আম্বিয়া ও রসূলগণের প্রতি ঈমান রাখে। যাঁরা কল্যাণের দিকে আহ্বান এবং সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। যাতে তাঁদের আগমনের পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের যেন কোন

অভিযোগ না থাকে।

যে যুবক পরকালের (জান্নাত ও জাহান্নামের) অনন্ত জীবনের প্রতি বিশ্বাস রাখে। সেই হিসাবের দিন ও পুনরুত্থান-দিবস কিয়ামতকে বিশ্বাস করে; যেদিন আল্লাহ তাআলা সকলকে মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করবেন এবং নিজ নিজ কর্মফল প্রদান করবেন। "সুতরাং কেউ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তা সেদিন দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও সেদিন দেখতে পাবে।" *(কুঃ ৯৯/৭-৮)* যেহেতু সেটাই দুনিয়ার ফল। আর যদি এমন দিন সংঘটিত না হয়, যেদিন সৃষ্টি তার সৎকার্যের প্রতিদান এবং অসৎকার্যের প্রতিফল পাবে তাহলে এ জীবনের পশ্চাতে লাভ ও যুক্তি কি?

যে যুবক ভাগ্যের ভালো ও মন্দের প্রতি ঈমান রাখে; অর্থাৎ এই বিশ্বাস রাখে যে, জগতে যা কিছু ঘটে সবই আল্লাহর লিখিত নিয়তি অনুসারে ঘটে। বান্দার হক্কে মঙ্গল-অমঙ্গল সবই তাঁর নির্ধারিত। পরন্তু বান্দার এখতিয়ার, কর্মে হেতু ও তদবীর তথা তার প্রভাবের উপরেও বিশ্বাস রাখে এবং মানে যে, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য উভয়েরই কোন না কোন হেতু ও কারণ আছে।

যে যুবক একনিষ্ঠতার সহিত কেবলমাত্র শরীক-বিহীন এক আল্লাহর উপাসনা ও ইবাদত করে। যে যুবক তার সকল প্রকার কথা ও কাজে রসূল ﷺ এর অনুসরণ ও অনুকরণ করে, তিনি যা আদেশ করেছেন তা নির্দ্বিধায় পালন করে এবং যা নিষেধ করেছেন তা সন্তুষ্ট চিত্তে পরিহার করে। যে যুবক যথাযথভাবে নামায পড়ে। যেহেতু সে বিশ্বাস করে যে, ঐ নামাযে ইহলৌকিক-পারলৌকিক, ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনে অতিশয় মঙ্গল নিহিত আছে এবং তা পরিত্যাগ করায় ইহ-পরকালে বড় মন্দ পরিণাম আছে।

যে যুবক তার মালের যাকাত তার যথার্থ হকদারের প্রতি পূর্ণরূপে আদায় করে। কারণ, সে জানে যে, তাতে ইসলামও মুসলিমদের বহু প্রয়োজন পূর্ণ হয়। তাই যাকাত ইসলামের স্তম্ভসমূহের তৃতীয় স্তম্ভরূপে পরিগণিত হয়েছে।

যে যুবক রমযান মাসের রোজা পালন করে। শীত ও গ্রীষ্মে পানাহার ও যৌন-সম্ভোগ করা থেকে দূরে থাকে। যেহেতু সে জানে যে, আল্লাহর এই আদেশ পালনে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ হয়। তাই নিজের প্রবৃত্তি চাহিদার উপর তার প্রতিপালকের সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়।

যে যুবক (সামর্থ্যবান হলে) কাবাগৃহের হজ্জ পালন করে। যেহেতু সে আল্লাহকে ভালোবাসে, তাই তাঁর গৃহকেও ভালোবাসে এবং তাঁর করুণা ও ক্ষমার বিশেষ স্থানে উপস্থিত হয়ে ঐ স্থানে অন্যান্য আগত মুসলিমদের সহিত জামাআতে শরীক হওয়া পছন্দ করে।

যে যুবক আল্লাহ ও তাঁর গ্রন্থ, রাসূল, মুসলিমদের নেতা এবং মুসলিম সর্বসাধারণের জন্য হিতাকাঙ্খী হয়। উদার ও উন্মুক্ত মনে প্রত্যেক মুসলিমের সাথে সুব্যবহার করে। যার মাঝে কোন প্রকারের প্রবঞ্চনা, ধোকাবাজি, লুকোচুরি, কুটিলতা ও কপটতা নেই।

যে যুবক সজ্ঞানে ও সঠিক পদ্ধতি মতে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করে। মহান আল্লাহ বলেন, "তুমি (মানুষকে) হিকমত (বিশেষ কৌশল, যুক্তি বা প্রজ্ঞা) এবং সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর এবং ওদের সাথে সদ্ভাবে তর্কালোচনা কর।" *(কুঃ ১৬/১২৫)*

যে যুবক সৎকার্যের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজে বাধা দান করে। যেহেতু সে জানে যে, এতে সমাজ ও উম্মাহর শান্তি ও কল্যাণ নিহিত আছে । আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমরাই শ্রেষ্ঠ

উম্মত, মানব জাতির জন্য যার অভ্যুত্থান হয়েছে। তোমরা সৎকার্যের আদেশ দান করবে এবং অসৎকার্য করতে নিষেধ করবে, আর আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে।" *(কুঃ ৩/১১০)*

যে যুবক রসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত পর্যায়ক্রম অনুযায়ী অসৎকর্ম দূরীকরণে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা রাখে। তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ হতে দেখে তার উচিত, তা নিজের হাত দ্বারা অপসারণ করা (শক্তি প্রয়োগ করে বাধা দান করা।) কিন্তু তাতে অক্ষম হলে জিহ্বা দ্বারা (নসীহত ও প্রতিবাদ করে তা বন্ধ করা), যদি তাতেও অক্ষম হয় তবে অন্তর দ্বারা (ঘৃণা করা)। আর এ হল দুর্বলতম ঈমানের পরিচায়ক।"

যে যুবক সদা সত্য বলে, সত্য স্বীকার ও গ্রহণ করে। যেহেতু সত্য সততার প্রতি এবং সততা বেহেশ্তের প্রতি পথ প্রদর্শন করে। আর মানুষ সদা সত্য কথা বলতে থাকলে এবং সত্যবাদিতার চেষ্টা ও কামনা রাখলে আল্লাহর নিকট 'সত্যবাদী' বলে তার নাম লিখিত হয়ে থাকে।

যে যুবক মুসলিম জনসাধারণের জন্য সদা কল্যাণ কামনা ও পছন্দ করে, যেহেতু সে নবী ﷺ এর এ কথায় বিশ্বাসী, "তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার (মুসলিম) ভায়ের জন্য তাই পছন্দ করেছে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।"

যে যুবক আল্লাহর দ্বীন, মুসলিম উম্মাহ ও স্বদেশের মঙ্গলবিষয়ক দায়িত্ব স্বীকার ও পালন করে। তাই সর্বদা সেই প্রচেষ্টা ও প্রয়াসে থাকে, যাতে দ্বীন, উম্মাহ ও দেশের কল্যাণ লাভ হয়। আর এই মহান প্রচেষ্টায় তার কোন অহমিকা থাকে না এবং নিজের স্বার্থ কায়েম করতে গিয়ে অপরের স্বার্থে আঘাত হানে না।

যে যুবক আল্লাহর জন্য, আল্লাহরই কাছে সাহায্য ভিক্ষা করে, আল্লাহরই পথে জিহাদ ও সংগ্রাম করে। ইখলাস ও চিত্তবিশুদ্ধতার সাথে সংগ্রামে তার উদ্দেশ্য, লোক-প্রদর্শন, ব্যক্তিগত অথবা স্বজনগত কোন স্বার্থলাভ, অথবা সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন থাকে না। আল্লাহর নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করে, কোন প্রকার আত্মগর্ব প্রকাশ না করে, শক্তি ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর ভরসা ও নির্ভর না করে, দ্বীনের আওতাভুক্ত কোন কিছুতে অতিরঞ্জন অথবা অবহেলা না করে দ্বীন ও জাতির প্রয়োজন অনুপাতে জিহ্বা, কলম, হস্ত, জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে।

যে যুবক ধর্মভীরু ও সদাচারী। যে চরিত্রে সভ্য, ধর্মে অটল, মনে উদার, ব্যবহারে বিনয়ী ও ভদ্র, আত্মমর্যাদায় সম্ভ্রমশীল, হৃদয়ে সুন্দর, দ্বীনের দাওয়াতে সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল এবং জ্ঞানী ও দূরদর্শী, যে সুযোগের সদ্ব্যহার করে এবং জ্ঞান ও সংস্কারের উপর আবেগ ও উত্তেজনাকে প্রাধান্য দেয় না।

যে যুবক মিতাচারী, সময় ও নিয়মানুবর্তী, কৌশল, হিকমত ও দূরদর্শীতার সাথে, নিপুণতা ও শৃঙ্খলতার সহিত প্রতি কাজ করে। তার জীবনের কোন অবকাশকে নিজের অথবা সমাজের কোন উপকার ব্যতীত বিনষ্ট করে না।

এই যুবক যেমন তার দ্বীন, চরিত্র ও ব্যবহারের সুরক্ষা করে তেমনি তার প্রতিকূল প্রত্যেক চিন্তা, মতবাদ, নাস্তিক্য, দুষ্ক্রিয়া, পাপাচার, চরিত্রহীনতা ও দুর্ব্যবহার থেকে সুদূরে থাকে।

সুতরাং এই শ্রেণীর যুবক দল উম্মতের গর্ব এবং তার দ্বীন, সমৃদ্ধ জীবন ও সৌভাগ্যের সংকেত। সেই যুবকদল; যাদের জন্য আল্লাহর নিকট আমরা আশা রাখি যে, তিনি তাদের

মাধ্যমে মুসলিমদের বিকৃত অবস্থার সংস্কার ও সংশোধন সাধন করবেন এবং সেই যুবকদলই ইহ-পরকালে বড় সৌভাগ্যবান হবে।

দ্বিতীয় প্রকার যুবক, যে বিশ্বাসে ভ্রান্ত, চরিত্রে ভ্রষ্ট, আত্মগর্বী, নোংরামী ও অশ্লীলতায় নিমজ্জিত। যে অপরের নিকট হতে সত্য গ্রহণ করে না এবং বাতিলকে বাতিল বলে স্বীকার ও তা পরিহার করে না। যে ব্যবহারে অহংকারী; যেন সে দুনিয়ার জন্য এবং দুনিয়াটা তারই জন্য সৃষ্টি হয়েছে।

যে যুবক স্বেচ্ছাচারী ও উদ্ধত; যে ন্যায় ও সত্যের কাছে বিনয়ী নয়, অথচ অন্যায় ও বাতিলের একান্ত অনুগত।

যে যুবক আল্লাহর অধিকার এবং সৃষ্টির কত অধিকার বিনষ্ট করে, পরন্তু তার মনে কোন পরোয়া নেই। যেহেতু পরকাল ও হিসাবের প্রতি তার দৃঢ় অথবা মোটেই বিশ্বাস নেই।

যে যুবক সমাজে বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ সৃষ্টিকারী, বিবেক ও চিন্তায় ভারসাম্যহীন, চরিত্রে বিকারগ্রস্ত, ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণহারা, লাগামছাড়া।

যে যুবক নিজের অভিমত নিয়ে গর্বিত। যেন সত্য কেবল তারই রসনায় নিঃসৃত হয়। তাই সে যেন নিজের কাজে পদস্খলনমুক্ত এবং অন্য কেহ পদস্খলন ও ভ্রান্তিগ্রস্ত, যেহেতু তাদের রায় তার রায়ের পরিপন্থী।

যে যুবক ইসলামের সরল পথ থেকে বিচ্যুত, সামাজিক আচার অনুকরণ থেকে বৈমুখ এবং অধিকাংশে পাশ্চাত্য-সভ্যতায় প্রভাবিত। যার মন্দ কর্ম পরিশোভিত; যাকে সে উত্তম মনে করে থাকে। এমন যুবক স্বকর্মে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, যার পার্থিব জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, - যদিও সে মনে করে যে, সে সৎকর্ম করেছে।

এমন যুবক নিজের জন্য অশুভঙ্কর, সমাজের জন্য বালাই। যে সমাজকে অধঃপতনের অতল তলের দিকে টেনে নিয়ে যায়। যার কারণে উম্মাহর মান- মর্যাদা ও গৌরব উঠে যায়। এই শ্রেণীর তরুণ দল দুরারোগ্য সর্বনাশী মহামারীর জীবাণুর মত। অবশ্য আল্লাহ চাইলে কারো চিকিৎসা করেন এবং তিনি সর্ববস্তুর উপর সর্বশক্তিমান।

তৃতীয় প্রকার যুবক ঃ যে দুটানায় দোদুল্যমান, কর্মে যার দ্বৈধ থাকে। বিভিন্ন পথ ও মতের সম্মুখে সে হয়রান। যে যুবক সত্যের সন্ধান পায়, গ্রহণ করে সান্ত্বনিত হয় এবং আদর্শ সমাজে সে বসবাসও করে। কিন্তু অন্যদিকে তার জন্য মন্দের দুয়ার খোলা যায়, ফলে তার আকীদাহ ও প্রতীতিতে সন্দেহ জন্মে, চরিত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি আসে, কর্মে নানান কলঙ্ক দৃষ্ট হয়। পুণ্যের মহফিলে যোগদান করলেও পাপের আখড়ায়ও তার আসন থাকে। ইসলামী সমাজে থেকে অনৈসলামী সমাজের অনুকরণ করে। বাতিলের প্রবাহমান স্রোতে কখনো গা ভাসিয়ে দেয়। তাই সে মানসিক দিক দিয়ে অস্থির থেকে ঐ স্রোতে ঘুরপাক খেতে থাকে। কখনো বা ঐ গতির সামনে নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে হয়রান হয়ে ভাবতে থাকে; কি জানি এই নতুনত্বে ও আধুনিকতায় প্রকৃত সত্য নিহিত? নাকি সেই প্রাচীন মত ও পথে যার উপর বিগত সলফে সালেহীন ছিলেন এবং বর্তমানে আদর্শ সমাজ যার উপর প্রতিষ্ঠিত? যার ফলে সে সন্দিহান ও উদ্বিগ্ন থাকে, কখনো বা এটাকে সমর্থন করে কখনো বা ওটাকে।

এই শ্রেণীর যুবক দলের জীবন নেতিবাচক। এদের জন্য এমন এক শক্তিশালী আকর্ষক

হেদায়াতের প্রয়োজন; যার দ্বারা তারা সত্যের আঙিনা ও কল্যাণের পথে আকৃষ্ট হয়ে ফিরে আসে এবং তা খুবই সহজ হয় তখনই, যখন আল্লাহ পাক তাদের জন্য কোন প্রজ্ঞাবান সৎ ও বিশুদ্ধ নিয়তে ইসলামের প্রতি আহ্বানকারী আলেমকে নির্বাচিত করে দেন।

এই শ্রেণীর যুবক তারাই অধিক হয়ে থাকে; যারা কিছু ইসলামী সভ্যতায় সভ্য হয়েছে, কিন্তু তার সাথে অন্যান্য পার্থিব ইলম (জেনেরাল এডুকেশনে)ও শিক্ষিত হয়েছে; যে ইলম ও শিক্ষা প্রকৃতই ইসলাম পরিপন্থী অথবা তাদের ধারণা মতে পরস্পর-বিরোধী। যার ফলে দুই সভ্যতার সামনে তারা হয়রান ও বিমূঢ় হয়ে পড়ে।

অবশ্য এই ধাঁধা, আকর্ষণ ও বিমূঢ়তা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব; যদি তারা ইসলামী সভ্যতাকে জীবনাদর্শে মূলীভূত করে এবং মুখলেস ওলামাদের কাছে ঐ সভ্যতাকে তার আসল উৎস কুরআন ও হাদীস থেকে চয়ন করে। আর তা তাদের পক্ষে দুরূহ ও নয়। *(মিন মুশকিলাতিশ শাবাব, ইবনে উসাইমীন ৬-১৪ পৃঃ দ্রঃ)*

যুবক ও বেকারত্ব

যুবকের পথ-বিচ্যুতির কারণ এবং তার জীবনের সমস্যা একাধিক ও বিভিন্ন। যেহেতু যুবক অবস্থায় মানুষের দেহ, চিন্তাশক্তি ও জ্ঞানের অধিকতর ক্রমোন্নতি হয়ে থাকে এবং এই সময়ই তার অভ্যুদয়ের সময়। যাতে তার বিভিন্ন পরিবর্তন ও বিবর্তনের শীঘ্র প্রসার লাভ হয়। তাই এই অবস্থায় সরল পথে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য তার প্রয়োজন হয়, হৃদয়াত্মাকে দমন ও তার ছুটন্ত ঘোড়াকে বল্গাধীন করার জন্য বিশেষ উপকরণ এবং প্রজ্ঞাময় প্রশিক্ষণ ও পথ প্রদর্শনের।

এই অবস্থায় যুবক বিভিন্ন কারণে পথচ্যুত ও ভ্রষ্ট হয়। তবে এই ভ্রষ্টতার বিশেষ মারাত্মক কারণ সমূহের এক কারণ হল, অবসর ও বেকারী। কর্মহীনতা এক সর্বনাশী ব্যাধি; যা চিন্তাশক্তি, জ্ঞান এবং দৈহিক শক্তিকে ধ্বংস করে। যেহেতু আত্মার জন্য কোন এক প্রকারের বিচরণ বা কর্ম একান্ত জরুরী। কিন্তু তা যদি একেবারেই শূন্য হয় তাহলে চিন্তাশক্তি নিস্তেজ, বুদ্ধি স্থূল এবং আত্মার বিচরণ দুর্বল হয়ে যায়। আর তারপরই কুচিন্তা ও কুমন্ত্রণা অন্তরকে সমাচ্ছন্ন করে ফেলে। কখনো বা এই কর্মহীনতা-জনিত মানসিক পরাজয়ের কারণে মানুষের মনে নানান কুবাসনা, কুকল্পনা ও মন্দ ইচ্ছার জন্ম হয়।

এই সমস্যার সমাধানকল্পে যুবকের উচিত, নিজের জন্য উপযুক্ত কোন কাজ বেছে নিতে চেষ্টা করা, অধ্যয়ন বা অন্য কোন ব্যবসায়ের মাধ্যমে মন ও মস্তিষ্ককে ব্যাপৃত রাখা। যাতে মন্দ কামনা ও কল্পনার পথে বিশেষভাবে বাধা পড়ে। আর এই প্রচেষ্টায় সে সমাজের এক কলঙ্কহীন অঙ্গ হয়ে জীবন ধারণ করতে পারবে এবং নিজের ও সমাজের জন্য একজন কাজের মানুষ হওয়া অত্যাবশ্যক মনে করবে। *(মিন মুশকিলাতিশ শাবাব, ইবনে উসাইমীন ১৬পৃঃ)*

পক্ষান্তরে মুসলিমের জন্য কোন এমন এক সময় নেই যাকে 'অবসর' বা 'অবকাশ' বলা যায়। যার হৃদয়ে ঈমান ও ইসলাম স্থান পেয়েছে, মালাকুল মওত যাকে সঙ্গে নেওয়ার জন্য প্রহর গুনছেন, যার সঙ্গে আছেন দুই সম্মানিত ফিরিশ্তা -কিরামান কাতেবীন- যাঁরা তার

নেকী-বদী নোট করে যাচ্ছেন। সে ব্যক্তির কোন ফুরসত নেই, যার হৃদয়ে রয়েছে ঈমানের তাকীদ। সে জাতির কোন ফাঁকা সময় থাকতে পারেনা, যে জাতির আছে মহান লক্ষ্য। সে সমাজের জীবনের কোন সময় অবসর নামে অভিহিত হতে পারে না, যে সমাজের সমগ্র জীবনটার নামই ইবাদত। যে জাতি ও সমাজকে তাদের পরোয়ারদেগার বলেন, "আমি মানব ও দানবকে কেবলমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (*সূরা যারিয়াত*) সে মুসলিমের জীবনে অবকাশ বলে কোন বিরতি থাকতে পারে না, যে মুসলিম আল্লাহ বা তদীয় রসূলের একটা না একটা আনুগত্যের মাঝে কালাতিপাত করে। যার চিন্তা, গবেষণা, পানাহার, নিদ্রা, জাগরণ, ভ্রমণ, বিচরণ, যাওয়া, আসা, প্রভৃতি সবকিছুই ইবাদত। নিয়ত বিশুদ্ধ হলে এবং আনুগত্যের সততা প্রমাণিত হলে মুসলিমের জীবন-মরণ সবটাই ইবাদতে পরিণত হয়। "বল, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সেই মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য।" *(সূরা আনআম ১৬২ আয়াত)*

সে বান্দার জীবনে আর খালি সময় কোথায়; যার প্রভু ঘোষণা করেছেন, "অতএব যখন অবসর পাও, তখন পরিশ্রম কর এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ কর।" *(সূরা ইনশিরাহ ৭-৮ আয়াত)* সে জাতি অবসর আর কোত্থেকে পেতে পারে, যার সারা জীবনটাই হল জিহাদে পরিবেষ্টিত। এই জীবন-সংগ্রামে বিরতি কোথায়? আর বিরতি ও বিশ্রাম নিলে শত্রু (শয়তান ও ধর্মদ্রোহীর) হাত থেকে নিস্তার কোথায়?

সে জাতির আর বিরতির সময় কোথায়, যে জাতি লম্বা সফরে পথ হেঁটে চলেছে? চলেছে অবিরামভাবে বেহেশ্তের পথে, তার সেই প্রথম ও আসল ঠিকানা এবং প্রিয় চিরস্থায়ী আবাসস্থলের দিকে।

প্রেমের পরিধি যতই বৃদ্ধি পাক্ না কেন, প্রেমের পাত্র যত বেশীই হোক না কেন, আসল ও প্রকৃত প্রেমের টান থাকে সেই প্রথম প্রেমিকের প্রতি। তুলনায় তার তুল্য পরবর্তীকালের আর কেউ অধিক প্রিয় হতে পারে না। মানুষ যত দেশেই যাক, যেখানেই বাস করুক এবং যত সুখেই থাকুক না কেন, তবুও মনের টান থাকে তার সেই প্রথম দেশ, পরিবেশ ও মাতৃভূমির প্রতি। মানুষের প্রথম দেশ ও বাসস্থান হল জান্নাত। তাকে ফিরে যেতে হবে তার আপন দেশে। কিন্তু বিদেশে বের হয়ে সে ডাকাত শয়তানের দলবলের হাতে বন্দী, অথবা তাদের কাছে লুণ্ঠিত হওয়ার আশঙ্কা পদে পদে। তাই তো সন্দেহ হয় যে, সে নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে স্বদেশে ফিরে যেতে পারবে কি না? এমন আশঙ্কাময় পথে বিরতির সময় কোথায়? প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি গভীর রাত্রিকে ভয় করে, সে ব্যক্তি যেন সন্ধ্যা রাত্রি থেকেই সফর শুরু করে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যা রাত্রি থেকেই চলতে লাগে সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায়। সাবধান! আল্লাহর পণ্য বড় আক্রা। শোনো! আল্লাহর পণ্য হল জান্নাত।" *(সহীহ তিরমিযী ১৯৯৩নং)*

সে জাতির জীবনে অবসর কোথায়, যে জাতির জান-মালকে মহান আল্লাহ বেহেশ্তের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন?

স্বর্ণ-রৌপ্য, মনিমুক্তা, হীরে-কাঞ্চন যাই বলি না কেন, সময়ের তুল্য কোন অন্য মূল্যবান ধাতুর মূল্য নেই। সময়ের সে মূল্য মানুষ সেদিন অনুভব করবে, যেদিন হবে তার জীবনের শেষ দিন। যেদিন সে নিরস্ত ও ক্ষান্ত হয়ে সময় অপচয় করার ভুল বুঝতে পারবে আর বলবে,

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছু দিনের জন্য অবকাশ দিলে আমি দান-খয়রাত করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্গত হতাম। কিন্তু নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে আল্লাহ কাউকে কোন অবকাশ দেন না।" *(সূরা মুনাফিকূন ১০-১১ আয়াত)* তখন হবে শত আফশোষ; যখন আফশোষ কোন কাজে দেবে না।

তখনই মানুষ সময়ের মূল্য বুঝতে পারবে, যখন "অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে অধোবদন হয়ে বলবে, 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা দেখলাম ও শুনলাম। এখন তুমি আমাদেরকে পুনরায় (পৃথিবীতে) পাঠিয়ে দাও, আমরা এবারে সৎকাজ করব, আমার এখন দৃঢ় বিশ্বাসী।" *(সূরা সাজদাহ ১২ আয়াত)* কিন্তু তখনকার সে বিশ্বাস কোন কাজে দেবে না।

অলস লোকেদের জন্য দিন বড় ভারি জিনিস। রাত্রি এলে খুশীতে এমন লোকেদের মন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। একটি বছর অতিবাহিত হলে 'জন্মদিন' পালনের আনন্দে মাতোয়ারা হয় বহু বুড়ো-বুড়িও। অথচ হয়তো তারা ভুলে বসে যে, জীবনের আকাশ হতে তাদের একটি তারা খসে পড়ল এবং মৃত্যুর দিকে একদিন বা এক বছরের পথ তারা আরো অগ্রসর হল! আর এই ভুলের কারণেই তারা দিন বা বছর শেষে দুঃখ প্রকাশ করে সচেতন না হয়ে আনন্দের সুনিদ্রায় সুষুপ্ত থাকে। পক্ষান্তরে সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না। হৃদযন্ত্রের ঘড়ি 'ধক্‌ধক্‌' করে বাজতে আছে। যে ঘড়ি মানুষকে সতর্ক করে যেন সর্বদা বলছে, 'ওহে মানুষ! তোমার জীবন তো মাত্র কয়েক মিনিট ও সেকেন্ডের সমষ্টির নাম। সুতরাং সাবধান হও!'

সে জীবনের কি কোন অবসর থাকতে পারে, যে জীবন সূর্যালোকের নীচে বরফের মত গলে গলে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে অথবা আগুনের নীচে মোমবাতির মত দ্রবীভূত হয়ে লয়প্রাপ্ত হচ্ছে।

সুতরাং মুমিনের জন্য 'অবসর' হল এক বড় সম্পদ। এ অবসর সময়ের ব্যাপারে উদাসীন হওয়া অথবা এর যথার্থ কদর না করা তার পক্ষে মহাভুল। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "দু'টি নেয়ামত এমন আছে; যার ব্যাপারে বহু মানুষ ধোকার মধ্যে রয়েছে। আর সে দু'টি নেয়ামত হল সুস্থতা ও অবসর।" *(বুখারী ৬৪১২, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)* অতএব এমন নেয়ামতের ব্যাপারে ভুল করার খেসারত তাকে দিতে হবে। কারণ, "কিয়ামতের দিন কোন বান্দার পদযুগল ততক্ষণ পর্যন্ত সরবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে তার আয়ু প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কিসে ক্ষয় করেছে?----" *(তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৪৬নং)*

আর এ জন্যই প্রিয় নবী ﷺ উম্মতকে সতর্ক করে বলেন, "পাঁচটি বস্তুকে পাঁচটির পূর্বে গনীমত জেনে মূল্যায়ন করো; বার্ধক্যের পূর্বে তোমার যৌবনকে, অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে, দারিদ্রের পূর্বে তোমার ধনবত্তাকে, ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসরকে এবং মরণের পূর্বে তোমার জীবনকে।" *(হাকেম ৪/৩০৬, আহমদ, সহীহুল জামে' ১০৭৭নং)*

উমার বিন আব্দুল আযীয (রঃ) বলেন, 'দিবারাত্র তোমার মাঝে নিজ কাজ করে যাচ্ছে। সুতরাং তুমিও তার মাঝে কাজ করে যাও।'

সময় নষ্ট করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সুযোগের সদ্ব্যবহার করে যারা, তারাই তো প্রকৃত জ্ঞানী। যে ছাত্র পরীক্ষায় ভালোভাবে উত্তীর্ণ হতে চায়, সে কোনদিন সময় নিয়ে অবহেলা করে না। হীরের টুকরা কুড়াতে সে যত আলস্য প্রদর্শন করবে ক্ষতি হবে তার তত বেশী।

বেকারত্ব ও কর্মবিমুখতা যুবকের জন্য ঔদাস্য সৃষ্টি করে। আর তা যুবতীর জন্য এমন

ক্ষতিকর যে, তার মনের গোপনে যৌনানুভূতি সঞ্চারিত করে তোলে।

হযরত উমার (রাঃ) বলেন, 'কোন কোন মানুষকে দেখে আমি বড় পছন্দ করি। অতঃপর খোঁজ নেওয়ার পর যখন জানতে পারি যে, ওর কোন কাজ-ধান্দা নেই, তখন সে আমার চোখে ছোট হয়ে যায়।'

তিনি আরো বলেন, 'আমি তোমাদের কাউকে বেকাররূপে দেখতে অপছন্দ করি; যে ব্যক্তি না কোন দুনিয়ার কাজ করে, আর না-ই কোন আখেরাতের কাজ।'

একথা বড় সত্য যে, যে ব্যক্তি তার জীবনের একটি দিনকে ক্ষয় করে দেয় অথচ সে তার মধ্যে কারো একটি অধিকার প্রদান করতে পারে না, অথবা কোন কর্তব্য পালন করে না, অথবা কোন একটা গৌরব অর্জন করে না, অথবা কোন প্রকার প্রশংসা লাভ করতে পারে না, অথবা কোন কল্যাণ সাধন করতে পারে না, অথবা কোন জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয় না, তাহলে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই সেদিনকার মত নিজের জন্য বড় যালেম প্রতিপন্ন হয়।

জাতি বড় উপকৃত ও লাভবান হত, যদি তার মধ্যে বিভিন্নমুখী উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড উদ্ভব করে জাতির মানুষের খালি ও অবসর সময়কে সুষ্ঠুরূপে কাজে লাগাতে এবং কেবল সৎ ও বৈধ কাজে নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারত। কিন্তু হায়! তার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন অবসর-বিনোদন কেন্দ্র, মাধ্যম ও যন্ত্র। ফলে যারা ডুবছিল তাদেরকে আরো ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে অধঃপতনের অতল তলে। যারা ছোট কাজ পেয়ে সামান্য মজুরী উপার্জন করে কিছু খেয়ে কিছু সঞ্চয় করছিল তারাও তাদের অবসর-বিনোদনের জন্য, বরং অনেক সময় কাজ ছেড়ে দিয়ে চিত্তবিনোদনের জন্য সেই উপার্জিত অর্থটুকু এবং সেই সাথে অপর্যাপ্ত সময়ও ব্যয় করে ফেলেছে ঐ সব কেন্দ্রে ও যন্ত্রে। যার ফলশ্রুতিতে বহু মানুষ তাদের দ্বীন হারিয়েছে এবং দুনিয়াও।

যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নত যুগে মানুষের শারীরিক পরিশ্রম কম হয়ে গেছে। অবসর ও আরাম-আয়েশের সময় বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে ক্ষিধেও লাগে কম। কিন্তু খাবার সময় হলেই খেতে হয়। ক্ষুধা না লাগলেও উদরপূর্তি করতে হয়। এতে না খাওয়ায় রুচি থাকে, আর না হজম ঠিকমত হয়। এ জন্য অধিকাংশ লোকের পেট খারাপ হয় এবং বিভিন্ন পেটের রোগও দেখা দেয় এরই কারণে।

অন্য দিকে কাজ না থাকলে বসে থাকতে হয়। বসলে শুতে ইচ্ছে করে। আর রাত্রে সকাল-সকাল শুলেও তো আর ঘুম আসে না। কারণ দিনে কোন মেহনতের কাজ না করে থাকলে শরীর ক্লান্ত হয়ে চট্‌পট্‌ ঘুম আসবে কোত্থেকে? ফলে অনেকেই কয়েক ঘন্টা ধরে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে ছট্‌ফট্‌ করে। রাত পার হয়ে যাবে এই ভয় মনে থাকলে ঘুম আসতে আরো দেরী হয়। রাতের অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে যেমন একটার পর একটা নক্ষত্র ফুটতে থাকে, তেমনি ঘুম না আসা লোকের মনের আকাশে একটার পর একটা চিন্তার তারা ফুটে উঠতে থাকে। দিনের বেলায় তাকে কথায় কে আঘাত দিয়েছে তার চিন্তা, কে তার কথা মানেনি তার অপমান চিন্তা, সংসারের কোন খরচ চিন্তা, কারো ধোকাবাজির চিন্তা, প্রেম থাকলে প্রেম ও তার সাফল্য বা অসাফল্যের চিন্তা, স্বামী বা স্ত্রী বিদেশে থাকলে সে অন্যের প্রেমে পড়ছে কি না তার চিন্তা, নানা প্রকার সুমধুর যৌনচিন্তা, আরো কত রকম অশুভ চিন্তা,

কুচিন্তা ও দুশ্চিন্তা তার মনের দুয়ারে এসে ভিড় জমায়।

আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যাদের কাজ নেই অথবা থাকলেও কম এবং অবসর বেশী, তাদেরকেই মানসিক রোগ অধিক আক্রমণ করে থাকে। আর সে জন্যই যারা যত বিলাসী তারা তত মনের রোগে অধিক পীড়িত।

পক্ষান্তরে যারা খেটে খাওয়া পরিশ্রমী মানুষ, যারা সারাদিন কল-কারখানা অথবা ক্ষেত-খামারে মেহনত করে তাদেরকে ক্ষুধা লাগে বেশী। তাদের খাবারে সে রকম স্বাদ ও উল্লেখ্য 'ভ্যারাইটিজ' না থাকার ফলে স্বল্প আহার করে। আর পেট খালি রেখে খেলে অসুখ-বালা কম হয়। মামুলী ধরনের খাবার হওয়ার ফলে তাদের হজম ও পরিপাকের কোন ক্ষতি হয় না। অতঃপর বিছানায় আসার আগেই তন্দ্রায় তাদের চোখ দুটি ঢুলুঢুলু করে। আর বিছানায় যেতেই নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে মৃতপ্রায় হয়ে পরম তৃপ্তি সহকারে রাত্রি যাপন করে।

অতএব মুসলিম যুবকের উচিত, নিজেকে কর্মমুক্ত না করা। প্রকারান্তরে কর্মবিমুখ ও শ্রমকাতর হওয়া তো মোটেই উচিত নয়। সংসারের কাজ না থাকলে সমাজের কাজ তো আছে, তা না থাকলে কোন প্রতিবেশীর কাজ অবশ্যই থাকবে। বসে থাকার চেয়ে বেগাড় যাওয়া তো অনেক ভালো। লোকেও বলে, 'বেকারের চেয়ে বেগাড় ভালো।' মানুষের উপকার করা নিশ্চয় মানবিক কাজ। তা ছাড়া তাও এক প্রকার ইবাদত। মুসলিম ভায়ের সাহায্য করলে, আল্লাহ সাহায্যকারীকে সাহায্য করে থাকেন। আর কোন প্রকার সাংসারিক কাজ না পাওয়া গেলে আখেরাতের কাজ তো আছেই। একটা ইসলামী বই নিয়ে বসা, তসবীহ ও দুআ-দরূদ পাঠ করা, কুরআন তেলাওয়াত করা, তফসীর ও হাদীস বুঝে পড়া ইত্যাদি বহু কাজ আছে; যা বুঝে করতে পারলে অবসর পাওয়া তো দূরের কথা, হাতে সময়ই পাওয়া যাবে না।

আল্লাহর প্রতি ঈমান ও জিহাদের পরবর্তী পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ আমল হল, সব চাইতে ভালো ও দামী ক্রীতদাস মুক্ত করা। কেউ যদি তা না পারে তবে তার জন্য উত্তম কাজ হল, কোন কারিগরের সহযোগিতা করা অথবা যে কারিগর নয় তার কাজ করে দেওয়া। *(মুসলিম ৮৪নং)*

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, কারিগরকে সহযোগিতা করা যদি উত্তম কাজ হয় তাহলে নিজে কারিগর হওয়াটা কত বড় উত্তম কাজ হতে পারে!

ছুতোর, কামার, কুমোর, তাঁতী, ঘরামী প্রভৃতি কারিগরের কারিগরি কাজ কোন জাতের সহিত সম্পৃক্ত ও নির্দিষ্ট নয়। এর প্রত্যেকটাই মুসলিমের গর্বের কাজ। নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মেহনতের বাহুবলে যারা অর্থোপার্জন করে দ্বীন ও দুনিয়া করে তাদের তা নিয়ে গর্ব হওয়া উচিত। তা ছাড়া শুধু কারিগরি কাজই নয়; বরং কাজ যত ছোটই হোক না কেন, তা করতে লেগে যাওয়া উচিত এবং তার সঙ্গে ঐ কাজের মাধ্যমে বড় কিছু করার বা উত্তম আরো কিছু হওয়ার আশা ও প্রচেষ্টা রাখা অবশ্যই উচিত। ঐ সময় 'ছোট কাজ করব না' বলে বা আভিজাত্যে বাধে বলে কোন অনিশ্চিতের আশায় কোন নিশ্চিত কিছুকে ত্যাগ করে বেকারত্বের অভিশাপ মাথায় নিয়ে কুঁড়ের জীবন অতিবাহিত করা পুরুষের জন্য একটা বড় মানসিক পরাজয়। পথ ও উপায় বৈধ হলে হালাল রুজী কামিয়ে খাওয়ার মাঝে পুরুষের পৌরুষ লুকিয়ে আছে। অতএব অপেক্ষা কিসের? বড়র আগে ছোটতেই লেগে যাও।

অতঃপর বড় কিছু পাওয়া গেলে তো ভালোই; নচেৎ ছোট থেকেই বড় হওয়ার চেষ্টা কর। নিষ্কর্মা থেকে মা-বাপের ঘাড়ে বোঝা হয়ে বসে থেকো না। সোনার স্বপ্ন দেখে মুক্তার সময় নষ্ট করার চাইতে বাস্তবে কর্মক্ষেত্রে উঠে-পড়ে লেগে গিয়ে সোনার খনি আবিষ্কার করাটাই হল জীবনের মহাজয়।

শোন, আল্লাহর রসূল ﷺ কি বলেন; তিনি বলেন, “স্বহস্তে উপার্জন করে যে খায়, তার চেয়ে উত্তম খাদ্য অন্য কেউ ভক্ষণ করে না। আল্লাহর নবী দাউদ ﷺ স্বহস্তে উপার্জিত খাদ্য ভক্ষণ করতেন।” *(বুখারী ২০৭২ নং)* “তোমরা যে খাদ্য ভক্ষণ কর তার মধ্যে সব চাইতে উত্তম খাদ্য হল, তোমাদের নিজের হাতে কামাই করা খাদ্য।” *(তিরমিযী, নাসাঈ, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ১৫৬৬ নং)*

নিরুপায়ে এই শ্রেণীর কাজ করতে যদি তোমার আভিজাত্যে বাধে তাহলে জেনে রেখো যে, সৃষ্টির সেরা মানুষ আম্বিয়াগণও ঐ শ্রেণীর ছোট কাজ করেছেন। প্রত্যেক নবীই ছাগল চড়িয়েছেন। *(বুখারী ৩৪০৬নং, মুসলিম)* কেউ ছিলেন ছুতোর, কেউ বা কামার। সুতরাং তোমার আভিজাত্য যে আসলে জাতের আভিজাত্য নয়; বরং স্বভাবের কুঁড়েমি ও আলসেমি তা বলাই বাহুল্য।

অতএব যুবক বন্ধু! সংকোচ ও দ্বৈধের সকল জড়তা কাটিয়ে উঠে কাজ শুরু করে দাও। তোমার শিক্ষা ও 'কোয়ালিফিকেশন' অনুযায়ী কিছু একটা কর। বেকার বসে থেকে সময় নষ্ট করো না। অলসদের আখড়ায়, তাসের আড্ডায় এবং ভুয়া ফুটানিবাজদের বৈঠকে থেকে নিজেকে শ্রম-বিমুখ কুঁড়ে করে তুলো না। কাজ করে খাও। কাজে গর্ব আছে, আনন্দ আছে। পরিশ্রম কর, পরিশ্রমে সুখ আছে। পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি।

যোগ্যতা ও ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও চাকরী না পাওয়া গেলে লোকেরা তাকে 'বেকার' বলে। কিন্তু তুমি নিজেকে 'বেকার' বলে পরিচিত করো না। নাই বা হল চাকুরী। হালাল ব্যবসায় নেমে পড়। যতটুকু পুঁজি যোগাড় করতে পার ঠিক তত বড়ই ব্যবসা আল্লাহর নাম নিয়ে খুলে বস। ধীরে ধীরে বড় হও। ছোট্ট দোকানের মাধ্যমেই উন্নতি করতে শিখ। তারই মাঝে দয়াময় আল্লাহর কাছে বর্কত চাও। আর তুমি তো জানই যে, 'চলে যদি মনোহারী, কি করবে জমিদারী?' তবে হ্যাঁ, ব্যবসা চালাবার মত ব্যবহার শিখো, বৈধ কৌশল ও উপায় অবলম্বন করো। তাহলেই দেখবে, অন্যান্যের মত তুমিও চায়ের দোকান খুলে এঁটো কাপ ধুতে ধুতে অথবা সব্জী ব্যবসা করতে করতে কখন বিল্ডিং বানিয়ে ফেলেছ।

ব্যবসার মাধ্যমেও তুমি হালাল রুজী উপার্জন করতে পার। এ বিষয়ে প্রিয় রসূল ﷺ বলেছেন, “সর্বাপেক্ষা উত্তম উপার্জন হল সৎ ব্যবসা এবং নিজের হাতের মেহনত।” *(আহমদ, সহীহুল জামে' ১১২৬নং)* সুতরাং চাকুরীর পয়সা থেকেও উত্তম রুজী হল, ব্যবসা ও শ্রম দ্বারা উপার্জিত রুজী।

অবশ্য ব্যবসা করলে হালালী পথে করো। ব্যবসায় কোন সময় মিথ্যা বলো না, কথায় কথায় কসম খেয়ো না, নচেৎ লাভের বর্কত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সৎপথে লাভ কম মনে হলেও তাতেই বর্কত আছে। হারাম উপার্জনে বর্কত নেই। তাতে 'নাই-নাই, খাই-খাই, চাই-চাই' মিটে না। দুআ কবুল হয় না। ভেজাল দিয়ে, ধোকা দিয়ে, দুনম্বরী করে, কালোবাজারী করে,

দাঁড়ি মেরে প্রচুর লাভ করে বিল্ডিং ঠোকা যায় ঠিকই; কিন্তু সেই বিল্ডিং-এ সুখের পায়রা বাসা বাঁধে না। আর কথায় তো আছে যে, 'ফাঁকি দিলে ফাঁকে পড়ে, মারা পয়সা যায় ডাক্তার ঘরে।'

সুতরাং 'হঠাৎ বড়লোক' হওয়ার স্বপ্ন ও শক ত্যাগ কর। হারামী পথে কোটিপতি না হতে চেয়ে হালালী পথে তুমি তোমার প্রয়োজনীয় রুজী সন্ধান কর। আমাদের প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "রুজী সন্ধানের ব্যাপারে জলদিবাজি করো না। পৃথিবীতে কোন বান্দাই তার ভাগ্যে নির্ধারিত সর্বশেষ রুজী অর্জন না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং রুজী সন্ধানে মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন কর। হালাল উপায় গ্রহণ কর এবং হারাম উপায় বর্জন কর।" *(হাকেম, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৭৩২৩ নং)*

তিনি আরো বলেন, "মৃত্যু বান্দাকে যত খুঁজে বেড়ায় তার চাইতে বেশী খুঁজে বেড়ায় তার রুজী।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ১৬৩০ নং)* সুতরাং প্রত্যেক ঘরে তার দরজা দিয়েই প্রবেশ করা হল জ্ঞানী মানুষের কাজ। আর হালাল পথ ও উপায় অবলম্বন করা অবশ্যই মুসলিমের গুণ। নচেৎ একথারও সাক্ষ্য বিদ্যমান রয়েছে যে, "ব্যবসাদার লোকরাই ফাজের (ফাসেক, সত্যত্যাগী ও মিথ্যাবাদী) হয়ে থাকে।" *(আহমদ, হাকেম, ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ১৫৯৪ নং)* আর এ জন্যই লোকেরা বলে, 'মিথ্যা না বললে কি ব্যবসা চলে নাকি?' তবে এ শ্রেণীর ব্যবসায়ী হল তারা, যারা 'সাঁঝে বড়লোক' হতে চায়।

মুসলিমের কিন্তু এ ধরনের অতিলোভী হওয়া উচিত নয়। পরন্তু হারাম উপায়ে কামাই করে যারা ফুলে-ফেঁপে মোটা হয়েছে তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে চোখ টাটানো বা দীর্ঘশ্বাস ছাড়াও সমীচীন নয়। সুতরাং তুমি সন্তুষ্ট-চিত্তে চেষ্টা বজায় রাখ, ফল পরোয়ারদেগারের হাতে। আর এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ এর কয়েকটি উপদেশ শোনো ঃ-

তিনি বলেন, "আল্লাহ তাআলা বান্দাকে যা দান করেছেন তার মাধ্যমে তাকে পরীক্ষা করে থাকেন। সুতরাং সে যদি আল্লাহর ভাগ করে দেওয়া ভাগ্য নিয়ে সন্তুষ্ট হয়, তাহলে তিনি তাঁর ঐ দানে বর্কত (প্রাচুর্য) প্রদান করেন এবং (তার রুযী) আরো প্রশস্ত করে দেন। পক্ষান্তরে সে যদি তা নিয়ে তুষ্ট না হয়, তাহলে তার রুযীতে বর্কত বিলীন হয়ে যায় এবং লিখিত রুযী ছাড়া বাড়তি কিছু বৃদ্ধি করা হয় না।" *(আহমদ, সহীহুল জামে' ১৮৬৯ নং)*

"সে ব্যক্তি সফলকাম ও কৃতার্থ হয়েছে, যে ইসলামের হেদায়াত (আলো) পেয়েছে, প্রয়োজন মোতাবেক স্বচ্ছল রুযী পেয়েছে এবং তাতে সে সন্তুষ্টও আছে।" *(ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহুল জামে' ১১৩৮ নং)*

"তোমাদের থেকে যারা নিম্নে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর এবং তোমাদের থেকে যারা উর্ধ্বে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করো না। তাহলে হবে এই যে, তোমাদের উপর আল্লাহর নেয়ামতকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছজ্ঞান করবে না।" *(আহমদ, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ১৫০৭ নং)*

আসল ধনবত্তা হল হৃদয়ে। মন ধনী না হলে যতই ধন অর্জন হোক ধনী হওয়া সম্ভব নয়। তাই লোহার সিন্দুক ভর্তি বা ব্যাংক ব্যালেন্স করার আগে মনের সিন্দুক ও ব্যাংক ভর্তি ও ব্যালেন্স করতে হবে। লোভাতুর মন থেকে অপ্রয়োজনীয় 'চাই-চাই, খাই-খাই' দূর করতে হবে। তাহলেই প্রকৃত ধনী হওয়া সম্ভব ও সহজ। নচেৎ হাজার হলেও অভাব ঘুঁচবে না। লক্ষ-লক্ষ সুখের সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও সুখের মিষ্টি স্বাদ অনুভব করা যাবে না। ধনী হয়েও গরীবরূপে চিহ্নিত হবে লেবাসে-পোশাকে, আচারে-ব্যবহারে। অথচ "আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে তাঁর

অনুগ্রহ ও নেয়ামত প্রদান করেন তখন তার প্রভাব ও চিহ্ন তার দেহের উপর দেখা যাক্-এ কথা তিনি পছন্দ করেন। পক্ষান্তরে তিনি দীনতা প্রকাশ করাকে এবং দারিদ্রের ভান করাকে অপছন্দ করেন। আর ঘৃণা করেন, নাছোড়-বান্দা হয়ে যাচ্ঞাকারীকে এবং ভালোবাসেন, লজ্জাশীল এমন বান্দাকে; যে যাচ্ঞা করে না।" *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে' ১৭১১ নং)*

সুতরাং দীনতা প্রকাশের হীনতা বর্জন করে, সকল প্রকার আলস্য কাটিয়ে, গড়িমসি ও কুঁড়েমি ত্যাগ করে মাথা উঁচু করে বাঁচার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ কর। এমন উদ্যমের সাথে অদম্যভাবে কাজ করে যাও যাতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, তুমি অকর্মণ্য নও এবং তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। হ্যাঁ, আর ভাগ্যের উপর ভরসা করে বসে যেও না। 'উট বেঁধে আল্লাহর উপর ভরসা করো, উঁট ছেড়ে রেখে নয়।' তকদীর তো আছেই; কিন্তু তদবীর করে যাওয়া তোমার কাজ। হাল ছেড়ে বসা যুবক ও পুরুষের কাজ নয়। পেঁচা ও কাকের ডাকে পিছপা হওয়া তওহীদবাদী মুসলিম সুপুরুষের গুণ নয়। কুকুর-বিড়ালের কান্নায় ভয় পেয়ে ঘর ঢোকাও তার জন্য শোভনীয় নয়। আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রেখে সমস্ত বাধা উল্লংঘন করা পুরুষের কাজ।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যদি তোমরা আল্লাহর উপর যথার্থ ভরসা রাখ তাহলে তিনি তোমাদেরকে সেইরূপে রুযী দান করবেন, যেরূপে দান করে থাকেন পক্ষীকুলকে; তারা খালি পেটে সকালে বাসা থেকে বের হয়ে যায় এবং ভরা পেটে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে।" *(আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৫২৫৪ নং)*

উক্ত হাদীস শরীফে তিনটি কথার প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে; প্রথম কথা এই যে, রুযী সন্ধানের জন্য আল্লাহর উপর আস্থা রাখতে হবে। দ্বিতীয় কথা এই যে, ঘর ছেড়ে বের হয়ে যেতে হবে। আর তৃতীয় কথা এই যে, সকালে বের হতে হবে। কারণ, প্রভাতকালের একটা বিশেষ মাহাত্ম্য আছে; এ সময়ের কাজে বিশেষ বর্কত আছে। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)* সুতরাং এ সময়ে যে ঘুমিয়ে থাকে সে সমূহ বর্কত থেকে বঞ্চিত হয়।

আর ঘর থেকে বের হওয়া এবং 'হর্কত মেঁ বর্কত' হওয়ার কথা মহান আল্লাহ বলেন, "অতঃপর নামায শেষ হলে তোমরা বাইরে (মাঠে-হাটে) ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর। আর আল্লাহকে (কর্মক্ষেত্রে) অধিকরূপে স্মরণ কর; যাতে তোমরা সফলকাম হও।" *(সূরা জুমুআহ ১০ আয়াত)*

তিনি রাত্রি সৃষ্টি করেছেন বিরতি ও আরাম নেওয়ার জন্য এবং দিন সৃষ্টি করেছেন রুযী সন্ধানের জন্য। রুযী সন্ধান সহজসাধ্য করার লক্ষ্যেই পানির বুকে জাহাজ ভাসিয়েছেন। কিন্তু মানুষ যদি হাত-পা নিয়ে ঘরেই বসে থাকে তাহলে তাঁর অনুগ্রহ ও রুযী তো বাতাসের 'ইথর'-এ ভেসে আসবে না। স্ত্রীর প্রেমের নামে তার শাড়ীর আঁচলে জড়িয়ে থাকলে, সন্তানের মায়ার বাঁধনে নিজেকে বেঁধে রাখলে অথবা পিতা-মাতার স্নেহ-মমতায় গৃহবন্দী হয়ে থাকলে এমন পুরুষ কাপুরুষ বৈ কি? অথচ এ কথা সত্য যে, কেউ তাকে বসে খেতে দেবে না। আর বসে খেলে যাবেই বা কতদিন? গোলেমালে কতদিন চলতে পারে? চিরদিন তো চলতে পারে না। তা ছাড়া কথায় বলে, 'বসে খেলে কুলায় না, করে খেলে ফুরায় না।' 'বসে খেলে রাজার ধনও ফুরিয়ে যায়।' 'বুদ্ধি গুণে খা ভাত, আবার বুদ্ধি গুণেই হা-ভাত।'

বাপের জমি-জায়গা দেখে হয়তো অনেকে ভাবে, এতেই আমার বেশ চলবে। অনেকে স্ত্রীর ধন দেখে শ্বশুর বাড়ির আশ্রিত হয়ে জীবন কাটানোর মাঝেই সুখ আছে বলে মনে করে। কিন্তু এদের মন যে হীন তা বলাই বাহুল্য।

বাপ-মা যত ধনবানই হন না কেন, তাঁদের চেষ্টা থাকে তাঁদের ছেলে আরো বড় ধনী হোক। কিন্তু ছেলে তার বিপরীত হলেই মুশকিল। পিতা চান ছেলে স্বনির্ভরশীল হয়ে গড়ে উঠুক। কিন্তু কিছু ছেলে আছে যারা তীর্থের কাক হতে চায়। পরনির্ভরশীল হয়ে, এমন কি স্ত্রীর কামাই খেয়ে দিন কাটাতে পরম তৃপ্তি ও সুখ অনুভব করে থাকে!

এক বণিক্ তার ছেলেকে বাণিজ্যে পাঠাল। একদা সে বন্য পথে এক ক্ষুধার্ত শিয়াল দেখতে পেয়ে তার অলস মনে ভাবল, এই মিসকীন কোত্থেকে খেতে পায়? তৎক্ষণাৎ দেখল, অনতি দূরে এক বাঘ শিকার ধরে খাচ্ছে। বাঘের ভয়ে লুকিয়ে এক স্থান হতে তাদের কীর্তিকাণ্ড লক্ষ্য করতে লাগল। পরিশেষে সে দেখল, বাঘ যা খাওয়ার তা খেয়ে চলে গেলে ঐ শিয়াল এসে পরিত্যক্ত অবশিষ্ট অংশ খেতে শুরু করল। কুঁড়ে মনে ভাবতে লাগল, এই তো আসল বুদ্ধি! বিনা মেহনতে বেশ খাসা খাবার শিয়াল খেতে পেল। এমনি করে বিনা পরিশ্রমে আমারও তো দিন চলে যাবে। বাপের তো অনেক আছে। এত কষ্ট স্বীকার করে লাভ কি?

বাস, ভাবা মাত্রই বাড়ি ফিরে এল শ্রমবিমুখ ছেলে। এসে বাঘ ও শিয়ালের বৃত্তান্ত শুনালে আব্বা তাকে বুঝিয়ে বললেন, 'তুই আসলে ভুল বুঝেছিস্। অনুকরণ যদি করতেই হয় তাহলে শিয়ালের কেন? বাঘের অনুকরণ কর্। শিয়ালের কর্মকাণ্ড খেয়াল করলি, অথচ বাঘের কর্মটা খেয়াল করলি না? আমি আশা করব যে, তুই পরান্ন বা উচ্ছিষ্টভোজী শিয়াল না হয়ে স্বনির্ভরশীল বাঘ হবি; তুই কামাই করে খাবি। অন্য কেউ শিয়ালের মত তোর এঁটো খাক্- তাতে দোষ নেই।'

যুবক বন্ধু আমার! জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হতে পারলে তোমাকে কেউ ভালোবাসবে না, এমন কি তোমার প্রাণপ্রিয়া স্ত্রীও নয়। সংসারের দরজা দিয়ে অভাব ঢুকলে জানালা দিয়ে ভালোবাসা লুকিয়ে পালিয়ে যাবে। কাল তুমি যার কাছে 'রসের নাগর' ও 'যোগ্য স্বামী' ছিলে, আজ পয়সা থেকে পকেট খালি হলে তার কাছেই অযোগ্য 'মিন্সে' বলে পরিচিত হবে। শ্বশুর বাড়িতেও তোমার অযোগ্যতার চর্চা হবে। নি-কামায়ের জামাই দেখে সবাই নাক সিঁটকাবে। কাল তোমার ধনের জন্য যেখানে ধন্য-ধন্য নাম হচ্ছিল আজ সেখানে অন্নহারা-ছন্নছাড়া হয়ে তুমি ঘৃণার্হ হবে।

কাল যারা তোমাকে আদর করে 'দোলা-ভাই' বলে ডাকত, আজ তারা তোমাকে ঘৃণাভরে 'অকর্মণ্য' হওয়ার ফলে 'কুটে লাগা' বা 'অকেজো' বলে আখ্যায়িত করবে। কাল যারা 'আসুন-আসুন' 'বসুন-বসুন' বলে আপ্যায়ন করত, আজ তারা 'আয়' বলেও ডাকতে চাইবে না। ঠিকই তো, 'যার ধান নেই, তার মান নেই। যার ভাত নেই, তার জাত নেই।' সিমেন্ট না থাকলে কি ইঁটে-ইঁটে জোড়া লাগে? আঠা না হলে কাগজে-কাগজে কোলাকুলি হয় না। তোমার অর্থ না থাকলে কে তোমাকে নিয়ে গলাগলি করবে ভাই?

একটি সত্য ঘটনা শোন। এক গরীব মা তার ছেলেকে বড় মেহনত করে অর্থ সংগ্রহ করে মানুষ করেছিল। বাপ মারা গেছে সে যখন কোলে ছিল তখন। ছেলে লেখাপড়া শিখে বড় ডিগ্রি

ও চাকুরী লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। মা চেয়েছিল এক দ্বীনদার যুবতীর সঙ্গে তার বিবাহ সেরে ফেলবে। কিন্তু ছেলে তার শিক্ষা অনুসারে সে কনেকে পছন্দ করেনি। নিজের পজিশন হিসাবে পছন্দ করেছিল তারই মত তথাকথিত 'আলোকপ্রাপ্তা' এক শিক্ষিতা যুবতীকে। বিয়ের ঠিক ছ'মাস পরে এক রাত্রে সেই স্ত্রী স্বামীর নিকট কেঁদে অভিযোগ করল, 'আমি এ ঘরে তোমার মায়ের সঙ্গে বাস করতে পারব না। এর চাইতে বেশী সবর আর আমি করতে পারব না। তুমি ব্যবস্থা কর। তা না হলে আমি মায়ের ঘর চলে যাব।'

যেই বলা সেই ব্যবস্থা। 'মা'এর মত ধনকে ঘর ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যেতে বাধ্য করল তার শিক্ষিত ছেলে-বউ! অশ্রুসিক্ত নয়নে মা ঘর থেকে যেত যেতে শুধু বলেছিল, 'আল্লাহ তোকে হেদায়াত করুক বেটা! আল্লাহ তোকে সুখী করুক।'

অবশ্য কিছুদিন পর ছেলের মাথা ঠান্ডা হলে এ কাজ তার বিবেকে বিরাট ভুল বলে ধরা পড়েছিল। কিন্তু মা কোথায় আছে তা খোঁজা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। আর স্ত্রীও তার রূপ-লাবণ্য, ছলাকলা ও বিভিন্ন প্রভাব-প্রতিপত্তির সাহায্যে মায়ের সে সব কথা ভুলিয়ে তাকে বেশ প্রশান্ত করে নিজ বশে রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

দিন কারো সমান যায় না। একদা অসুস্থ হল স্বামী। রোগ ছিল বড় মারাত্মক। মায়ের নিকট খবর পৌঁছলে মায়ের মন বাছাকে না দেখে থাকতে পারেনি। দেখতে এসেছিল হাসপাতালে। সঙ্গে মেম সাহেবা বিবিজান ছিল। রুমের দরজা প্রবেশ করতেই সে মায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কঠোর ভাষায় বলে উঠল, 'ফিরে যাও এখান থেকে। তোমার বেটা নেই। আমাদের কাছে কি চাও তুমি? আমরা তোমাকে চাই না।'

অসুখের তাড়নায় ছেলের কথা বলার এবং স্ত্রীর কথার কোন প্রতিবাদ করারও ক্ষমতা ছিল না। নিরুপায় হয়েই মা লজ্জায় ও ঘৃণায় চোখের পানি ফেলতে ফেলতে ফিরে গিয়েছিল।

সুস্থ হলে বাড়ি ফেরার পর আবার অসুখ বেড়ে যায় স্বামীর। পুনরায় ভর্তি হতে হয় হাসপাতালে। লম্বা অনুপস্থিতির ফলে এবারে তার চাকুরীও চলে যায়। ঋণের বোঝা ইতিমধ্যে কোমর ভেঙ্গে ফেলেছে। বহু বন্ধু আর দেখা করতে আসে না। এখন সবাই যেন তাকে দূর বাসতে শুরু করে দিয়েছে। এক্ষণে স্ত্রীই বা কেন থাকবে? সিমেন্টে লোনা ধরলে ইটের দেওয়াল তো ভেঙ্গে পড়বেই। হঠাৎ একদিন সে স্বামীর উদ্দেশ্যে বলল, 'আমি আর এত কষ্টে তোমার কাছে থাকতে পারব না; আমাকে তালাক দাও! এখন তোমার চাকরী নেই, কোন পজিশন নেই। আমি মায়ের ঘর চললাম!'

রোগাক্লিষ্ট স্বামী যে হতবাক ও নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছিল তা বলাই বাহুল্য। অবশ্য সে হয়তো এই শাস্তির যোগ্যও ছিল। সুদীর্ঘ নিদ্রাঘোর থেকে যেন আজই চৈতন্যপ্রাপ্ত হল।

পরবর্তীতে একটু সুস্থ হলে মায়ের খোঁজ করল। এতদিন মা লোকের সদকাহ-যাকাত খেয়ে কালাতিপাত করছিল। মায়ের সন্ধান পেয়ে অশ্রু বিনিময়ের মাধ্যমে এক অপরকে নতুন জীবনের অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। আজ সে 'মায়ের মত মা' পেয়ে বড় সুখী। *(আ-ইদুনা ইলাল্লাহ পুস্তিকা থেকে সংগৃহীত)*

এ জন্যই লোকেরা বলে থাকে, 'বউ গেলে বউ পাবি রে, কিন্তু মা গেলে মা আর পাবি না।' অবশ্য 'মায়ের মত মা' পাওয়া এক সৌভাগ্যের ব্যাপার।

'এরি মাঝে কোথা হতে ভেসে এল মুক্ত-ধারা মা আমার
সে ঝড়ের রাতে-
কোলে তুলে নিল মোরে, শত শত চুমা দিল সিক্ত আঁখি-পাতে।'

অবশ্য মা-বাপও যে শ্রমবিমুখ ছেলেকে বসিয়ে রেখে খাওয়াবে তা নয়। মা-বাপের যত স্নেহ-আদরের কথা বেশী ভাবা যায় শিশু অবস্থায়। কিন্তু বড় হলে তারাও ছেলের কামাই খেতে চায়। আর এটা তাদের অধিকার। সুতরাং কামাই দেখাতে না পারলে জামাই-এর যেমন কোন মান নেই শ্বশুর বাড়িতে, ঠিক তেমনই অর্থ ঢেলে দিতে না পারলে ছেলেরও কোন স্নেহ নেই পিতামাতার কাছে। দুনিয়ার কানুনই এটা। সংসারের যত রকমের মায়া-বন্ধন আছে সে সবের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হল এই টাকা। টাকা না হলে সব ফাঁকা। সমস্ত মায়ার বাঁধন ছিন্নভিন্ন হবে টাকা যদি না থাকে। এক বন্ধু আমাকে জানালেন, 'বাড়ির লোকে আমাকে খুব ভালোবাসে, খুব মানে। কোন কাজ আমার পরামর্শ ছাড়া হয়ই না। বিভিন্ন মজলিসে আব্বা আমার খুব প্রশংসা করেন।'

কিছুদিন পর সেই বন্ধুর মুখেই শুনলাম তার বিপরীত। কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, বন্ধুর টাকা জমা দেওয়ার বাজেট নাকি কম হয়ে গেছে তাই। আর এই অবস্থা অধিকাংশ বন্ধুরই। কথায় বলে, 'টাকা তুমি যাচ্ছ কোথা? পিরীত যথা। আসবে কবে? বিচ্ছেদ যবে।' বলা বাহুল্য, পিরীত ও বিচ্ছেদের মূল কারণ হল ঐ টাকা। সুতরাং তার উপরে যথার্থ নিয়ন্ত্রণ না রাখতে পারলে জীবনে পরাজয় ও ব্যর্থতা সুনিশ্চিত। টাকা নিয়ে বিভিন্ন আকর্ষণ ও বিকর্ষণের মাঝে সুস্থিরভাবে নিজের ভারসাম্য বজায় রাখা সুপুরুষের কাজ। এমন স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে, যাতে 'সাপও মরে এবং লাঠিও না ভাঙ্গে।' তাছাড়া প্রত্যেক অধিকারীকে স্ব-স্ব অধিকার যথাযথভাবে প্রদান করতে ইসলাম আমাদেরকে আদেশ করে। আর পরিশ্রম না করে ঘরে বসে থেকে সে সব অধিকার আদায় করা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। অতএব প্রিয় বন্ধু! প্রতিষ্ঠিত যে হতেই হবে, তা অবশ্যই বুঝতে পারছ। আশা করি যে, সামর্থ্যবান যুবক হয়ে কোনদিন তুমি তোমার 'বাড়া ভাতে ছাই' পছন্দ করবে না এবং লাঞ্ছনাময় জীবন পেয়েও সন্তুষ্ট-চিত্তে তারই মাঝে আনন্দের আলো খুঁজবে না।

হ্যাঁ, আর বিলাসপরায়ণ হতে চেষ্টা করো না। অর্থাৎ, 'ঘরে নেই ভাত, আর কোঁচা তিন হাত' করে 'নবাব খাজা খাঁ' সেজে পেটে ভাত না থাকলেও মুখে পান রাখার অভ্যাস, বাজারে গেলেই চা পান, হোটেলে ভাত শক করে খাওয়ার অভ্যাস, অপ্রয়োজনীয় কাজে পয়সা অপচয় করার নেশা খবরদার রেখো না। নচেৎ বুঝতেই তো পারছ, 'ঠাস-ঠোসকে বিকায় ঘোড়া।'

বাড়িতে বসে স্ত্রীর প্রেম-পাশে আবদ্ধ থেকে চাষ করলেই যদি দিন চলে যাবে ভাব, তাহলে মুরুব্বীদের একটি কথা অবশ্যই মনে রেখো,

'খাটে খাটায় লাভের গাঁতি,
তার অর্ধেক মাথায় ছাতি।
আর ঘরে বসে পুছে বাত,
তার কপালে হা-ভাত।'

এ সবের আগে মনে রাখবে মহানবীর মহাবাণী। তিনি বলেন, "যখন তোমরা 'ঈনা'(*) ব্যবসা করবে এবং গরুর লেজ ধরে চাষ-ক্ষেত নিয়ে সন্তুষ্ট (ব্যস্ত-সমস্ত) থাকবে। আর জিহাদ ত্যাগ করে বসবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর এমন লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন, যা ততক্ষণ পর্যন্ত দূরীভূত করবেন না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা (যথার্থরূপে) তোমাদের দ্বীনে ফিরে এসেছ।" *(আবূদাঊদ ৩৪৬২নং, বাইহাকী ৫/৩১৬, সিলসিলাহ সহীহাহ ১১নং)*

তিনি বলেন, "----- এক জাতি হবে যারা গরুর লেজ ধরে চাষবাস করবে এবং জিহাদে বিমুখতা প্রকাশ করবে, তারা হবে ধ্বংস।" *(আবূ দাঊদ ৪৩০৬, মিশকাত ৫৪৩২ নং)*

একদা তিনি হাল-চাষের কিছু সাজ-সরঞ্জামের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, "যে জাতির ঘরে এই জিনিস প্রবেশ করবে, সেই জাতির ঘরে আল্লাহ লাঞ্ছনা প্রবিষ্ট করবেন।" *(বুখারী, ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ১০ নং)*

উদ্দেশ্য এই নয় যে, চাষ করা খারাপ জিনিস বা চাষ করা লাঞ্ছনার কাজ। বরং উদ্দেশ্য হল, বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি তার চাইতে ভালো কাজ। তাছাড়া চাষবাস যেন আল্লাহর পথে সংগ্রামে বাধা না দেয়। দুনিয়ার প্রতি মনকে অধিক আকৃষ্ট না করে তোলে। আর এ কথা বাস্তব ও অনস্বীকার্য যে, এ পৃথিবীতে চাষীরাই বেশী অবহেলিত এবং সাধারণতঃ অশিক্ষিতরাই এই পেশা অবলম্বন করে থাকে।

পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ বলেন, "বল, তোমাদের নিকট তোমাদের পিতা-মাতা, তোমাদের সন্তান-সন্ততি, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য; যাতে তোমরা মন্দার আশঙ্কা কর এবং তোমাদের বাসস্থান; যা তোমরা ভালবাস - এ সব যদি আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা কর। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।" *(সূরা তাওবাহ ২৪ আয়াত)*

(*) যে ব্যবসায় বিক্রেতা ক্রেতাকে কোন জিনিস ধারে বিক্রয় করে পুনরায় বিক্রেতা নগদ ও তার চাইতে কম মূল্যে ঐ জিনিসকেই ক্রেতার নিকট থেকে ক্রয় করে।

বেকারত্ব-প্রসূত দুঃখ-জ্বালা

অভাবের তাড়নায় ও বেকারত্বের ফলে সংঘটিত দুঃখ-জ্বালা কম নয়। এ ছাড়া সংসারের ঝড়-ঝামেলাও বিভিন্নমুখী, শতরূপী। সামান্য ভুল বুঝাবুঝির দরুন যেমন দাম্পত্য-কলহ বাধে, তেমনি মনোমালিন্য ঘটে বাপ-বেটা ও শাশুড়ী-বউ-এর মাঝেও। হিংসা-জ্বালায় বিষময় হয়ে ওঠে ভাই-ভ্রাতৃত্বের সংসার। এমনিই ঘটে থাকে। না ঘটা বিরল ব্যাপার। সংসারে দুঃখ-কষ্ট একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। সুখ-দুঃখ নিয়েই মানুষের জীবন গড়া। যারা তা স্বীকার করতে চায় না, তারা আসলে জীবনকেই অস্বীকার করে। অবহেলিত পিতা-মাতা অথবা সন্তান, নিপীড়িতা গৃহবধু অথবা শাশুড়ী, লাঞ্ছিত ভাই অথবা অন্য কেউ -যেই হোক না কেন, জীবনের সমস্যাকে কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না। সমস্যা যতই আসুক তবুও তারই মাঝে সমাধানের আলো খুঁজে নিতে চেষ্টা করতে হবে। আর তারই মাঝে সন্ধান করতে হবে আনন্দময় জীবন। জীবনে সমস্যার সৃষ্টি না হলে হয়তো বা আমাদের জীবনে বাঁচার আনন্দ অর্ধেক নষ্ট হয়ে যেত। কারণ, যে ভোজনে টক নেই, সে ভোজনে তত তৃপ্তি নেই। যে ভ্রমণে বিপদের ঝুঁকি নেই, সে ভ্রমণে তত আনন্দের স্বাদ নেই। মানুষের জীবনেও দুঃখ, দুশ্চিন্তা, দৈন্য আছে বলেই জীবন কখনো একঘেয়ে হয়ে ওঠে না।

পাঁচ জনের সংসারে ভুল বুঝাবুঝি স্বাভাবিক। হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, বিদ্বেষ প্রভৃতি উল্লংঘন করে যাওয়া জীবনের এক শুভ জয়। আপদ-বিপদ, বালা-মসীবত ইত্যাদি সন্তুষ্ট-চিত্তে বরণ করে নেওয়া পূর্ণ ঈমানের পরিচায়ক। এমনই তো মু'মিনের জীবন। 'নদীতে স্রোত আছে, তাই নদী বেগবান। জীবনে দ্বন্দ্ব আছে, তাই জীবন বৈচিত্রময়।' সুতরাং এই বৈচিত্রময়তাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

এমন কেউ নেই, যার জীবনে কোন সমস্যা আসেনি। এমন কেউ নেই, যে জীবনে কোন দুঃখ পায়নি। এমন কেউ নেই, যার জীবনে কোন রিক্ততা ও তিক্ততা নেই। এমন কেউ নেই, যে জীবনভর শুধু পেয়েই গেছে এবং কখনোও কিছু হারায়নি জীবনে। পরন্তু সংসারের এক নিয়ম এই যে, কিছু পেতে হলে কিছু হারাতে হয়, কিছু লাভ করার জন্য কিছু বিসর্জন দিতে হয়।

অবশ্য মনকে এই বলে প্রবোধ দিতে হবে যে, 'জীবনের সব সন্ধ্যাই অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়। তার মধ্যে শুভ সন্ধ্যারও পদার্পণ ঘটে।' যে সন্ধ্যায় থাকে পূর্ণিমার পূর্ণশশীর মনমুগ্ধকর জ্যোৎস্নার আলো, অথবা থাকে মিলনের আকাঙ্খায় শুভ বাসরের ফুল-শয্যার প্রস্তুতি, অথবা থাকে আগামী কালের ঈদ হওয়ার সুসংবাদ।

তাছাড়া দুঃখ কিসের? যে ব্যক্তি তকদীরে বিশ্বাস রাখে, যার সাথের সাথী হল স্বয়ং পালনকর্তা আল্লাহ তাআলা, তার আবার দুঃখ কিসের? ভাগ্য নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া ওয়াজেব। মানুষ নিজ ভাগ্য নিয়ে সন্তুষ্ট হয় না বলেই দুঃখ পায়। আর এ জন্যই মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যা ভাগ করে দিয়েছেন তা নিয়ে তুষ্ট থাক, তাহলে তুমিই হবে সবার চাইতে বড় ধনী।" *(আহমাদ, তিরমিযী, সহীহুল জামে' ১০০নং)*

পরন্তু মানুষ নানা মায়াজালে আবদ্ধ হয় হয় বলেই দুঃখ পায়। যা কামনা করে তা পায় না বলেই ব্যথা-বেদনার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়ে হা-হুতাশ করে থাকে। পক্ষান্তরে যদি এমন জালে আবদ্ধ না হয়ে কোন কামনার বশীভূত না হয়, তাহলে মানুষ দুঃখের মুখ দেখে না।

কারো নিকট অতিরিক্ত অধিকার, বেশী মাত্রায় ভক্তি, অধিক পরিমাণে ভালোবাসা, অতি পরিমাণে সাহায্য-সহযোগিতা, বা মানুষ যতটার উপযুক্ত তার তুলনায় বেশী পরিমাণের মান-সম্মানের আশা করলে এবং যথা সময়ে তা না পেলে তার মনে আঘাত লাগে, দুঃখ হয়; নচেৎ কিন্তু হয় না। অতএব এরূপ আশা না রাখাই হল মনের বড় সুখ।

অবশ্য সব ধরনের সমস্যা ও দুঃখের একটি মহৌষধি ও প্রতিকার হল ধৈর্য। ধৈর্য তিক্ত; কিন্তু তার পরিণাম বড় মধুর। বৃক্ষের ছাল তিক্ত হলেও তার ফল বড় মিষ্ট। ধৈর্যধারণ করা কঠিন হলেও তার শেষ পরিণতি বড় শুভ।

আবার ধৈর্য ধরা শুরুতে কঠিন হলেও ধীরে ধীরে তাতে স্থিরতা আসে এবং পরে তা সয়ে যায়। তাছাড়া অসহ্য বলে কোন কিছু নেই। সময়ে সবই সহ্য হয়ে যায়। হরিণ বাঘের শিকার ও খাদ্য হলেও বাঘ যখন কুপোকাত হয় এবং হরিণ তার গাল চাঁটে, তখন বাঘ তাকে বলে, 'অভদ্রা বর্ষাকাল, হরিনী চাঁটে বাঘের গাল। শোনরে হরিনী তোরে কই, সময় গুণে সবই সই।' অতএব ছোটর কাছ থেকে লাথি খেলেও তা ধৈর্যের মাধ্যমে সহ্য করে নিতে হয়; বিশেষ করে যখন বদলা নেওয়ার ক্ষমতা না থাকে তখন। পরন্তু বদলা নিতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও যদি ধৈর্যধারণ করে বদলা না নেয়, তবে সেটাই হল প্রকৃত ও বড় ধৈর্য। আর এ জন্যই দেখা গেছে যে, 'শক্তির চেয়ে ধৈর্যই মানুষের জীবনে সবচেয়ে বেশী সফলতা আনতে পারে।'

মসীবত যেমনই হোক তা মসীবত। কিন্তু সব চাইতে বড় মসীবত হল মসীবতের উপর ধৈর্য না রাখতে পারা। দুঃখ-কষ্ট যেমনই হোক, ধৈর্যের তরবারি দ্বারা কেটে ফেলা ছাড়া তার আর কোনই অব্যর্থ ওষুধ নেই। অতএব দুঃখী বন্ধু আমার! মসীবতে ধৈর্য ধর ও আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নামায ও ধৈর্যের মাধ্যমে সাহায্য কামনা কর। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন।" *(সূরা বাক্বারাহ ১৫৩ আয়াত)*

যাবতীয় বিপদ আসে আল্লাহর তরফ হতে। তিনি বিপদ-আপদের মাধ্যমে মু'মিনকে পরীক্ষা করে থাকেন। সোনা পুড়িয়ে সোনার খাঁটিত্ব যাচাই করে থাকেন। কখনো ভয় দিয়ে, ক্ষুধা দিয়ে, কখনো বা জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে বান্দাকে পরীক্ষায় ফেলেন। এ পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়, যারা হা-হুতাশ বর্জন করে সমূদয় দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করে, তারাই পায় আল্লাহর তরফ থেকে সুসংবাদ। উত্তম বিনিময়ের সুসংবাদ, বেহেশ্তের শুভসংবাদ। যাদের উপর বিপদ পতিত হলে অসন্তুষ্ট ও বিচলিত না হয়ে বলে, 'ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিঊন।' আসলে তাদেরই উপরে মহান প্রতিপালকের তরফ হতে শান্তি ও করুণা বর্ষণ হয় এবং তারাই হল সুপথগামী। *(সূরা বাক্বারাহ ১৫৫- ১৫৭)*

পক্ষান্তরে কোন কোন বিপদ আসে মানুষের কোন কৃতকর্মের ফলে। কোন অসৎ কর্মের সত্বর সাজাস্বরূপ অকস্মাৎ বিপদ এসে মানুষকে সতর্ক করে যায়। তাকে ধ্বংস করার জন্য নয়; বরং তাকে নতুন করে গড়ার জন্য। মরিচা-পড়া লৌহ খণ্ডকে কর্মকার আগুনে দিয়ে

আঙ্গার করে বারবার হাতুড়ি দ্বারা পিটিয়ে থাকে, তা নষ্ট ও নিশ্চিহ্ন করার জন্য নয়; বরং নতুনরূপে কিছু তৈরী করার জন্য। মা জোর করে অনেক সময় শাস্তি দিয়েও তিক্ত ঔষধ শিশুকে সেবন করায় ছেলের প্রতি রুষ্ট হয়ে তাকে মেরে ফেলার জন্য নয়; বরং তার প্রতি স্নেহপরবশ হয়ে তাকে বাঁচিয়ে ও সুস্থ করে তোলার জন্য তা করে থাকে। কোন পশু গায়ের বল দেখিয়ে অত্যাচার শুরু করলে তাকে খাঁচায় পুরে খাওয়া বন্ধ করে শাস্তি দিয়ে জব্দ করা হয়। যে পাখীকে ক্ষুধায় রাখলে কেবল গান শোনায়, সে পাখীকে খাঁচার ভিতর ক্ষুধায় রেখে তার সুমধুর গান শুনতে অবশ্যই ভালো লাগে।

পরন্তু বান্দার কোন মসীবত এলে তাতে তার পাপ ক্ষয় হয়। এমন কি পায়ে কাঁটা ঢুকলেও তাতে মু'মিন বান্দার গোনাহ মাফ হয়। অথবা মসীবতে বান্দার মর্যাদা বর্ধন হয়। নেক বান্দার জন্য মসীবত হল আল্লাহর দেওয়া এক নেয়ামত। যে বান্দা আল্লাহর নিকট যত প্রিয় হয়, সে বান্দার মসীবত তত বড় হয়। যার প্রেম যত প্রগাঢ়, তার প্রেমের পরীক্ষাও ততোধিক কঠিন। সুতরাং মসীবতে কাতর হওয়া, মুষড়ে পড়া, বিচলিত বা ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নয়। এমন হলে মসীবত সত্যই মসীবত।

একান্ত আপনজন পর হয়ে গেছে, ধোকা দিয়েছে অথবা আঘাত হেনেছে?

আগুন, ঝড়, বন্যা বা ভূমিকম্পে বাসা-বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে?

অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, ঝড় বা বন্যায় তৈরী ফসল নষ্ট হয়ে গেছে?

গাড়ি এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? ছেলে বা আব্বা-আম্মা কেউ মারা গেছে?

চাকুরি চলে গেছে? কারো অত্যাচারে গৃহহীন ও আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছ?

ব্যবসায় মোটা টাকা নোকসান গেছে? বড় অসুখে ভুগছ?

মসীবত যেমনই হোক, দুঃখ করো না, মনমারা হয়ো না, ভেঙ্গে পড়ো না, হা-হুতাশ করো না, 'হায়-হায়' করে হায়-পস্তানি কোন কাজে দেবে না। অতএব সে আঘাত ভুলার চেষ্টা কর, মনকে শক্ত করে আবার নতুন করে জীবন গড়ে তোল। যা হারিয়ে গেছে তা ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় মহান প্রভুর নিকট ধৈর্যের সাথে সাহায্য ভিক্ষা কর। আবার লেগে যাও কাজে। কারণ, দুঃখ, ব্যথা, বেদনা থেকে বাঁচতে হলে কাজের ভিতর দিয়েই বাঁচতে হবে। নিজেকে অকেজো ভেবো না। যা হারিয়েছে তা যাবার ছিল তাই গেছে -এ কথা মনে করো। যা পাওনি তা পাবার উপযুক্ত তুমি ছিলে না -এই ধরে নিও। যা চলে গেছে তা তোমার জন্য মঙ্গলময় ছিল না -এ কথাকেও নিশ্চিতের সাথে মনে স্থান দিও। "--- কিন্তু তোমরা যা পছন্দ কর না, সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা যা পছন্দ কর, সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।" *(সূরা বাক্বারাহ ২১৬)* আর "এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তা অপছন্দ করছ।" *(সূরা নিসা ১৯ আয়াত)*

সুতরাং অতীতের ঘটনা ভুলে এবার ভবিষ্যতে মন দাও। বুক ভেঙ্গে গেছে, তবুও ভয় নেই। ভাঙ্গা বুক নিয়েই আল্লাহর উপর ভরসা করে আবার বিজয়ের আশায় খাড়া হয়ে দাঁড়াও। দুঃখ, বেদনা ও অভাবকে তোমার উন্নতির পথে বাধা মনে না করে 'পরীক্ষা' বলে ধরে নিও। তোমার পুনঃ উন্নতির পথে এই অবসরে শয়তান যেন বাদ সাধতে না পারে তার

খেয়াল রেখো। মনে রেখো মহানবীর মহাবাণী; তিনি বলেন, “সবল মু’মিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মু’মিন অপেক্ষা প্রিয় ও ভালো। অবশ্য উভয়ের মাঝেই কল্যাণ রয়েছে। তোমার যাতে উপকার আছে তাতে তুমি যত্নবান হও। আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর, আর অক্ষম হয়ে বসে পড়ো না। কোন মসীবত এলে এ কথা বলো না যে, ‘(হায়) যদি আমি এরূপ করতাম, তাহলে এরূপ হতো। (বা যদি আমি এরূপ না করতাম, তাহলে এরূপ হতো না।)’ বরং বলো, ‘আল্লাহ তকদীরে লিখেছিলেন। তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন।’ (আর তিনি যা করেন, তা বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন; যদিও তা সে বুঝতে পারে না।) পক্ষান্তরে ‘যদি-যদি না’ (বলে আক্ষেপ) করায় শয়তানের কর্মদ্বার খুলে যায়।” *(আহমদ, মুসলিম, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে’ ৬৬৫০ নং)*

সুতরাং সম্মুখের অকস্মাৎ এ মসীবত দেখে ভয় পেয়ো না। মসীবত সরে যাওয়া নিশ্চিত ব্যাপার। বিপদের যে ঘন মেঘ তোমার জীবনকে অন্ধকার করে রেখেছে তা অবশ্যই একদিন কোন হাওয়ার ঠেলায় সরে যাবে।

‘মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয় আড়ালে তার সূর্য হাসে,
হারা শশীর হারা হাসি অন্ধকারেই ফিরে আসে।’

মহান আল্লাহ বলেন, “নিশ্চয়ই দুঃখের পরেই আছে সুখ, নিশ্চয়ই কষ্টের পরে আছে স্বস্তি।” *(সূরা ইনশিরাহ ৫-৬ আয়াত)*

বিশ্বজগতের জন্য রহমত-স্বরূপ প্রেরিত নবী ﷺ বলেন, “ধৈর্যের সাথেই আছে বিজয়, বিপদের পাশেই আছে উদ্ধারের পথ এবং কষ্টের সাথেই আছে স্বস্তি।” *(সহীহুল জামে’ ৬৮০৬ নং)*

অতএব ভয় কিসের? ভয়কে জয় কর। কারণ, তুমি যেখানে একা কপালে হাত দিয়ে বসে আছ, সেখানে তুমি একা নও। দয়াবান আল্লাহ যে তোমার সাথের সাথী।

আর মনে রেখো, নদীর এক কূল ভাঙ্গলে অপর কূল গড়ে। তোমার-আমার জীবনটাও সেইরূপ। জীবন যতক্ষণ আছে বিপদ ততক্ষণ থাকবেই। জীবনের সবটাই সুখময় কারো হয় না। দুঃখ-কষ্ট নিয়েই মানুষের জীবন। কিন্তু দুঃখের পর সুখ আসবে এটাও ধ্রুব সত্য।

দুঃখের ঘড়ি ধীরে চললেও সে সময় যে কেটে যাবে তা নিশ্চিত। যে হালে আছ, সে হালের পরিবর্তন অবশ্যই ঘটবে। ফিরে আসবে আবার নতুন জীবন, নতুন উদ্যম।

‘কোনদিনই হায় পোহাবে না যাহা এমন রাত্রি নাই।’

জীবনের সে আঁধার-ঘিরা রাত্রি যতই লম্বা হোক, যেমনই হোক, যত কষ্টেরই হোক, তার অন্ধকার ভেদ করে এক সময় প্রভাতের আলো উদ্ভাসিত হবেই তোমার হৃদয় আকাশে।

‘দুর্যোগ রাতি পোহায়ে আবার প্রভাত আসিবে ফিরে।’

বিপদগ্রস্ত বন্ধু আমার! নিরাশ হয়ে মুষড়ে পড়ো না। কপালে আঘাত করে লাভ নেই। মানুষের যখন সব কিছুই হারিয়ে যায়, ভবিষ্যত তখনও অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। জীবন-গাছের খাওয়া পাতা আবার সবুজ হয়ে নতুন করে গজিয়ে উঠবে। গাছ মুড়া গেলে আবার বীজ বোনো। পুনরায় চারা গজিয়ে উঠবে। ‘যেখানে বাসনা-রথ, সেখানেই সিদ্ধির পথ।’ ‘সাধ, সাধ্য আর সাধনা, তবেই সিদ্ধির বাসনা।’ মনের বাসনাকে হতাশার অন্ধকারে হারিয়ে দিও না। তোমার যে সাধ্য আছে, তার মাঝে সাধনা এনে তাতে সিদ্ধিলাভ কর।

তোমার সৃষ্টিকর্তা তোমার মত নিরাশ-বিহ্বল ভগ্ন-হৃদয়ের মানুষের উদ্দেশ্যে বলেন, "যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে চলে, আল্লাহ তার উপায় বের করে দেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে রুযী দান করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা রাখে সে ব্যক্তির জন্য তিনিই যথেষ্ট হন। আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করেন। আল্লাহ সমস্ত কিছুর জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা স্থির করে রেখেছেন।" *(সূরা ত্বালাক ২-৩)* "যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন।" *(ঐ ৪ আয়াত)*

অতএব আল্লাহর বান্দা! ওঠ, কোমর শক্ত করে, মাথা উঁচু করে। যে মাটিতে পড়ে আছ, সে মাটিতেই ভর দিয়ে আবার উঠে দাঁড়াও। আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করবেন না।

নিরাশ হিয়ার বন্ধু আমার! বর্তমানের এ ব্যর্থতা ও বিফলতা দেখে পিছপা হয়ো না। বিফলতা মানুষকে হতাশ ও নিরাশ করে ঠিকই, কিন্তু জেনে রেখো, যারা এ হতাশাকে উল্লংঘন করে বিফলতাকে পরাভূত করেছে, তারাই তাকে ভিত্তি করে গড়ে তুলেছে সফলতা ও সৌভাগ্যের প্রাসাদ।

'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে,
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?'

দুঃখ এলে পরোয়া নেই। বিরক্তি নেই। নৈরাশ্য নেই।

'যে মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে-
বারেক হতাশ হয়ে কে কোথায় মরে?
বিপদে পতিত, তবু ছাড়িব না হাল,
আজিকে বিফল হলে, হতে পারে কাল।'

জীবনে পরাজয় আসার পর অলসভাবে বসে থাকা জ্ঞানীর কাজ নয়। যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করতে চেষ্টা করাই হল বুদ্ধিমানের কাজ। সবল মু'মিন সাতবার বিপদে পড়লেও আবার ওঠে। কিন্তু দুর্বল মনের অসৎ মানুষ একবার বিপদে পড়লেই আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ্য প্রকাশ করে; ফলে সে আর উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হয় না।

দয়ার নবী ﷺ বলেন, "মু'মিনের উপমা হল গম গাছের মত; যে হাওয়ার চাপে কখনো নুয়ে পড়ে, আবার তখনই সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে মুনাফিক ও কাফেরের উপমা হল 'আরযা' (Cedar) গাছের মত; যা হাওয়ার চাপের মুখেও সোজা খাড়া থাকে। কিন্তু (সামলাতে না পেরে) অবশেষে ভেঙ্গে শেষ হয়ে যায়।" *(সহীহুল জামে' ৫৮৪৪ নং)*

পতন জীবনে আসতেই পারে। পতনকে যে ভয় করে, সে আসলে জীবনে জয়লাভ করতে পারে না। আবার পতন অনেক সময় মানুষের উপকারও করে। পতন মানুষের সফলতা আনে, প্রচ্ছন্ন সত্যকে উপলব্ধি করতে সহায়তা করে, উদাসীন হৃদয়কে জাগ্রত করে তোলে। অতএব তোমার এ পতনে বড় মঙ্গল অবশ্যই আছে।

আর গরীব বা নিঃস্ব বলে দুঃখ করো না বন্ধু আমার! কারণ, আসল নিঃস্ব তো সেই, যে কিয়ামতে নিঃস্ব। তাছাড়া জেনে রেখো যে, গরীবরাই অধিকাংশ বেহেশ্তে যাবে।

হ্যাঁ, আর আত্মহত্যা করার কথা মনেও এনো না। আত্মহত্যা কেন করবে? হয়তো দুঃখের তাড়নায় এই ভাববে যে, মরণেই তোমার শান্তি আছে। মরতে পারলেই তোমার সকল দুঃখ-

জ্বালা দূর হয়ে যাবে। কিন্তু তার নিশ্চয়তা কোথায়? তুমি কি জান না, মরণের ওপারে তোমার জন্য কি অপেক্ষা করছে? কবরের পরীক্ষা এবং হয়তো বা আযাব ও আখেরাতের ভয়ংকর শাস্তি। তার জন্য তোমার প্রস্তুতি আছে কি? সে শাস্তি থেকে তুমি অব্যাহতি পাবে, তার নিশ্চয়তা আছে কি? যদি না থাকে তাহলে সে দুঃখ-জ্বালা যে এ দুঃখ-জ্বালা থেকে বহু গুণ বেশী!

তাছাড়া তুমি তো জানো যে, আত্মহত্যা মহাপাপ। মনের ধিক্কারে তুমি নিজেকে হত্যা করবে -এ অধিকার তোমার নেই। তুমি যেমন অপরকে খুন করতে পার না, তেমনিই পার না নিজেকে খুন করতে। তা তোমার নিজের জীবন হলেও সে তো সৃষ্টিকর্তারই আমানত। তাতে খেয়ানত করলে অবশ্যই অপরাধী সাব্যস্ত হবে তাঁর নিকট। তাই তিনি মানুষকে আত্মহত্যা করতে নিষেধ করেছেন। *(সূরা নিসা ২৯ আয়াত)* নিষেধ করেছেন নিজেকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিতে। *(সূরা বাক্বারাহ ১৯৫ আয়াত)*

আর পরকালে এ কাজের শাস্তির কথা শোন। মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন পাহাড় হতে নিজেকে ফেলে আত্মহত্যা করবে সে ব্যক্তি জাহান্নামেও সর্বদা ও চিরকালের জন্য নিজেকে ফেলে অনুরূপ শাস্তিভোগ করবে। যে ব্যক্তি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে সে ব্যক্তি জাহান্নামেও সর্বদা চিরকালের জন্য বিষ পান করে যাতনা ভোগ করবে। আর যে ব্যক্তি কোন লৌহখন্ড (ছুরি ইত্যাদি) দ্বারা আত্মহত্যা করবে সে ব্যক্তি জাহান্নামেও ঐ লৌহখন্ড দ্বারা সর্বদা ও চিরকালের জন্য নিজেকে আঘাত করে যাতনা ভোগ করতে থাকবে।" *(বুখারী ৫৭৭৮, মুসলিম ১০৯নং প্রমুখ)*

আল্লাহর রসূল ﷺ আরো বলেন, "যে ব্যক্তি ফাঁসি নিয়ে আত্মহত্যা করবে সে ব্যক্তি দোযখেও অনুরূপ ফাঁসি নিয়ে আযাব ভোগ করবে। আর যে ব্যক্তি বর্শা বা ছুরিকাঘাত দ্বারা আত্মহত্যা করবে সে ব্যক্তি দোযখেও অনুরূপ বর্শা বা ছুরিকাঘাত দ্বারা (নিজে নিজে) আযাব ভোগ করবে।" *(বুখারী ১৩৬৫নং)*

অবশ্য পরকালের এ সব কথার উপর তোমার যদি বিশ্বাস না থাকে এবং এ বিশ্বাস না রেখেই তুমি আত্মহত্যা কর, তাহলে অবস্থা আরো ভয়ানক। কাফের হয়ে মারা গেলে কুফরীর শাস্তি তো তোমার অজানা নয়। তুমি মুসলিম। তোমার কর্মকান্ড হওয়া উচিত ইসলামের ভিত্তিতেই। কেন ক্ষতি করবে নিজের ইহ-পরকালের এবং তোমার ছেড়ে যাওয়া আব্বা-আম্মা বা ছেলে-মেয়েদের?

পরিশেষে একটি কথা মনে রেখো যে, যে অবস্থাতেই থাক, হীনম্মন্যতার শিকার হয়ে পড়ো না। ছোট কাজ করলেও নিজেকে ছোট ও নীচ ভেবে বসো না এবং সেই সাথে নিজের চরিত্রকেও হীন করে ফেলো না। মাথা উঁচু করে নিজের উন্নতির কথা সর্বদা মনে রেখো। নীচ হয়ে থাকা এবং উন্নতির আশা-আকাঙ্খা না করা হীনতার পরিচয়। আল্লাহর দেওয়া রুযী পেয়ে সন্তুষ্ট থেকেই উন্নতি ও বর্কতের আশা কর। আর উন্নতির সোপান বেয়ে চড়তে হলে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে সে কথা ভুলে যেও না।

একদা এক কুকুর এসে এক সিংহকে বলল, 'হে পশুরাজ! আমি আমার নাম পরিবর্তন করতে চাই। দয়া করে আমার নামটা বদলে দিন। কারণ আমার নামটা বড় বিশ্রী ও অসভ্য।'

সিংহ বলল, 'তুমি তো বিশ্বাসঘাতক ও নির্লজ্জ। তোমার আচরণ বড় হীন। অতএব এ নামই তোমার জন্য যথার্থ ও সার্থক।'

কুকুর বলল, 'তাহলে আমাকে পরীক্ষা করে দেখে নিন, আমি সুন্দর নামের কাজ করতে পারি কি না।'

সিংহ কুকুরকে এক টুকরা গোশ্ত্ দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। এটা আমার জন্য কাল পর্যন্ত তোমার কাছে যত্ন করে আমানত রেখে দাও। কাল আমি তোমার কাছ থেকে এটা নেব, আর তোমার নাম পাল্টে দিয়ে এক সুন্দর মত নাম রেখে আসব।'

গোশ্ত্ টুকরাটি নিয়ে কুকুর বাসায় ফিরল। ক্ষিদে লাগলে সে গোশ্তের দিকে তাকিয়ে জিভের লাল ফেলতে শুরু করল। খাওয়ার ইচ্ছে হলেও নাম পাল্টাবার কথা মনে পড়লে ধৈর্যের সাথে সিংহের অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু যখনই তার প্রবৃত্তিতে লালসার উদ্রেক হল তখনই আর ধৈর্যের বালির বাঁধ আটকে রাখতে পারল না। অবশেষে 'ভালো নাম নিয়েই বা আর কি হবে? 'কুকুর'ও তো ভালো নাম।' -এই বলেই সে গোশ্ত্ টুকরাটি খেয়েই ফেলল।

এরূপ উদাহরণ হল চরিত্রহীন নীচমনা মানুষদের; যারা স্বার্থের খাতিরে নিজেদের হীন আচরণ বর্জন করতে পারে না। অথবা লালসার ফলে নিজেদের প্রবৃত্তি দমন করতে পারে না। এ শ্রেণীর মানুষকে অনেক সময় চা পান করতে বললে বলে, 'আমার জন্য চা খাওয়া নিষেধ। কারণ, আমার ডায়াবেটিস আছে।' কিন্তু পরক্ষণে পাতে বড় বড় রসগোল্লা এলে তখন আর লোভ সামলাতে না পেরে বলে, 'দু'-একবার মিষ্টি খেলে কিছু ক্ষতি হয় না।'

মোট কথা, মনকে ধরে রাখা সবল ও দৃঢ় মনোবলশালী ব্যক্তিত্বের পরিচয়। তোমাকে সেইরকম একটা শক্ত মনের মানুষ হওয়ার কথাই বলছি। উঁচু দরের মানুষ হতে হলে উঁচু দরের খেয়াল হতে হবে, উঁচু আশা ও মনোবল রাখতে হবে। যেমন উঁচু দরের মানুষ হয়ে নীচ মনের পরিচয় দেওয়াও বর্জন করতে হবে। 'জাতে গোয়াল হয়ে কাঁজি ভক্ষণ' স্বভাব অবশ্যই জাত মানুষের নয়।

উঁচু হিম্মতের মন হল, উঁচু আকাশে উড়ন্ত পাখীর মত। যে পাখী অন্যান্য পাখীর মত নীচুতে উড়তে রাজী নয়। যে পাখীর নিকট সেই বিপদ-আপদ পৌঁছে না যা নীচে উড়ন্ত পাখীর নিকটে পৌঁছে থাকে। তাই হিম্মত যত উঁচু হবে মন তত আপদমুক্ত হবে। আর হিম্মত যত নীচু হবে মনও তত আপদগ্রস্ত হবে। সুতরাং উঁচু হিম্মত মানুষের সফলতার শিরোনাম। পক্ষান্তরে নীচু হিম্মত তার বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার নিদর্শন।

হে মুসলিম যুবক! তুমি তোমার আচরণ, ব্যবহার, চরিত্র, শিক্ষা, অধ্যবসায়, অর্থোপার্জন ও দ্বীনদারীতে উঁচু হিম্মত, সংকল্পবদ্ধ মন এবং উন্নত ও উদ্যমশীল হৃদয়ের অধিকারী হও -এই কামনা করি।

যুবক এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও প্রগতি

বহু যুবকের ধারণা এই যে, ইসলাম মানেই হচ্ছে পরাধীনতার জীবন। অর্থাৎ, মুসলিমের জীবনে কোন প্রকার স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্য নেই। ইসলাম শক্তি ও প্রগতির বিরোধী। এর ফলে তারা ইসলাম থেকে দূরে সরতে থাকে এবং তার নামে অবজ্ঞায় নাক সিঁটকায়। মনে করে ইসলাম এক পশ্চাদ্‌গামী ধর্ম। যে তার অবলম্বীদের হাত ধরে পশ্চাৎ ও অবনতির দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং তাদেরকে উন্নতি, প্রগতি ও অগ্রগতির পথে বাধা দান করে।

এটি একটি নিছক সন্দেহ ও ভ্রান্ত ধারণা মাত্র এবং ইসলাম-প্রিয় যুবকদের জন্য একটি সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানকল্পে ঐ ভ্রষ্ট যুবকদের সম্মুখে ইসলামের প্রকৃত রূপ প্রকাশ হওয়া এবং তার প্রতি আরোপিত অপবাদের আবরণমুক্ত হওয়া উচিত; যারা তাদের ভ্রান্ত ধারণা অথবা স্বল্প জ্ঞান মতে অথবা উভয় মতে ইসলামের আসল চিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞাত। আর জানা কথা যে, পীড়া-জনিত কারণে যার মুখ তিক্ত হয়ে আছে তাকে ঐ মুখে সুমিষ্ট পানিও তেঁতো লাগবে। যেমন জলাতঙ্ক রোগের রোগী স্বচ্ছ পানিতেও কুকুর দেখে থাকে।

বাস্তব এই যে, ইসলাম মানুষকে পার্থিব জীবনের সুখ লুটতে বাধা দেয় না। মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে না। অবশ্য জীবনের সীমারেখা নির্ধারিত করে। মানুষের পায়ের বেড়ি দিয়ে পথ চলতে বাধা সৃষ্টি করে না। বরং চলার পথ নির্ধারিত, নির্দিষ্ট ও সীমিত করে। সৎপথে চলতে নির্দেশ দেয় এবং অসৎ পথে চলতে বাধা দান করে। আর এ কথা ধ্রুব সত্য যে, যে পথে সুখ উপভোগ করতে ইসলাম বাধা দেয়, সে পথে আপাতঃদৃষ্টিতে মানুষের সাময়িক সুখ থাকলেও, আসলে কিন্তু সুখ নেই অথবা সে সুখের পর দুঃখ আছে। পক্ষান্তরে ইসলামের নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত পথে আছে পরম ও চরম সুখ এবং তার পরে কোন দুঃখ নেই।

ইসলাম মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব করে না। ইসলাম কোন পরাধীন জীবন অতিবাহিত করতে আহ্বান করে না। অবশ্য স্বেচ্ছাচারিতায় বাধা দিয়ে সৃষ্টিকর্তার আনুগত্যপূর্ণ সুশৃঙ্খলময় জীবন গড়তে আদেশ করে। সকল প্রকার স্বাধীনতাকে সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করে। স্বাধীনতা যাতে স্বৈরাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতায় বদলে না যায় তার বিশেষ নির্দেশনা দান করে। যাতে সীমা ও শৃঙ্খলহীন স্বাধীনতার জীবনে এক ব্যক্তির স্বাধীনতা অপর ব্যক্তির স্বাধীনতার সাথে সংঘর্ষ না বাধায়। কারণ, যে ব্যক্তি সীমাহীন সর্বপ্রকার স্বাধীনতা চাইবে, নিশ্চয় সে ব্যক্তি অন্যের স্বাধীনতা হরণ ও খর্ব করবে। যেহেতু, তাছাড়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ সম্ভবই নয়। পরন্তু তা লাভ করতেই হলে সমগ্র স্বাধীনতার মাঝে সংঘাত সৃষ্টি হবে এবং তারপরই সৃষ্টি হবে নানা বিঘ্ন ও বিশৃঙ্খলা।

অতএব ইসলাম চায়, মানুষের জীবনকে শৃঙ্খলা ও সীমাবদ্ধ করতে। তাই তো মহান আল্লাহ দ্বীনী হুকুম-আহকামকে 'হুদূদ' বা সীমারেখা বলে অভিহিত করেছেন। কাজ হারাম হলে বলা হয়েছে, "এগুলি আল্লাহর সীমারেখা, সুতরাং এর ধারে-কাছে যেও না।" *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৭ আয়াত)* আর ওয়াজেব হলে বলা হয়েছে, "এগুলি আল্লাহর সীমারেখা, অতএব

তা তোমরা লংঘন করো না।" *(ঐ ২২৯ আয়াত)*

বলাই বাহুল্য যে, কিছু লোকের ঐ কল্পিত পরাধীনতা এবং ইসলামের নির্দেশাবলী ও সুশৃঙ্খলতা; যা প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ সৃষ্টিকর্তা তাঁর বান্দাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে।

অতএব যুবকের মনে এ ধরনের কোন সমস্যা প্রকৃতপক্ষে কোন সমস্যাই নয়। যেহেতু শৃঙ্খলা ও নিয়মধারার অনুবর্তী হয়ে চলা এ বিশ্বের সর্বক্ষেত্রে নিত্য-ঘটিত, স্বাভাবিক ও বাঞ্ছিত ব্যাপার। মানুষও প্রকৃতিগতভাবে এই নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীনস্থ। তাই তো সে ক্ষুৎ-পিপাসার বশবর্তী এবং পান-ভোজনের মুখাপেক্ষী। নিয়মিত ও পরিমিত পরিমাণে উপযুক্ত গুণসম্পন্ন পানাহার করতে বাধ্য থাকে। যাতে সে নিজের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা করতে পারে। কিন্তু স্বেচ্ছামত চললে অসুস্থতা ও বিভিন্ন ব্যাধির জন্ম হয়।

যেমন মানুষ সামাজিক রীতি-নিয়মের অনুবর্তী, স্বদেশী চাল-চলন, আবাস-লেবাস প্রভৃতির অনুরক্ত। এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়তের ব্যাপারে পাশপোর্ট-ভিসার নিয়ম, স্বদেশী আইন-কানুন, ট্রাফিক-কানুন প্রভৃতির অনুগত। এ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতা চালালে সমাজে ঘৃণ্য হতে হয়, আইন-লংঘনের প্রতিফল ভোগ করতে হয়। পথিমধ্যে বিপদগ্রস্ত হতে হয়।

সুতরাং বিশ্ব-সংসারই নির্ধারিত সীমারেখা ও নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন। আর এর ফলেই বাঞ্ছিত মতে সকলের জীবন ও কাজকর্ম চলে। অতএব সামাজিক কল্যাণ লাভ করতে এবং বিশৃঙ্খলা ও বিঘ্ন দূর করতে সকল মানুষের জন্য মানব-রচিত সামাজিক রীতি-নীতির বাধ্য থাকা যদি জরুরী হয়, তাহলে অনুরূপভাবে উম্মাহর কল্যাণের জন্য এবং সার্বিক মঙ্গল আনয়নের জন্য সকল মানুষের পক্ষে স্রষ্টার প্রেরিত শরীয়তের বিধি-বিধান ও নিয়ম-নীতির অনুবর্তী হওয়া একান্ত জরুরী। তবে কেন ও কি ভেবে কিছু মানুষ এ শাশ্বত নিয়ম-শৃঙ্খলাকে অবজ্ঞা ও অস্বীকার করে এবং তা মানুষের জন্য পরাধীনতা বলে মনে করে? নিশ্চয় তা প্রকাশ্য অপবাদ এবং ভ্রান্ত ও পাপময় ধারণা ছাড়া কিছু নয়। *(মিন মুশকিলাতিশ শাবাব, ইবনে উসাইমীন ২০-২২পৃঃ)*

এ জগতে একমাত্র পাগলেরই আছে পূর্ণ স্বাধীনতা, সেই কেবল যাচ্ছে তাই করে বেড়াতে পারে। অবশ্য সে স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে গিয়ে অনেক সময় গলা-ধাক্কাও খেয়ে থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা এ পৃথিবীর কারো নেই। প্রত্যেকে কোন না কোন নিয়মের পরাধীন অবশ্যই থাকে। তা না হলে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যেক জিনিসের পশ্চাতে একটা না একটা বাঁধন আছে, নিয়ন্ত্রণ জোড়া আছে। নচেৎ, বিপদ অনিবার্য। আগুন, পানি, বাতাস, খাদ্য, যাই বল না কেন, সবকিছুর ব্যবহার বিধি নিয়ন্ত্রিত। ঘোড়ার লাগাম না থাকলে বা গাড়ির ব্রেক না থাকলে ঘোড়া বা গাড়ি কি ঠিক মত ঈপ্সিত পথে চলে থাকে, না কেউ চালাতে পারে? মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা-গবেষণাও অনুরূপ নিয়ন্ত্রিত। ষড়্‌রিপুর নাকেও দড়ি দেওয়া আছে। তা না হলে পৃথিবীতে কেউ শান্তিতে বাস করতে পেত না। মানুষ মানুষরূপে বাস করতে পারত না; বরং পশুর চাইতেও অধম হয়ে নিজ নিজ স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে গিয়ে আপোসে লড়ে ধ্বংস হয়ে যেত।

অতএব প্রত্যেক বস্তুর নিয়ন্ত্রিত দিকটাই ভালো। শৃঙ্খলিত সবকিছুই মানুষের ঈপ্সিত।

উচ্ছৃঙ্খলতা সভ্য সমাজ পছন্দ করতে পারে না। কেউ চায় না নিয়ন্ত্রণহারা পানি বা বন্যার অদম্য গতি। কেউ চায় না আগুন তার রান্নাঘর থেকে আয়ত্তের বাইরে চলে যাক।

কলেজ থেকে ফিরার পথে বেসামাল ড্রেসে চামেলী বাসায় ফিরছিল। এমন বেসামাল পোশাকে আবেদনময়ী ভঙ্গিমায় চলাতে তার স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে এক দল যুবক তার সে মস্তানা চলন দেখে তার উপর হামলা করে তার রাঙা যৌবন লুটে নিল। ধর্ষিতা ও খুন হল চামেলী দুর্ধর্ষ যুবকদলের হাতে। অবশ্য যুবকদলেরও এতে স্বাধীনতা ছিল।

অন্যায়ভাবে অবৈধ উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করাতে তোমার-আমার স্বাধীনতা আছে। তেমনি ডাকাতেরও স্বাধীনতা আছে ডাকাতি করার। চোরেরও স্বাধীনতা আছে বিনা বাধায় চুরি করার।

গাড়ি-ওয়ালার স্বাধীনতা আছে, সে যেদিকে খুশী সেদিকে চালাতে পারে। যখন ইচ্ছা তখন বাঁয়ে অথবা ডাইনে সাইড নিতে পারে। এতে কার কি বলার থাকতে পারে?

স্বামীর স্বাধীনতা আছে 'গার্ল ফ্রেন্ড্' রাখার, তেমনি স্ত্রীরও স্বাধীনতা আছে 'বয় ফ্রেন্ড্' ব্যবহার করার। কোন কোন রাত্রি যদি স্ত্রী বাসায় বাস না করে তার সে বন্ধুর বাসায় বাস করে, তবে তাতে স্বামীর প্রতিবাদের কি আছে?

আশা করি এমন স্বাধীনতাকে কোন জ্ঞানী মানুষই বিশ্বাস ও সমর্থন করবে না। যে স্বাধীনতা অপরের স্বাধীনতায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, সে স্বাধীনতা হল স্বেচ্ছাচারিতা ও মহা অপরাধ। সংঘর্ষহীন বল্গাধীন স্বাধীনতা শান্তিকামী মনুষ্য সমাজের অভিপ্রেত বস্তু।

অতএব বাক্-স্বাধীনতার অর্থ যা ইচ্ছে তাই বলা নয়, তারও নিয়ন্ত্রণ-সীমা আছে। ন্যায়-অন্যায়ের মানদন্ড আছে।

ব্যক্তি-স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, যে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। এতেও ন্যায়-অন্যায়, পরোপকার, অপরের লাভ-ক্ষতি ও স্বাধীনতার কথাও খেয়াল রাখা জরুরী।

মতামতের স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, যে যা ইচ্ছা তাই মন্তব্য করবে। বিনা দলীলে যা মন তাই মনগড়া মত প্রকাশ করবে এবং ন্যায়কে অন্যায় বা তার বিপরীত প্রমাণ করার জন্য বিষাক্ত কলম ব্যবহার করবে।

এ বিশ্ব আল্লাহর। তিনিই বিশেষ অনুগ্রহে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আমরা তাঁরই আজ্ঞাবহ দাস। অতএব প্রভুর কাছে দাসের স্বাধীনতা আবার কি? সকল ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ। মানুষের হাতে আর কতটুক ক্ষমতা আছে? আর পূর্ণ ক্ষমতা না থাকলে কি স্বাধীন হওয়া যায়?

পরিশেষে এ বিষয়ে একটি মূল্যবান উপদেশ শোন। একদা এক ব্যক্তি ইবরাহীম বিন আদহাম (রঃ) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'হে আবূ ইসহাক! আমি বড় গোনাহগার। অতএব আমাকে কিছু নসীহত করুন; যাতে আমি গোনাহ থেকে বিরত হতে পারি।'

আবূ ইসহাক (ইবরাহীম) বললেন, 'যদি তুমি পাঁচটি উপদেশ গ্রহণ কর এবং তদনুযায়ী আমল কর, তাহলে গোনাহ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।' লোকটি বলল, 'বলুন।'

ইবরাহীম বললেন, 'প্রথম এই যে, আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করলে তুমি তাঁর রুযী খেয়ো না।'

লোকটি বলল, 'তাহলে খাব কি? দুনিয়াতে সবকিছুই তো তাঁরই দেওয়া রুযী!'

বললেন, 'ওহে আল্লাহর বান্দা! তুমি তাঁর রুযী খাবে, অথচ তাঁর অবাধ্যাচরণ করবে। এটা

কি তোমার বিবেকে ভালো মনে হবে।'

বলল, 'অবশ্যই না। দ্বিতীয় কি বলুন।'

বললেন, 'যদি তুমি তাঁর অবাধ্যাচরণ করতেই চাও তাহলে খবরদার তাঁর রাজত্বে বাস করো না।'

বলল, 'এটা তো বিরাট মুশকিল! তাহলে বাস করব কোথায়?'

বললেন, 'ওহে আল্লাহর বান্দা! তুমি তাঁর রুযী খাবে, তাঁর রাজত্বে বাস করবে, অথচ তাঁর নাফরমানী করবে, এটা কি তোমার উচিত হবে?'

বলল, 'অবশ্যই না। তৃতীয় কি বলুন।'

বললেন, 'তাঁর রুযী খেয়ে তাঁর রাজত্বে বাস করেও যদি তাঁর নাফরমানী করতে চাও, তাহলে এমন জায়গায় করো, যেখানে তিনি তোমাকে দেখতে পাবেন না।'

বলল, 'হে ইবরাহীম! তা কি করে সম্ভব? তিনি তো আমাদের মনের গোপন খবরও জানেন!'

বললেন, 'তাহলে তাঁর রুযী খেয়ে, তাঁর রাজত্বে বসবাস করে, তাঁর দৃষ্টির সামনে তুমি তাঁর অবাধ্যাচরণ করবে এবং তাঁর জ্ঞানায়ত্তে থেকেও পাপাচরণ করবে, এতে কি তোমার লজ্জা হবে না?'

বলল, 'অবশ্যই। চতুর্থ কি বলুন।'

বললেন, 'মালাকুল মওত যখন তোমার জান কবজ করতে আসবেন, তখন তাঁকে তুমি বলো যে, (আমি স্বাধীন। আমি মরব না অথবা) আমাকে আর ক'টা দিন সময় দিন; যাতে আমি খালেস তওবা করে নিয়ে ভালো কাজ করে নিতে পারি।'

বলল, 'তিনি তো আমার এ অনুরোধ মেনে নেবেন না।'

বললেন, 'ওহে আল্লাহর বান্দা! তাহলে তওবা করার জন্য যদি তুমি মরণকে বাধা দিতে না পার, আর তুমি জান যে, মৃত্যু এসে গেলে আর ক্ষণকালও দেরী করা হবে না, তাহলে মুক্তির আশা কিরূপে করতে পার?'

বলল, 'পঞ্চমটা বলুন।'

বললেন, 'কিয়ামতের দিন দোযখের প্রহরিগণ যখন তোমাকে দোযখে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসে উপস্থিত হবেন, তখন তুমি তাঁদের সাথে যেও না।'

বলল, 'তাঁরা তো আমাকে ছেড়ে দেবেন না। আমার সে আবেদন তাঁরা মানবেন না।'

বললেন, 'তাহলে নাজাতের আশা কেমন করে করতে পার?'

বলল, 'হে ইবরাহীম! যথেষ্ট, যথেষ্ট। আমি এক্ষনি আল্লাহর নিকট তওবা করছি এবং কৃতপাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

হ্যাঁ, মানুষ সর্ববিষয়ে স্বাধীন নয়। মানুষ তো দাস। মহান স্রষ্টা আল্লাহর দাস। আর এ দাসত্বে আছে তার পরম আনন্দ। এ পরাধীনতায় আছে প্রেমের সুমধুর স্বাদ। প্রেম তো পরাধীনতারই এক নাম।

তদনুরূপ ইসলাম প্রগতি ও বিজ্ঞান বিরোধী নয়। বরং ইসলাম সভ্যতা, সংস্কৃতি, চিন্তা, জ্ঞান, গবেষণা, সুস্বাস্থ্য প্রভৃতি সার্বিক প্রগতি ও শক্তির প্রশস্ত ময়দান।

ইসলাম মানুষকে চিন্তা ও গবেষণা করতে আহ্বান করে। যাতে সে উপদেশ গ্রহণ করে ভালো-মন্দ নির্ণয় করতে পারে এবং নিজ জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি করতে পারে। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, "বল, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি; তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দু'জন করে অথবা একা একা দাঁড়াও, অতঃপর চিন্তা কর-------।" *(কুঃ ৩৪/৪৬)* "বল, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার প্রতি লক্ষ্য কর----।" *(কুঃ ১০/১০১)*

চিন্তা ও গবেষণা করার প্রতি মানুষকে আহ্বান করেই ইসলাম ক্ষান্ত নয়। বরং যারা জ্ঞান-গবেষণা ও চিন্তা করে না তাদের প্রতি আক্ষেপ ও নিন্দাবাদ করে।

মহান আল্লাহ বলেন, "তারা কি লক্ষ্য (গবেষণা) করে না আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের প্রতি এবং আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি----।" *(কুঃ ৭/১৮৫)* "ওরা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখে না (চিন্তা করে না) যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু যথাযথভাবেই সৃষ্টি করেছেন।" *(কুঃ ৩০/৮)* "আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি তাকে তো জরাগ্রস্ত করে দিই, তবুও কি ওরা জ্ঞান করে না?" *(কুঃ ৩৬/৬৮)*

ইসলামের এই চিন্তা ও জ্ঞান-গবেষণা করতে আদেশ দেওয়ার অর্থই হল, জ্ঞান ও চিন্তাশক্তির দ্বার উন্মুক্ত করা। অতএব তারা কি করে বলে যে, 'ইসলামে বিভিন্ন শক্তির অবক্ষয় ঘটে।' তাদের মুখ-নিঃসৃত বাক্য কি উদ্ভট! তারা কেবল মিথ্যাই বলে।"

ইসলাম তার অনুসারীদের জন্য তাদের ঈমান, জান, মান, জ্ঞান ও ধনের পক্ষে অহিতকর বা ক্ষতিকর নয় এমন সকল প্রকার সম্ভোগকে বৈধ করেছে। তাই সমস্ত উত্তম ও উপাদেয় খাদ্য-পানীয়কে হালাল করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর এবং আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর----।" *(কুঃ ২/১৭২)* "---এবং তোমরা পানাহার কর, আর অপচয় করো না। তিনি অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না।" *(কুঃ ৭/৩১)*

প্রজ্ঞা ও প্রকৃতি অনুসারে সমস্ত পরিচ্ছদ ও সৌন্দর্যকে বৈধ করেছেন। তিনি বলেন, "হে আদম সন্তান দল! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদের উপর পরিচ্ছদ অবতীর্ণ করেছি। আর 'তাকওয়া' (সংযমতা)র পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট।" *(কুঃ ৭/২৬)* "বল, বান্দাদের জন্য আল্লাহর সৃষ্ট সৌন্দর্য এবং উত্তম জীবিকা কে হারাম (নিষিদ্ধ) করেছে? বল, পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে এ সমস্ত তাদের জন্য, যারা ঈমান এনেছে।" *(কুঃ ৭/৩২)* আর মহানবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। তিনি তাঁর দেওয়া নেয়ামতের চিহ্ন বান্দার দেহে দেখা যাক, তা পছন্দ করেন। " *(সহীহুল জামে' ১৭৪২ নং)*

বিধিসম্মত বিবাহ-বন্ধনের মাধ্যমে তিনি যৌন-সম্ভোগও বৈধ করেছেন। তিনি বলেন, "---তবে বিবাহ কর (স্বাধীনা) নারীদের মধ্য হতে যাকে তোমাদের ভালো লাগে; দুই, তিন অথবা চার। আর যদি আশঙ্কা কর যে, (তাদের মধ্যে) সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে----।" *(কুঃ ৪/৩)*

ব্যবসা ও অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে ইসলাম তার অনুসারীদের অগ্রগতিকে গতিহীন করতে চায়নি। বরং তাদের জন্য সর্বপ্রকার অনুমতিপ্রাপ্ত হালাল ও ইনসাফপূর্ণ বাণিজ্য ও

অর্থোপার্জনকে বৈধ ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, “---অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ করেছেন এবং সূদকে অবৈধ করেছেন।” *(কুঃ২/২৭৫)* “তিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন, অতএব তোমরা দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ কর, আর তাঁরই প্রতি (সকলের) পুনরুত্থান।” *(কুঃ ৬৭/১৫)* “অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর----।” *(কুঃ ৬২/১০)*

সুতরাং এর পরেও কি কিছু মানুষের এই ধারণা রাখা সঠিক যে, ইসলাম শক্তি অর্জন, প্রগতি ও উন্নয়নের পথে বাধা দেয়? *(মিন মুশকিলাতিশ শাবাব ২২-২৫পৃঃ)*

আজ বহু যুবকের মনে এ প্রশ্ন বারংবার উঁকি মারে যে, মুসলিম শ্রেষ্ঠ জাতি হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমরা সর্ববিষয়ে উন্নত নয় কেন? কেন পার্থিব ধন-সম্পদ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথে তারা বহু পিছিয়ে রয়েছে?

প্রথমতঃ আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, জাতির হাতে যে অর্থভান্ডার কম আছে তা নয়। আর্থিক দিক দিয়ে এ জাতি পিছিয়ে নেই। অবশ্য অর্থ যথার্থভাবে ব্যয় করার পথে এরা পিছিয়ে আছে। অর্থ যাদের হাতে আছে তারা জাতির উন্নয়নের কাজে তা যথাযথ ব্যয় করার পরিবর্তে নিজেদের বিলাস-ব্যসনে অধিক ব্যয় করেছে। বিভিন্ন স্মৃতি-বিজড়িত বিলাস-ভবন নির্মাণ করেছে, কিন্তু কোন উন্নয়নমূলক জ্ঞান-ভবন নির্মাণ করেনি। যারা করেছে তারা যথেষ্ট আকারে তা করেনি। প্রয়োজনের তুলনায় সে ব্যয় ছিল নেহাতই কম।

তাছাড়া মুসলিম দুনিয়া হারিয়েছে বহু শাসকের দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে অধিক মত্ত হওয়ার ফলে। নিজেদের অবজ্ঞা ও অবহেলাবশে, গৃহযুদ্ধ ও আত্মকলহের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ার কারণে শুধু দুনিয়াই নয়; বরং অমূল্য ধন দ্বীনও হারিয়েছে। কত তাতার, কত হালাকু, কত চেঙ্গিজ এসে এ জাতির বুকে অত্যাচারের রুলার চালিয়েছে। কত শত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অমূল্য ভান্ডার ভাসিয়ে দিয়েছে দিজলা নদীর পানিতে। জাতির অর্থনৈতিক কাঠামো ধ্বংস করে দিয়ে কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে মুসলিমদের। শাসকদল অবহেলা ও ঔদাস্যের শিকার হয়ে নিজেদের রাজ্য তুলে দিয়েছে অত্যাচারী ও আগ্রাসী ঔপনিবেশিকদের হাতে। মুসলিম ধীরে-ধীরে শিকার হয়ে পড়েছে হীনম্মন্যতার। পক্ষান্তরে সরে পড়েছে নিজ জীবন-ব্যবস্থা থেকে বহু দূরে।

অন্যান্য জাতি অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের কোন তমীজ করেনি; বরং তারা হালাল-হারাম তো চেনেই না। তারা শোষণ ও জুলুমবাজির কোন বাধাই মানেনি। বিশেষতঃ সূদী-কারবারের মাধ্যমে অর্থ সঞ্চয় করে দুনিয়া নিজেদের মনমত গড়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু মুসলিম তা পারেনি; আর পারেও না তা করতে।

পারে না সূদী কোন কারবার বা ব্যাংক চালাতে।

পারে না বর্তমানের অর্থনৈতিক সবচেয়ে সহজ উপায় হিসাবে ব্যাংকের সূদ নিতে।

পারে না কোন সূদী ব্যাংকে চাকুরী করতে।

পারে না কোন মাদকদ্রব্যের ব্যবসা করতে।

পারে না কোন মদ্যশালা চালাতে।

পারে না কোন ফিল্ম-ইন্ডাষ্ট্রী চালাতে।

পারে না কোন সিনেমা হল চালাতে।

পারে না কোন নৃত্যশালা চালাতে।

পারে না কোন যাত্রা, থিয়েটার ও নাট্য-কোম্পানী চালাতে।
পারে না কোন গানবাদ্যের অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে।
পারে না কোন বেশ্যাখানার মালিক হতে।
পারে না কোন ফিল্ম্ ও গান-বাজনার যন্ত্র বা ক্যাসেট-ব্যবসা করতে।
পারে না কোন সেলুন খুলে দাড়ি চাঁছতে।
পারে না ভেজাল দিয়ে কোন দ্রব্য বিক্রয় করতে।
পারে না শরীয়তে নিষিদ্ধ কোন প্রকার ব্যবসা করতে।

পরন্তু হালাল পথ বেছে নিয়ে জাগতিক উন্নয়ন সাধনের সংগ্রামও তারা করেনি। তাদের জীবন-সংবিধানের প্রদর্শিত পথে চলতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। তারা ভুলে বসেছে যে, "যে কেউ দুনিয়ার কল্যাণ কামনা করবে, তার জেনে রাখা প্রয়োজন যে, দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ আল্লাহরই নিকট রয়েছে।" *(সূরা নিসা ১৩৪)* তারা জানে না যে, "যারা মু'মিনদেরকে বর্জন করে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয়, তারা কি তাদের কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে? যাবতীয় সম্মান তো শুধুমাত্র আল্লাহরই।" *(ঐ ১৩৯ আয়াত)* "কেউ মান-সম্মান চাইলে সে জেনে রাখুক যে, সকল প্রকার সম্মান আল্লাহরই জন্য।" *(সূরা ফাত্বির ৩৫)* "ঈমান এনে পুরুষ বা নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করে, তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করে থাকি এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করি।" *(সূরা নাহ্‌ল ৯৭ আয়াত)*

মান-সম্মান, উন্নয়ন-প্রগতি এবং যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর বিধান ছেড়ে অন্যের কাছে সম্মান ও উন্নয়ন খুঁজতে গিয়ে মুসলিম আজ যথাসর্বস্ব হারিয়ে বসেছে।

হযরত উমার ﷺ বলেছেন, 'আমরা সেই জাতি, যে জাতিকে আল্লাহ ইসলাম দিয়ে সুসম্মানিত করেছেন। কিন্তু যখনই আমরা ইসলাম ছেড়ে অন্য কিছুর মাধ্যমে সম্মান অন্বেষণ করব, তখনই তিনি আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।'

সকালের শুভ্র জ্যোতি তো অপেক্ষা করছিল মুসলিমদের জন্য তাদের অলক্ষ্যে। কিন্তু মুসলিম ছিল বিভোর নিদ্রায় বেহুশ। চক্ষু মুদে পড়ে ছিল এবং আজও সেই অবস্থাতেই আছে। আর "আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে।" *(সূরা রা'দ ১০)*

পক্ষান্তরে ধনবত্তা ও পার্থিব উন্নয়ন মানুষের জন্য বাঞ্ছিত মর্যাদা নয়। তা যদি হত তাহলে আম্বিয়াগণই এ জগতে সবার চেয়ে বেশী ধনবানরূপে খ্যাত হতেন। কিন্তু পার্থিব জীবন হল ক্ষণস্থায়ী। এ পৃথিবী আমাদের আসল ঠিকানা নয়, এ ঘর-বাড়ি আমাদের আসল ঘর-বাড়ি নয়। আসল ঠিকানা ও ঘর-বাড়ি হল পরকাল। আর ইহকাল হল পরকালের ক্ষেতস্বরূপ। এই ক্ষেতে আমাদেরকে তৈরী করতে হবে আখেরাতের সুখময় জীবনের ফসল। পার্থিব সম্পদ বেশী পেলাম চাহে কম, অথবা না-ই পেলাম তাতে মুসলিমের দুঃখ হওয়া উচিত নয়। কাফেরদের বিভব ও ঐশ্বর্য দেখে নিজেকে হেয় মনে করা উচিত নয়। উচিত হল, পরকালের জীবন ধ্বংস হলে দুঃখ ও কান্নায় ভেঙ্গে পড়া। কারণ, আসল ক্ষতি হল এটাই। আল্লাহ তাআলা বলেন, "বল (হে নবী!) তারাই হল আসল ক্ষতিগ্রস্ত; যারা কিয়ামতের দিন নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্তরূপে পাবে এবং পরিবারবর্গ হারাবে। আর জেনে রেখো, এটাই হল

সুস্পষ্ট ক্ষতি। তাদের জন্য উপর দিক থেকে এবং নীচের দিক থেকে আগুনের মেঘমালা থাকবে।" *(সূরা যুমার ১৫- ১৬ আয়াত)*

কোন এক ওস্তায তার হালকার ছাত্রদের মাঝে কিছু বই বিতরণ করলেন। কিছু বই ছিল বড় ও মোটা আকৃতির। কিছু ছিল মাঝারি এবং কিছু পাতলা আকৃতির ছোট বই। ছাত্রদের মধ্যে যারা মোটা বই পেয়েছিল তারা বড্ড আনন্দিত ও গর্বিত হল। যারা ছোট বই পেয়েছিল তাদের ঐ সামান্য ক' পাতার বই দেখে মনঃক্ষুন্ন ও দুঃখিত হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। তারা কামনা করেছিল, যদি তারাও ওদের মত মোটা ও দামী বই পেত, তাহলে তারাও ধন্য হত। কিন্তু কিছুদিন পর ওস্তায যখন ঘোষণা করলেন যে, তিনি যে বই সকলকে বিতরণ করেছেন, সেই বই থেকেই প্রত্যেকের কাছ থেকে পরীক্ষা নেওয়া হবে। এই ঘোষণা শোনার পর যারা ছোট বই পেয়েছিল তারা নিতান্ত খুশী হল। কারণ, ক' পাতা পড়ে পরীক্ষা দেওয়া ছিল খুবই সহজ। আর যারা মোটা বই পেয়ে মনে মনে গর্বিত ছিল তারাই হল ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ, এত মোটা বই পড়ে পরীক্ষা দেওয়াটা মোটেই সহজ ছিল না। পরন্তু তাতে ফেল হওয়ার আশঙ্কাই ছিল অধিক।

বলা বাহুল্য, মুসলিমের পার্থিব এ স্বল্প সম্পদ হল পরীক্ষার বস্তু। মহান আল্লাহ বলেন, "তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষার বস্তু এবং আল্লাহর নিকট তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার আছে।" *(সূরা তাগাবুন ১৫)*

সুতরাং পরীক্ষার এ ধন কম পেয়ে মুসলিমের দুঃখ হওয়া উচিত নয়; বরং খুশী হওয়াই উচিত।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, "ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য, আর সৎকর্ম -যার ফল স্থায়ী- তা তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং আশা-আকাঙ্খার ব্যাপারেও উৎকৃষ্ট।" *(সূরা কাহফ ৪৬)* "কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ পরকালই হল উৎকৃষ্টতর এবং চিরস্থায়ী।" *(সূরা আ'লা ১৬- ১৭)*

এ জন্যই অস্থায়ী পৃথিবীর বিলাসময় জীবনের বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করা মুসলিমের জন্য মুখ্য বিষয় নয়। মুখ্য বিষয় ও ফরয হল তার সেই জ্ঞান শিক্ষা করা, যদ্দ্বারা পরকালে চিরসুখ লাভ হয় এবং যা না শিখলে চিরদিন (মরণের পর) কষ্ট ভোগ করতে হয়।

যেখানে যতদিন বাস করতে হবে সেখানকার জন্য ঠিক ততদিনকার মত প্রস্তুতি ও সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে নেওয়া জ্ঞানীর কর্তব্য। আমার আসল দেশ ভারত। সঊদী আরবে আমি ভাড়ার ফ্লাটে বাস করি। এখানে ক্ষণস্থায়ী চাকুরী করি। আজ আছি, কাল নেই। আমি যে বেতন পাই তার অর্থ দ্বারা সঊদিয়ার ঐ ফ্লাটকে অধিক সুসজ্জিত করব, নাকি আমার মাতৃভূমি ও স্থায়ী ঠিকানা ভারতের বাসাকে আমরণ বাস করার জন্য সেই অর্থ ব্যয় করে সুনির্মিত করব? জ্ঞানীরা নিশ্চয়ই পরামর্শ দেবেন যে, যে বাড়িতে আপনি ক্ষণকালের জন্য আছেন, সে বাড়িকে সাজিয়ে আপনার পয়সা খরচ করবেন কেন? এখানে তো আর নাগরিকতা পাবেন না। যে দেশের আপনি নাগরিক, সে দেশেই বরং একটা সুন্দর দেখে বাসা তৈরী করে ফেলুন। সেখানে আপনি মরার পরেও আপনার ছেলেরা বাস করতে পারবে।

দুনিয়া আমাদের আসল ঠিকানা নয়, পার্থিব সুখ আসল সুখ নয়, জাগতিক উন্নতি প্রকৃত

উন্নতি নয় এবং দুনিয়ার মায়ার সাগরে ডুবে যাওয়া ভালো নয় বলেই সেই ব্যক্তি অধিক সফলকাম, যে দুনিয়াদার নয়। "যে মানুষ দুনিয়াকে ভালোবাসতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সদয় হয়ে তাকে দুনিয়াদারী থেকে ঠিক সেইরূপ বাঁচিয়ে নেন; যেরূপ রোগী ব্যক্তিকে ক্ষতিকর পানাহার থেকে সাবধানে রাখা হয়।" *(আহমদ, হাকেম, সহীহুল জামে' ১৮১৪ নং)*

আর সে জন্যই মু'মিন বান্দার জন্য আল্লাহর রসূল ﷺ এর খাস দুআ ছিল, "হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি তোমার প্রতি ঈমান এনেছে এবং আমি তোমার রসূল বলে সাক্ষ্য দিয়েছে তার জন্য তুমি তোমার সাক্ষাৎ লাভকে প্রিয় কর, তোমার তকদীর তার হক্কে সুপ্রসন্ন কর এবং দুনিয়ার ভোগ-বিলাস তাকে অল্প প্রদান কর। আর যে ব্যক্তি তোমার প্রতি ঈমান রাখে না এবং আমি তোমার রসূল বলে সাক্ষ্য দেয় না, তার জন্য তোমার সাক্ষাৎ-লাভকে প্রিয় করো না, তোমার তকদীরকে তার হক্কে সুপ্রসন্ন করো না এবং দুনিয়ার ভোগ-বিলাস তাকে বেশী বেশী প্রদান কর।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ১৩১১ নং)*

সুতরাং আল্লাহর প্রিয় বান্দারা যে পার্থিব ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন লাভ করবে না, তা বলাই বাহুল্য। তবে এর অর্থ এই নয় যে, তারা পৃথিবীতে আমরণ দুঃখ-কষ্টে বাস করবে এবং অপরের হাতে পড়ে পড়ে মার খেতে থাকবে। বরং প্রকৃত ঈমান থাকলে তার বলে মু'মিন এ পৃথিবীতে সর্বোপরি মর্যাদা লাভ করতে পারবে। কোন সময়ে অনাহার-উপবাস ও অসুখ-বিসুখের সম্মুখীন হলেও অল্পে তুষ্টি এবং অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের অভ্যাস তাকে উদ্বিগ্ন হতে দেয় না। তাছাড়া তার এ বিশ্বাস থাকে যে, এ অভাব-অনটন ও অসুস্থতার বিনিময়ে পরকালে মহাপ্রতিদান ও চিরস্থায়ী সম্পদ ও সুখ লাভ করবে। 'পরকালে ইচ্ছা-সুখের বিলাস-রাজ্য পাব' এই পরম বিশ্বাস তার মনে সান্ত্বনা ও শান্তি এনে দেয়। আর তাই সুখরূপে তার জীবনে চরম আনন্দ ও তৃপ্তি দান করে থাকে।

দুনিয়ার ভোগ-বিলাস মুমিনের কাম্য নয়। দুনিয়াদারীর ফাঁদে আটকে পড়া জ্ঞানী মুসলিমের কাজ নয়। দুনিয়া তো এক সরাইখানা। এ দুনিয়ার ভরসা কোথায়? দুনিয়া তো মেঘের ছায়া, নিদ্রিতের স্বপ্ন, বিষ-মাখা মধু, সুসজ্জিতা ও সুরভিতা বিষকন্যা। দুনিয়া হল পাপের ধরাধাম, বঞ্চনা ও অভিশাপময় শয্যাগৃহ।

'পাপের পঙ্কে পুণ্য-পদ্ম, ফুলে ফুলে হেথা পাপ,
সুন্দর এই ধরা-ভরা শুধু বঞ্চনা অভিশাপ।'

সে দুনিয়ার জন্য দুঃখ কিসের, যে দুনিয়ার কোন মূল্যই নেই। "আল্লাহর দৃষ্টিতে একটি মশা পরিমাণও যদি দুনিয়ার মূল্য মান থাকত তাহলে কোন কাফের দুনিয়ার এক ঢোক পানিও পান করতে পেত না।" *(আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৫১৭৭ নং)*

আখেরাতের জীবনের তুলনায় দুনিয়ার জীবন হল সমুদ্রের পানির তুলনায় তাতে আঙ্গুল ডুবিয়ে ঐ আঙ্গুলে লেগে থাকা পানির মত সামান্য ও তুচ্ছ। *(মুসলিম, মিশকাত ৫১৫৬ নং)*

আল্লাহর নিকট দুনিয়া একটি কানকাটা মৃত ছাগল-ছানার চাইতেও অধিক নিকৃষ্টতর। *(মুসলিম, মিশকাত ৫১৫৭ নং)*

দুনিয়া মুসলিমদের জন্য কারাগার স্বরূপ। আর কাফেরদের জন্য বেহেশ্ত স্বরূপ। *(মুসলিম, মিশকাত ৫১৫৮ নং)*

দুনিয়া অভিশপ্ত। *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৫১৭৬ নং)*

দুনিয়া একটি ছায়াদার গাছের মত। *(আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৫১৮৮ নং)*

দুনিয়া মানুষের কর্মক্ষেত্র। আর আখেরাত হল হিসাবের স্থান। *(বুখারী)*

মহান আল্লাহ বলেন, “পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বৃষ্টির ন্যায়, যা আমি আকাশ হতে বর্ষণ করি। পরে তা হতে ঘন তরুলতা উদ্‌গত হয়, যা হতে মানুষ ও জীবজন্তু আহার করে থাকে। এই অবস্থায় যখন ধরণী সুবর্ণ রূপ ধারণ করে ও সুশোভিত হয় এবং তার অধিবাসীগণ মনে করে যে, এখন তারাই তার অধিকারী। কিন্তু যখন দিন অথবা রাতে আমার নির্দেশ এসে পড়ে এবং আমি তা এমনভাবে নির্মূল করে দিই, যেন ইতিপূর্বে তার কোন অস্তিত্বই ছিল না।” *(সূরা ইউনুস ২৪ আয়াত)*

“ওদের নিকট পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা কর, এই পানির ন্যায় যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি, যার দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্‌গত হয় ও পরে তা শুকিয়ে গিয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়।” *(সূরা কাহফ ৪৫আয়াত)*

“তোমরা জেনে রেখো, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্ববোধ ও ধন-জনে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছু নয়। এর উপমা হল বৃষ্টি, যার দ্বারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কাফের (বা কৃষক) দলকে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়-কুটায় পরিণত হয়।” *(সূরা হাদীদ ২০)*

“পার্থিব জীবন ছলনাময় সম্পদ ছাড়া কিছুই নয়।” *(সূরা আ-লি ইমরান ১৮৫ আয়াত)*

“পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছু নয়, যারা সংযত হয় তাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেষ্ঠতর। তোমরা কি তা বোঝ না?” *(সূরা আনআম ৩২ আয়াত)*

“এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন।” *(সূরা আনকাবূত ৬৪ আয়াত)*

“এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং পরকাল হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস।” *(সূরা মু’মিন ৩৯ আয়াত)*

“যদি কেউ পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে, তবে দুনিয়াতে আমি তাদের কর্মের পরিমিত ফল দান করি এবং দুনিয়াতে তারা কম পায় না। তাদের জন্য পরকালে দোযখের আগুন ছাড়া কিছুই নেই। আর তারা যা এখানে করে তা বিনষ্ট হবে এবং যা করছে তা অগ্রাহ্য হবে।” *(সূরা হূদ ১৫-১৬)*

“কেউ পার্থিব-সুখ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে থাকি। পরে ওর জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি; যেখানে সে নিন্দিত ও (আল্লাহর) অনুগ্রহ থেকে দূরীকৃত অবস্থায় প্রবেশ করবে। আর যারা মু’মিন হয়ে পরলোক কামনা করে এবং তার জন্য যথাসাধ্য সাধনা করে, তাদেরই সাধনা স্বীকৃত হবে।” *(সূরা ইসরা ১৮-১৯)*

বলাই বাহুল্য যে, এ কারণেই মুসলিমের কাম্য পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য নয়। ক’দিনের এ সংসার তো এক খেলাঘর। খেলা শেষ হলে এবং ‘রেফারী’ বাঁশি বাজিয়ে দিলেই তো সব শেষ।

'যে মত শিশুর দল পথের উপর,
খেলাধুলা করে তারা বানাইয়া ঘর।
হেন কালে স্নেহময়ী মাতা ডাক দিলে,
ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে দিয়ে যায় মাতৃকোলে।
সেই মত এই পৃথিবীর সংসার জীবন,
মহাকালের এলে ডাক র'ব না তখন।'

সালামাহ আল-আহমার বলেন, একদা আমি বাদশা হারুন রশীদের নিকট গমন করলাম। তাঁর বালাখানা ও রাজমহল দেখে আমি তাঁকে বললাম, 'আপনার মহলখানা বেশ প্রশস্ত! আপনার মৃত্যুর পরে আপনার কবরখানিও যদি প্রশস্ত হয় তবেই ভালো।'

এ কথা শুনে তিনি কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর বললেন, 'হে সালামাহ! আপনি আমাকে সংক্ষেপে আরো কিছু উপদেশ দিন।'

আমি বললাম, 'হে আমীরুল মু'মেনীন! যদি কোন মরুভূমিতে পৌঁছে পিপাসায় আপনার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, তাহলে তা দূর করার জন্য কত পরিমাণ অর্থ দিয়ে এক ঢোক পানি কিনবেন বলবেন কি?'

তিনি বললেন, 'আমি আমার অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে তা কিনব।'

আমি বললাম, 'অতঃপর তা কিনে পান করে তা যদি আপনার পেট থেকে বের হতে না চায়, তাহলে তা বের করার জন্য কি ব্যয় করবেন?'

বললেন, 'বাকী অর্ধেক রাজত্ব ব্যয় করে দিব।'

আমি বললাম, 'অতএব সে দুনিয়ার উপর আল্লাহর অভিশাপ, যে দুনিয়ার মূল্য হল মাত্র এক ঢোক পানি ও এক গোড় পেশাব!'

এ কথা শুনে বাদশা হারুন রশীদ আরো জোরে কেঁদে উঠলেন।

এ জগতের কোন গুরুত্ব নেই মুসলিমের কাছে। এ সংসারের কোন মায়া নেই জ্ঞানী মানুষের হৃদয়ে। এ দুনিয়া হল ছলনাময়ী বেশ্যার ন্যায়। বেশ্যার প্রেমে যে পড়বে, সে অবশ্যই পবিত্র দাম্পত্যও হারাবে এবং অর্থও।

'এ মায়া মরিচিকা, এ যে মোহ ভুল,
এ নহে তো সেই-
যাহারে সঁপিতে পারি প্রণয়ের পারিজাত ফুল।'

মানুষের জীবনের দু'টি দিক আছে; একটি হল ভোগের দিক এবং অপরটি ত্যাগের। কিছু ভোগ করতে পারলে মানুষের কল্যাণ আছে। আবার কিছু ত্যাগ করলে তার মঙ্গল আছে। পরন্তু কিছু ভোগ করতে চাইলে কিছু ত্যাগ করতে হয় এবং কিছু ত্যাগ স্বীকার করলে তবেই কিছু ভোগ করতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিপদ হয় তখনই, যখন মানুষ ত্যাজ্য বস্তুকে ভোগ্যরূপে এবং ভোগ্য বস্তুকে ত্যাজ্যরূপে গ্রহণ করে বসে। কিছু ফলের উপরের অংশ আমাদের ভক্ষণীয়, আর কিছু অন্য ফলের ভিতরের অংশ ভক্ষণীয়। অতএব ফল চেনে না এমন লোক যদি ফল চেনে এমন লোকের পরামর্শ না নিয়ে যে অংশটা খাওয়া দরকার তা না খেয়ে অপর অংশটা খায়, তাহলে তা মূর্খতা বৈ কি? বলা বাহুল্য, দুনিয়া আমাদের ভোগের

বস্তু নয়; বরং ত্যাগের বস্তু। আর আখেরাত হল ভোগের বস্তু। পরন্তু দুনিয়া ত্যাগ করলে তবেই আখেরাত পাওয়া যাবে। নচেৎ একই সাথে উভয়ই পাওয়া অসম্ভব।

অবশ্য 'দুনিয়া ত্যাজ্য' বলতে বৈরাগ্যবাদ উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হল, আখেরাত চিন্তা বর্জন করে কেবল দুনিয়ার চিন্তায় মগ্ন থাকা উচিত নয়। আমাদের প্রধান লক্ষ্য হল আখেরাত। আর দুনিয়া হল উপলক্ষ্য মাত্র। অতএব প্রধান লক্ষ্যে পৌঁছনর উদ্দেশ্যে উপলক্ষ্য আমাদেরকে যথাবিহিত অনুসারে ব্যবহার করতে হবে এবং উপলক্ষ্যকে লক্ষ্যে পরিণত করা মোটেই চলবে না।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তির প্রধান চিন্তা ও লক্ষ্য দুনিয়াদারী হয়, আল্লাহ সেই ব্যক্তির একক প্রচেষ্টাকে তার প্রতিকূলে বিক্ষিপ্ত করে দেন, তার দারিদ্রকে তার দুই চোখের সামনে হাজির করে দেন। আর দুনিয়ার সুখ-সামগ্রী তার ততটুকুই লাভ হয়, যতটুকু তার ভাগ্যে লিখা থাকে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির পরম লক্ষ্য আখেরাতই হয়, আল্লাহ সে ব্যক্তির প্রচেষ্টাকে তার অনুকূলে ঐকান্তিক করে দেন, তার হৃদয়ে ধনবত্তা ভরে দেন। আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুনিয়ার সুখ-সামগ্রী তার নিকট এসে উপস্থিত হয়।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ৬৫১৬, সহীহুল জামে' ৬৫১০ নং)*

দুনিয়াদারদের প্রকৃতিই হল, 'এ জগতে হায় সেই বেশী চায়, আছে যার ভূরিভূরি।' যত পায় তত আরো পেতে চায়। চাওয়া-পাওয়ার আকাঙ্খা তাদের মেটে না। যত ভোগ পায়, তত ভোগের নেশা তাদেরকে আরো মাতাল করে তোলে।

পক্ষান্তরে পরকালকামী মুসলিম প্রয়োজন মত দুনিয়া চায়। দুনিয়াকে আখেরাতের জন্য ব্যবহার করে, আখেরাতকে দুনিয়ার জন্য নয়। সে জানে যে, দুনিয়া তার জন্য মুসাফিরখানা এবং আখেরাত হল আসল ঠিকানা। যেমন মুসাফিরখানার সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্য তার কাম্য নয়, তেমনি মুসাফিরখানাকে ধ্বংস করে দেওয়াও তার কাম্য হতে পারে না। কারণ, তাকে এই দুনিয়ার ক্ষেতে বীজ বপণ করেই আখেরাতে তার ফসল তুলতে হবে। অতএব ক্ষেত সমূলে বিনাশ করা তার অধিকারভুক্তও নয়।

এ কথা কুরআন মাজীদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। "আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তার মাধ্যমে পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান কর এবং ইহলোক থেকে তুমি তোমার অংশ ভুলে যেও না।" অর্থাৎ, দুনিয়ার বৈধ সম্ভোগকে তুমি উপেক্ষা করো না। *(সূরা ক্বাসাস ৭৭ আয়াত)*

"তুমি বল, আল্লাহ যে সব সুন্দর বস্তু স্বীয় বান্দাগণের জন্য সৃষ্টি করেছেন তা এবং জীবিকার মধ্য হতে পবিত্র খাদ্য-পানীয়কে কে অবৈধ করেছে? বল, এই সব নেয়ামত আসলে পার্থিব জীবনে মু'মিনদের জন্য এবং বিশেষ করে পরকালে কেবল তাদেরই জন্য (প্রস্তুত রাখা হয়েছে)।" *(সূরা আ'রাফ ৩২ আয়াত)*

আমাদের ও অন্যান্য মানুষদের মাঝে একটি বড় পার্থক্য এই যে, আমাদের বিশ্বাস হল, আমরা নিজে নিজে সৃষ্টি হতে পারি না। আমাদের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। আর তিনি হলেন আমাদের একমাত্র উপাস্য মহান আল্লাহ। আমরা কেবল তাঁরই আনুগত্য করার জন্য সৃষ্টি হয়েছি। এর বিনিময়ে তাঁর সন্তুষ্টি পাব। আমাদেরকে একদিন অবশ্যই মরতে হবে। এ পার্থিব জীবনই সব কিছুর শেষ নয়। মরণের পর পুনরায় এক সময় আবার জীবিত হতে হবে

এবং আমরা এ জগতে যা কিছু করি তার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জবাবদিহি করতে হবে। তাঁর আনুগত্য করে থাকলে সৃষ্টিকর্তা আমাদের জন্য চির-সুখময় স্থান বেহেশ্ত্ প্রস্তুত রেখেছেন। অন্যথা করলে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে ভীষণ শাস্তি ও জ্বালাময় দোযখ-যন্ত্রণা।

আসলে উক্ত বিশ্বাস অধিকাংশ মানুষের মনে না থাকার ফলেই যত বিপর্যয় ও বিভ্রাট সৃষ্টি হয়েছে। হিসাব দিতে হবে না মনে করেই অনেকে রিপুর একান্ত সেবক ও অনুগত দাস হয়ে স্বেচ্ছাচারিতার স্বাধীন জীবন অতিবাহিত করে যাচ্ছে। ধরে নিয়েছে, দুনিয়াটাই সব কিছু। 'দুনিয়াটা মস্ত বড়, খাও-দাও ফূর্তি কর।' এই শ্লোগান তাদের মনে-মগজে জায়গা করে নিয়েছে। তাদের সন্দেহ ও বক্তব্য হল, "সে (মুহাম্মাদ) কি তোমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হলেও তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে?! তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা কদাচ ঘটবে না, কদাচ ঘটবে না। একমাত্র পার্থিব জীবন, আমরা মরি-বাঁচি এখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হব না। সে তো এমন এক ব্যক্তি, যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা তাকে বিশ্বাস করবার নই।" *(সূরা মু'মিনূন ৩৫-৩৮ আয়াত)*

তাদের বুলি হল,

'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও ধারের খাতা শূন্য থাক,
দূরের আওয়াজ লাভ কি শুনে মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।'

কেউ বা বলে,

'এখন যা পাই তাই নিয়ে যাই দূর অজানার কাজ কি মোর,
এমন মাটির স্বর্গ আমার কোথায় পাব এর দোসর?'

অন্য কেউ বলে থাকে,

'কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহু দূর?
মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক মানুষেতে সুরাসুর।'

আল্লাহ তাআলা বলেন, "---বল, আল্লাহই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনেন ও পরে ওর পুনরাবর্তন ঘটান। সুতরাং তোমরা কেমন করে সত্য-বিচ্যুত হচ্ছো? তুমি বল, তোমরা যাদেরকে (আল্লাহর) শরীক কর তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে সত্যের পথ নির্দেশ করতে পারে? বল, আল্লাহই সত্য পথ নির্দেশ করে থাকেন। অতএব যিনি সত্যপথ নির্দেশ করেন -তিনিই আনুগত্যের অধিকতর হকদার, নাকি যে তাঁর পথ-প্রদর্শন ব্যতীত পথ পায় না সে? সুতরাং তোমাদের কি হয়েছে, কেমন তোমাদের বিচার?

আসলে তাদের অধিকাংশই অনুমান ও কল্পনারই অনুসরণ করে থাকে। অথচ নিশ্চয় সত্যের পরিবর্তে অনুমান কোন কাজে আসে না। তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত।" *(সূরা ইউনুস ৩৪-৩৬ আয়াত)*

কল্পনার কলে পড়ে যেমন এ শ্রেণীর লোকেরা সত্যকে প্রত্যাখান করে ঠিক তেমনিই বহু উদ্ভট অসত্য বিশ্বাস করে থাকে এরা। শুধু এরা এদের নিজ ধারণা ও চিন্তাবলে সত্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে অনেক সময় অনেক চিন্তাবিদ্ সত্যাশ্রয়ীদের নিকট হাস্যস্পদ হয়ে ওঠে। যেমন এক শহুরে চিন্তাবিদ্ পাড়া-গ্রামে এসে দেওয়ালে ঘুঁটে দেখে এই চিন্তাদ্বন্দ্বে পড়েছিল যে, 'এই

দেওয়ালে গরু কিভাবে উঠে বিষ্ঠা ত্যাগ করল?!' তদনুরূপ বাঁদরের সাথে মানুষের আকৃতির মিল দেখে বহু চিন্তাবিদের ধারণা হল, 'বহু কাল পূর্বে মানুষ আসলে বানর ছিল, পরে এর বিবর্তন ঘটেছে!' অর্থাৎ, তারা নাকি বাঁদরের জাত!!

মোট কথা, পরকালে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর জীবন-ধারা এক নয়। হতেও পারে না এক। একজন জানে যে, তাকে আমানতে দেওয়া প্রত্যেক পয়সা ও প্রত্যেক আয়-ব্যয়ের যথার্থ হিসাব লাগবে। আর একজন 'পরের ধনে পোদ্দারি' করে এবং মনে করে যে, তাকে একটি পয়সারও হিসাব লাগবে না। তার আয়-ব্যয়ের হিসাব নেওয়ার মত কেউ নেই। এই উভয় লোকের খরচে ও স্বাচ্ছন্দ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। 'পুঁজি ভেঙ্গে খেতে ভালো, ভিটেন গাঙে যেতে ভালো, যত কষ্ট বুঝতে আর উজুতে।' একজন জানে যে, সে কেবল পরের জমা করা ধন ভেঙ্গে খেয়ে যাবে, আর তাকে হিসাব বুঝাতে হবে না। নদীর ভাটার টানে তার নৌকা আপনা-আপনিই বয়ে যাবে এবং পরবর্তী কালে উঝানে আর উঠতে হবে না -এমন লোক; আর যে জানে যে, তাকে তার ঐ ভেঙ্গে খাওয়া অর্থের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ হিসাব লাগবে, প্রত্যেক কাজ ও খরচের জন্য জবাবদিহি করতে হবে, জীবন-তরীকে পার্থিব ভোগ-বিলাস ও খেয়াল-খুশীর ভাটায় ভাসিয়ে দিলেও একদিন তাকে উঝান বেয়ে ফিরে যেতেই হবে। -এই উভয় মানুষের জীবন-পদ্ধতি, আহার-বিহার, চাল-চলন এক হতে পারে না।

মানুষকে ভেবে দেখা উচিত যে, এ জীবনের মূল উদ্দেশ্য কি? মূল লক্ষ্য কি? কেন সে সৃষ্টি হয়েছে? তার কর্তব্যই বা কি? মূল লক্ষ্য কি কেবল রিপু ও ইন্দ্রিয়-সেবন? আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য কি পার্থিব সুখ ও সফলতা? যদি তাই হয় তবে তা তো চিরস্থায়ী নয়। এ বিপুল সুখের ভরপুর আয়োজন ক'দিনের জন্য? সে সুখের স্বপ্ন নিদ্রাভঙ্গ হলেই যে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তারপর কি?

মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি, আর তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না?" *(সূরা মু'মিনূন ১১৫ আয়াত)*

"মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনিই ছেড়ে দেওয়া হবে?" *(সূরা ক্বিয়ামাহ ৩৬)* না কক্ষনই না। "আমি দানব ও মানবকে তো আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।" *(সূরা যারিয়াত ৫৬)*

"মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করতে পারব না? বস্তুতঃ আমি ওর অঙ্গুলিগুলো পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম। তবুও যা অবশ্যম্ভাবী মানুষ তা অস্বীকার করতে চায়।" *(সূরা ক্বিয়ামাহ ৩-৫ আয়াত)*

পূর্বোক্ত আলোচনার পরেও কোন যুবকের মনে আর কোন প্রশ্ন থাকা উচিত নয় যে, ধর্মহীন, লাগামছাড়া হওয়া সত্ত্বেও ওরা পার্থিব ব্যাপারে কত উন্নত! জাগতিক সুখ ওদের পায়ে লুটিয়ে পড়েছে। আর আমাদের অবস্থা এমন হয়েছে যে, 'যে করবে ধম্ম, তার কাঁদতে যাবে জম্ম।' কারণ, আমরা সে সুখ প্রতিযোগিতায় নামতে চাইনি। তাছাড়া আমাদের জন্য রয়েছে আমাদের প্রতিপালকের আশ্বাসবাণী; তিনি বলেন, "তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা তো পার্থিব-জীবনের ভোগ ও শোভা এবং যা আল্লাহর নিকট আছে তা উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি বুঝ না? যাকে আমি উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি -যা সে পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির মত যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্পদ দিয়েছি, যাকে পরে কিয়ামতের

দিন অপরাধীরূপে উপস্থিত করা হবে?” *(সূরা ক্বাসাস ৬০-৬১ আয়াত)*

“বস্তুতঃ তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ্য; কিন্তু আল্লাহর নিকট যা আছে তা যারা ঈমান রাখে ও নিজেদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে তাদের জন্য উত্তম ও স্থায়ী।” *(সূরা শূরা ৩৬ আয়াত)*

ছন্নছাড়া সে কাফেরদের সুখ-সম্ভোগ দেখে কোন মুসলিমের চোখ টাটানো উচিত নয়। সাধারণতঃ সেই জিনিসে মানুষের ঈর্ষা জন্মে, যাতে আছে উপকার ও কল্যাণ। পার্থিব ভোগ-বিলাসে ক্ষণকালীন সুখ ছাড়া চিরকালীন কল্যাণ নেই। অতএব সে সম্পদে ঈর্ষা জন্মানো মুসলিমের সমীচীন নয়।

মহান আল্লাহ বলেন, “আমি অবিশ্বাসীদের কতককে তাদের পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য-স্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়ে রেখেছি, তার প্রতি তুমি কখনো দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখো না। তোমার প্রতিপালকের উপজীবিকাই উৎকৃষ্টতর ও চিরস্থায়ী।*(সূরা ত্বাহা ১৩১)*

কাফেররা দুনিয়ায় সুখ ভোগ করবে। এটাই বিধির বিধান। তাদেরকে দুনিয়া দেওয়া হয়েছে এবং হবেও। আর মুসলিমদের জন্য রয়েছে আখেরাত। দুনিয়াটাই হল কাফেরদের বেহেশ্ত। তারপর চিরস্থায়ী আযাব। আর মুসলিমের ক্ষণকাল দুঃখ হলেও তার জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী বেহেশ্তী সুখ পরকালে বেহেশ্তে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, “সত্য-প্রত্যাখ্যানে মানুষ এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে এই আশঙ্কা না থাকলে দয়াময় আল্লাহকে যারা অস্বীকার করে তাদেরকে তিনি ওদের গৃহের জন্য রৌপ্যনির্মিত সিঁড়ি দিতেন, রৌপ্যনির্মিত দরজা ও বিশ্রামের পালঙ্ক দিতেন। আর দিতেন স্বর্ণের অলঙ্কার। কিন্তু এ সব তো পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার। আর সংযমীদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট পরলোকের কল্যাণ আছে।” *(সূরা যুখরুফ ৩৩-৩৫ আয়াত)*

“অতএব ওদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে মুগ্ধ না করে। আল্লাহ তো ওর দ্বারাই ওদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান।” *(সূরা তাওবাহ ৫৫ আয়াত)*

ওরা কতই বা উন্নত? প্রগতির নামে অধোগতির সমাজে কত যে দুর্গতি তাদের, তা বহু মানুষই জানে। তারা পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ সত্য, কিন্তু “তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক সম্বন্ধে অবগত, পক্ষান্তরে ওরা পরকাল সম্বন্ধে একেবারে গাফেল।” *(সূরা রূম ৭ আয়াত)*

ওরা পার্থিব ঐ উন্নতি নিয়ে চাঁদে যেতে পারে, মঙ্গল বা অন্য কোন গ্রহে বাস করতে পারে, কিন্তু বেহেশ্তে পৌঁছতে পারে না নিশ্চয়। আর ‘মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত’ হলেও, চাঁদে বা অন্য গ্রহে না যেতে পারলেও বেহেশ্তে যাওয়ার পথ তার জন্য সুগম।

পার্থিব ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির পথে ইসলাম তো বাধা দেয় না; বরং যে কাজেই মানুষের কল্যাণ আছে সেই কাজেই ইসলাম মুসলিমকে অনুপ্রাণিত করে। তবুও প্রগতিশীল মানুষদের ধারণা যে, ইসলাম বিজ্ঞানের পথে বাধাস্বরূপ। যেমন কবি বলেছেন,

‘বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে তখনো আমরা বসে,
বিবি-তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি ফিকা ও হাদীস চষে।’

কিন্তু আমরা যদি কবিকে প্রশ্ন করি যে, আপনিও তো বসে আছেন, অথচ লোকে চাঁদে গেল, মঙ্গল গ্রহে পা রাখল?

'বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে তখনো আমরা বসে,
কলম ধরিয়া কবিতা লিখেছি মনের রস ও রোষে।'

তখন নিশ্চয় কবি বলবেন, 'চাঁদে যাওয়ার কাজ তো আমার সাধ্যে নয়। আমার সে উপায় উপকরণ নেই।' তাহলে যাঁরা ফিকা ও হাদীস চষে বিবি-তালাকের ফতোয়া খুঁজেন তাঁরাও নিশ্চয় বলবেন, 'ও কাজ আমাদের নয়। আমাদের ও কাজে সাধ্য ও উপায়-উপকরণ কিছুই নেই। এখন চাঁদে যদি না-ই যেতে পারি, তাহলে ধর্মও কি ছেড়ে বসতে হবে? হারাম-হালালের তমীজও কি বাদ দিতে হবে?' পরন্তু মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বিধানে হারাম-হালালের তমীজ করা হল ফরয। আর কোটি কোটি ডলার ব্যয় করে চাঁদে যাওয়া হল বড় জোর মুস্তাহাব। চাঁদ বা মঙ্গলগ্রহে যাওয়ার চেয়ে আমাদের কাছে বেহেশ্তে যাওয়া অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। তবুও চাঁদে যেতে ইসলাম মানা করেনি। তবে ইসলাম ও তার উলামা সমাজের প্রতি এ কটাক্ষ কেন?

এ কটাক্ষ করা চলে তাদের প্রতি, যাদের হাতে আছে বিভিন্ন উপায়-উপকরণ। যাদের ক্ষমতায় আছে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে বিজ্ঞান-মন্দির, গবেষণাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে লুক্কায়িত শত শত প্রতিভার প্রতিভাত ঘটানোর কাজ। সুতরাং কবির জন্য শোভনীয় ছিল এই বলা,

'বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে তখনো আমরা বসে,
ভোগ-বিলাসের সিংহাসনে মত্ত থেকেছি রসে।'

যাই হোক, পার্থিব জগতের চাকচিক্য নিয়ে ওরা বড্ড খোশ। আর তারা মনেও করে যে, ধর্মের বাঁধনে তারা আবদ্ধ নয় বলেই তাদের এই উন্নতি। নৈতিক বাধ্য-বাধকতা মানে না বলেই তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে এত উন্নত!

কিন্তু মহান সৃষ্টিকর্তা বলেন, "যারা অবিশ্বাস করেছে তারা যেন এ ধারণা না করে যে, আমি তাদেরকে যে সুযোগ দিয়েছি, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। তারা স্বীয় পাপ বর্ধিত করবে এই উদ্দেশ্যেই আমি তাদেরকে ঢিল দিয়ে রেখেছি। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি।" *(সূরা আ-লি ইমরান ১৭৮)*

যদিও তারা আজ ধর্মভীরুদেরকে ব্যঙ্গ করে ও নিজেদেরকেই চির উন্নত মনে করে তবুও প্রকৃতপ্রস্তাবে চির উন্নত হল মুসলিমরাই। 'চির' শব্দের অর্থ মরণ পর্যন্তই বিস্তৃত নয়। 'চির' হল অনন্তকালের জন্য মরণের পরপারেও যে জীবন, সে জীবনকেও পরিব্যাপ্ত।

আল্লাহ তাআলা বলেন, "যারা অবিশ্বাস করছে, তাদের পার্থিব জীবন সুশোভিত করা হয়েছে, আর তারা বিশ্বাসী (মুসলিমদের)কে ঠাট্টা করে থাকে। অথচ যারা ধর্মভীরু তাদেরকে কিয়ামতে সমুন্নত করা হবে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।" *(সূরা বাক্বারাহ ২১২)*

সুতরাং 'অধোগতি মার্কা' সে সব প্রগতিশীল মানুষদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ার কোন অর্থ থাকতে পারে কি? এমন সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে মু'মিনদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

একদা দুই জাহানের বাদশাহ, নবীকুল-শিরোমণি হযরত মুহাম্মাদ ﷺ চাটাই-এর উপর হেলান দিয়ে শুয়ে ছিলেন। তাঁর পার্শ্বদেশে চাটাই-এর স্পষ্ট দাগ পড়ে গিয়েছিল। তাঁর বগলে ছিল খেজুর গাছের চোকার বালিশ! তা দেখে হযরত উমার কেঁদে ফেললেন। আল্লাহর রসূল

ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, “হঠাৎ কেঁদে উঠলে কেন, হে উমার?” উমার বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! পারস্য ও রোম-সম্রাট কত সুখ-বিলাসে বাস করছে। আর আপনি আল্লাহর রসূল হয়েও এ অবস্থায় কালাতিপাত করছেন? আপনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন, যেন তিনি আপনার উম্মতকে পার্থিব সুখ-সম্পদে সমৃদ্ধ করেন। পারস্য ও রোমবাসীদেরকে আল্লাহ দুনিয়ার সুখ-সামগ্রী দান করেছেন, অথচ তারা তাঁর ইবাদত করে না!’

এ কথা শুনে মহানবী ﷺ হেলান ছেড়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, “হে উমার! এ ব্যাপারে তুমি এমন কথা বল? ওরা হল এমন জাতি, যাদের সুখ-সম্পদকে এ জগতেই ত্বরান্বিত করা হয়েছে। তুমি কি চাও না যে, ওদের সুখ ইহকালে আর আমাদের সুখ পরকালে হোক?” *(বুখারী ৫১৯১, মুসলিম, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে’ ১৩২৭ নং)*

মহান আল্লাহ বলেন, “যেদিন অবিশ্বাসীদেরকে দোযখের নিকট উপস্থিত করা হবে, সেদিন ওদেরকে বলা হবে, ‘তোমরা তো পার্থিব জীবনে তোমাদের সুখ-সম্ভার ভোগ করে শেষ করেছ। সুতরাং আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে। কারণ, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী।” *(সূরা আহক্বাফ ২০)*

প্রগতিশীল যুবক বন্ধু আমার! জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে তুমি বিরাট বড় হয়ে বিরাট কিছু হতে পার, কিন্তু পরলোকে তুমি মিসকীন। এ জগতে তোমার ৫০০/৭০০ বিঘা জমি থাকতে পারে, হতে পার জমিদার। কিন্তু জান্নাতের মাটিতে তোমার এক-আধ কাঠা জায়গা কেনা না থাকলে নিশ্চয় তুমি নিঃস্ব। মানুষের দাসত্ব (চাকরী) করে তুমি মোটা অঙ্কের টাকা কামিয়ে বড় সুখী হতে পার। কিন্তু আল্লাহর দাসত্ব না করলে তুমি প্রকৃত ও চিরসুখী কখনোই হতে পার না। তুমি বহু কিছু হতে পার, কিন্তু প্রকৃত মুসলিম না হলে কিছুই নও। নৌকাচালক মাঝি বীজগণিতের ফরমুলা মুখস্থ না করলে, ভৌতবিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রক্রিয়া না জানলে, ভূগোলের গোল্লা না বুঝলে, ইতিহাসের ইতিবৃত্ত না জানলে তার জীবনের ১২ আনাই মিছে সত্যই, কিন্তু নৌকায় চড়ে কুলকুল-তান নদীর বুকে ঝড়ের তালে তালে যখন পানি ফুলে ফুলে উঠে নৌকাডুবি হবে, তখন সে সময়ে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য যদি মাঝির মত সাঁতার না শিখে থেকো তাহলে -তুমি যত বড়ই পন্ডিত হও -তোমার জীবনের ১৬ আনাই মিছে। তোমার প্রগতির গাড়ির গতিবেগ যত বেশীই হোক না কেন, তবুও সে গাড়ি ঐ কবর-ডাঙ্গা পর্যন্ত চলমান। অতঃপর সে গাড়ি বদলি করতে হবে এবং তোমার গাড়ি যে অচল হয়ে থেকে যাবে, আর সেখানে যে তোমার প্রগতি অধোগতিতে পড়ে কি দুর্গতি হবে তা কি ভেবেছ?

গর্বিত বন্ধু আমার! অহংকার প্রদর্শন করো না। দুনিয়া পেয়েছ বলে ধর্মপ্রাণ মানুষদেরকে দেখে নাক সিঁটকায়ো না। যে সুখ আছে, সে সুখ তোমার ক’দিনকার?

শত কামনা, শত বাসনা, শত আশার ফুলের মুকুল,
মরণ-তুফান আসিয়া নিমেষে ভাসাবে ভোগের স্নিগ্ধ দু’কুল।
মনের আশা রহিবে মনেই, ছিন্ন হইবে সকল বাঁধন,
হাটের মৎস্য হাটেই রহিবে মসলা বেঁটেও হবে না রাঁধন।

এসে গেলে সে গাড়ি-
প্রস্তুত হওয়ার সময় দেবে না যেতে হবে তাড়াতাড়ি।

'হে ভাই যুবক! ভেবে দেখ তুচ্ছ এই দুনিয়া নিয়ে, দুনিয়ার বিশ্বাসঘাতকতা ও জুলুমবাজি নিয়ে, তার ধোকাবাজি ও ক্ষণস্থায়িত্ব নিয়ে।

চিন্তা কর দুনিয়াদার ও সংসার-প্রেমী মানুষদের কথা; যাদেরকে দুনিয়া বিভিন্ন কষ্টে ক্লিষ্ট করেছে, পান করিয়েছে নানান্ তিক্ত ও বিষময় শারাব। যাদেরকে সামান্য আনন্দ দান করলেও কাঁদিয়েছে ও দুঃখ দিয়েছে বেশী।

ভেবে দেখ দোযখ নিয়ে, দোযখের জ্বলন্ত অগ্নিশিখা ও লেলিহান দাহিকাশক্তি নিয়ে। মনের গহীন কোণে একবার কল্পনা করে দেখ জাহান্নামের গভীরতা, তার কঠিন তাপ ও ভীষণ উষ্ণতা এবং আরো বিভিন্ন আযাব নিয়ে।

ভেবে দেখ, দোযখবাসীদের কথা; যাদেরকে সেখানে উপস্থিত করা হবে এবং তাদের চেহারা হবে বিকট কালো, চক্ষু হবে গাঢ় নীল, তাদের ঘাড়ে থাকবে বেড়ি ও শিকল। অতঃপর যখন তাদের সম্মুখে দোযখের দরজা খুলে দেওয়া হবে তখন সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে তাদের হৃদয় বিদগ্ধ হবে, হুঁশ হারিয়ে যাবে এবং শত আক্ষেপ ঘিরে ধরবে তাদের মন ও মগজে।

ভাই যুবক! তুমি কত বছর বাঁচবে এ দুনিয়াতে? ৬০ বছর? ৮০, ১০০ অথবা ১০০০ বছর? তারপর কি? তারপর নিশ্চয়ই মৃত্যু। তারপর হয় বেহেশ্তের সুখময় বাসস্থান। নচেৎ দোযখের জ্বালাময় ঠিকানা!

ভাইজান! তুমি কি দুনিয়ার এ ক'টা দিন, এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের ক'টা বছর আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্য রাখতে পারবে না? তোমার মন কি চায় না যে, কাল মরণের পর তুমি লাভ করবে চিরস্থায়ী জীবনের ইচ্ছাসুখের অনন্তকালের চির আনন্দ?' (আখিল হাবীব দ্রঃ)

পরিশেষে এস দুআ করি,

(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النار)

যুবক ও পরিবেশ

পরিবেশের এমন একটি প্রভাব-ক্ষমতা আছে যার ফলে ভালো মানুষ খারাপ হয়, আবার খারাপ মানুষ ভালোও হয়ে থাকে। বহু যুবকই এমন আছে, যাদের মন ভালো, ভালো হওয়ার ইচ্ছাও রাখে, কিন্তু পরিবেশের চাপে খারাপ হয়ে যায়। এ জগতে যেহেতু মন্দলোকের সংখ্যাই বেশি, তাই মন্দের প্রভাব আগে ও বেশি পড়ে যুবকের উপর। আর এ মন্দ পরিবেশে প্রভাবান্বিত তারাই বেশি হয়, যাদের মন দুর্বল, ঈমান দুর্বল, দুর্বল দ্বীনী জ্ঞান। সত্যকে মানতে গিয়ে ঠাট্টা-উপহাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, কটাক্ষ-টিপ্পনী, লোকহাস্য প্রভৃতির শিকার হয়ে অনেকে সত্য ত্যাগ করে বসে। দ্বীন ও দুনিয়ার নানান্ সমস্যা নিয়ে মানুষের মাঝে যে মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব-কলহ আছে তার কুচক্রে পড়ে অনেকে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। পরিবেশগত বিভিন্নমুখী স্রোতের মুখে নিজের স্বাতন্ত্র্য ও ঈমানকেও বাঁচিয়ে রাখতে পারে না অনেকে।

ভোগ-বিলাসের প্রবণতা এমন বেড়ে উঠছে যে, সেই বিলাস-বহুল দ্বীনহীন পরিবেশে একজন মানুষকে 'মুসলিম'-রূপে বেঁচে থাকতে প্রয়োজন হল অগাধ ধৈর্যের। "যত (মন্দ) বছর বা যত দিন অতিবাহিত হবে তার তুলনায় আগামী বছর ও দিন হবে আরো মন্দতর।" *(আহমদ, বুখারী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৭৫৭৬ নং)*

"এমন দিন আগামীতে আসছে যে, ধৈর্যের সাথে দ্বীন বাঁচিয়ে রাখতে ঠিক ততটা কষ্টকর মনে হবে, যতটা কষ্টকর মনে হয় হাতের মুঠোয় আগুনের আঙ্গার রাখা।" *(তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৮০০২নং)* "আগুনের আঙ্গার হাতের মুঠোয় ধরে রাখতে যেমন কঠিন ও কষ্টের কাজ ঠিক তেমনি উম্মতের মতবিরোধ ও কলহের সময় মহানবীর সুন্নাহ (তরীকা) অনুসারে জীবন-যাপন করা কঠিন ও কষ্টের কাজ বলে মনে হবে।" *(সহীহুল জামে' ৬৬৭৬ নং)*

এমন পরিবেশে ধৈর্য ধরা সহজ নয়। যেমন সহজ নয় হাতের মুঠোয় আগুন ধরে রাখা। শত বাধা-বিঘ্ন ও আপদ-বিপদ উপেক্ষা করেও যারা দ্বীন ও ঈমান বাঁচিয়ে রাখবে এবং এমন ঘোলাটে নোংরা পরিবেশের আবর্জনায় নিজেদের দ্বীনদারীকে মলিন হতে দেবে না। তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। এমন লোক হবে তারা, যারা প্রত্যেকে ৫০ জন শহীদ সাহাবীর সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবে। *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ২২৩৪ নং)*

পরিবেশ ইত্যাদির কারণে মু'মিনের ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। তাই প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের দেহের ভিতরে ঈমান ঠিক সেইরূপ পুরাতন হয়ে যায়, যেরূপ পুরাতন হয়ে যায় নতুন কাপড়। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর; যাতে তিনি তোমাদের হৃদয়ে ঈমানকে (ঝালিয়ে) নতুন করে দেন।" *(ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহুল জামে' ১৫৯০ নং)*

পরিবেশের এমন এক শক্তি আছে, যার ফলে মানুষের চরিত্র, ব্যবহার, পরিধান, পানাহার প্রভৃতির মাঝে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার লাভ করে থাকে। পরিবেশ-দোষেই সত্য মিথ্যারূপে এবং মিথ্যা সত্যরূপে, সভ্যতা অসভ্যতারূপে এবং অসভ্যতা সভ্যতারূপে, সুন্নাত বিদআতরূপে এবং বিদআত সুন্নাতরূপে পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করে। একই পোশাক

কোন পরিবেশে পরিধান করলে লোকে তা দেখে হাসে। আবার ঐ পোশাকই অন্য এক পরিবেশে পরিধান না করলে লোকে তা না দেখতে পেয়ে আশ্চর্যবোধ, কটাক্ষ ও ব্যঙ্গ করে। তাছাড়া ভালোর তুলনায় নোংরা পরিবেশেরই প্রভাব-ক্ষমতা অধিক।পরশমণির সংস্পর্শে লোহা সোনা হওয়ার কথা শোনা যায় ঠিকই, কিন্তু তার বাস্তবরূপ বিরল। পক্ষান্তরে একটা পঁচা আলুর চারিপাশে বহু আলুকে পঁচ ধরতে অনেকেই দেখে থাকে।

এক যুগ ছিল যখন রেডিও কেনাও পাপ মনে করা হত। কিন্তু আজ আর তা হয় না। পূর্বে টিভিকে অধিকাংশ মুসলিম খারাপ মনে করতেন। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিমই টিভি তো দূরের কথা ডিসকেও খারাপ মনে করেন না। আর এ স্বাভাবিকতা আসে পরিবেশের গুণেই। পরিবেশের চাপেই কাল যা পাপ মনে করা হত, আজ তাকে বৈধ বা পুণ্য কাজ অথবা এক ফ্যাশনরূপে পরিগণিত হতে দেখা যায়।

কোন মুসলিম যদি রমযানের রোযার দিনে কিছু খায় তাহলে তা দেখে অনেকে তাকে মুসলিম নয় বলে ধারণা করবে। কিন্তু ঐ ব্যক্তিকেই নামায ত্যাগ করতে দেখে তারা কোন কিছু মনে করে না। অথচ নামাযের মর্যাদা রোযার চাইতে বহুগুণ উর্ধ্বে। কিন্তু পরিবেশে বেনামাযী ও 'আটকী-খাটকী-তিনশো ষাটকী' নামাযীর সংখ্যা বেশী ও স্বাভাবিক হওয়ার ফলে তা আর বড় পাপ বা আশ্চর্যের বিষয় বলে মনে করা হয় না।

কোন মসজিদের ইমামকে যদি লোকে সোনার আংটি বা অন্য কিছু পরে থাকতে দেখে অথবা বিড়ি-সিগারেট পান করতে দেখে তাহলে সকলের চোখ ডাগর হবে। পক্ষান্তরে তাকে গীবত করতে দেখলে অথবা শির্কী তাবীয লিখে ব্যবসা করতে দেখলে লোকের কোন ভ্রূক্ষেপ দেখা যায় না। অথচ শেষোক্ত কর্মদ্বয়ের পাপ অধিকতর বড়। কারণ, পরিবেশ এমন সৃষ্টি হয়ে থাকে যে, মানুষ সেই হিসাবেই ভালো-মন্দ ও স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক বিচার করে থাকে। অথচ একজন মুসলিমের জন্য এ দৃষ্টিভঙ্গি ও মাপকাঠি হওয়া উচিত নয়। মুসলিমের সর্বকর্ম ও সকল ভালো-মন্দ বিচারের মানদন্ড হল ইসলাম, আল্লাহর বিধান। কারণ, মানুষ পরিবেশ সৃষ্টি করে। আর মানুষের জ্ঞান-বিবেক সীমিত ও বিভিন্নমুখী। একই বস্তু সকলের কাছে ভালো না-ও হতে পারে। সুতরাং ইসলামকে পরিবেশের ছাঁচে না ঢেলে, বরং পরিবেশকেই ইসলামের ছাঁচে ঢেলে গড়ে তোলা মুসলিমের কর্তব্য।

পরন্তু ইসলামী পরিবেশে মিশে যেতে হবে দুধে চিনি ঘুলে যাওয়ার মত। পক্ষান্তরে অনৈসলামী পরিবেশে মিশতে হলে মিশতে হবে চানাচুরে বাদাম মিশার মত; বড় সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখতে হবে, যেন নিজস্ব সত্তা, স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য বিলীন ও একাকার হয়ে বা হারিয়ে না যায়।

যদি বল, 'মাছ ধরব, অথচ গায়ে কাদাও লাগাব না' তা কি করে সম্ভব? তাহলে বলা যায় যে, যে মাছ ধরতে গিয়ে তোমার গায়ে কাদা লাগবে এবং তোমার সৌন্দর্য কাদাতে মলিন হয়ে যাবে, সে মাছ ধরতে তুমি যাবে না। মাছ খাওয়ার দরকার একান্তই পড়ে থাকলে ছিপ দিয়েও তো ধরতে পার। হিকমত অবলম্বন করে চললে চলার পথ অতি সহজ।

পরিবেশ মানুষকে অতি সহজে তার দাসে পরিণত করে ফেলে। অস্বাভাবিককে স্বাভাবিক ও পাপকে সাধারণ কর্মে পরিবর্তিত করে। কারণ, প্রত্যেক জিনিসের কসরতই মানুষকে

অভ্যস্ত করে তোলে এবং সেখান থেকে দেখাদেখি শুরু হয় পরিবেশের সৃষ্টি। আর যে মানুষ ঐ পরিবেশে বাস করে সে বুঝতেও পারে না যে, সে যা করছে তা অস্বাভাবিক বা পাপ কাজ। যেমন চামড়ার গুদামে কর্মরত কর্মচারীর জন্য গুদামের ভিতরে অবস্থান করতে কোন কষ্ট হয় না। দুর্গন্ধ নাকে নিতে নিতে অভ্যাসে পরিণত হলে তা সাধারণ গন্ধে পরিবর্তিত হয় তার কাছে। অথচ বাইরে থেকে অন্য কোন মানুষ সেখানে প্রবেশ করলে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারে। আরবীতে একটি প্রবাদ আছে, (إذا كثر الإمصاص قلّ الإحساس) অর্থাৎ, দেহের কোন জায়গা (যেমন শিশুদের জন্য মায়ের স্তনবৃন্ত) অধিকরূপে চোষণ করা হয় তখন প্রথম প্রথম তা খুব বেশী অনুভূত হলেও পরের দিকে আর কোন অনুভূতি অবশিষ্ট থাকে না। কারণ, তখন তা অভ্যাস ও স্বাভাবিকতায় পরিবর্তিত হয়ে যায়।

বলা বাহুল্য, পরিবেশের এই অবস্থা হওয়ার ফলে পরিবেশ-দূষণ থেকে বাঁচা বড় কষ্টকর। আমাদের পরিবেশের এমন নোংরা ও ঘোলাটে অবস্থা যে, সে পরিস্থিতিতে নিজেকে বাঁচিয়ে চলা বড় দুষ্কর। মাছ ধরার ইচ্ছা না থাকলেও গায়ে যে কাদা লাগবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? কারণ, তোমাকেও তো ঐ পুকুর ধারেই বাস করতে হবে।

'পশ্চিমে ঝড় ঐ যে আসে পুবে অন্ধকার
মহাকালের বাজছে প্রলয়-ভেরী,
বসুন্ধরার কাঁপন বড় ভাঙ্গছে তোরণ-দ্বার
তুফান আসার নাইকো বেশী দেরী।
ধুলোয় নয়ন আঁধার হল, আকাশ ডাকে গুরু
মাথা গোঁজার নাইকো কোথাও ঠাঁই,
কাল-নাগেরি শতেক ফণায় বক্ষ-দুরুদুরু
পালিয়ে যাওয়ার পথ তো জানা নাই।'

এমন সংকটাপন্ন পরিবেশে মুসলিম দোটানায় দোদুল্যমান। কাদামাখা পা ধোয়ার চেষ্টা করলেও পা ধুয়ে রাখার স্থান কোথায়? কারণ, সব জায়গাই তো কাদাময়। ধুয়ে পা যদি কাদাতেই রাখতে হয় তাহলে ধোয়ার মূল্যই বা কি থাকে? শুকনো জায়গায় বা পাথরে সরে গিয়ে পা ধুলে অবশ্য ফলপ্রসূ হয়। কিন্তু 'টকের ভয়ে দেশ ছেড়ে তেঁতুল-তলায় বাসা' হলে তো আর এক মুশকিল।

সুতরাং এহেন পরিবেশে নিজেকে বাঁচাতে হলে কত যে সাধ, সাধ্য ও সাধনার প্রয়োজন তা বলাই বাহুল্য। চোরকাঁটা ভরা মাঠে চলতে যেমন কাপড় বাঁচিয়ে চলতে হয়, পিচ্ছিল্য কাদাময় পথে যেমন পা টিপে-টিপে চলতে হয়, মাইন-পাতা পথে যেমন গাড়ি সাবধানে চালাতে হয়, ঠিক তেমনি ভাবেই মুসলিমকে সতর্কতার সাথে, পা টিপে, হুঁশিয়ার হয়ে, অতি সন্তর্পণে জীবনের গাড়ি চালিয়ে যেতে হবে।

বৃষ্টি নামলে যেমন ছাতা দিয়ে আড়াল করে নিজেকে ভিজা থেকে বাঁচানো যায়, ঝড় বা শিলাবৃষ্টির সময় যেমন একটি মজবুত আশ্রয়-স্থলের প্রয়োজন হয়, বন্যা এলে যেমন কোন উঁচু ঘর বা স্থান দরকার হয়, তেমনিই অপসংস্কৃতির বিভিন্ন অশ্লীলতা থেকে বাঁচতে বিভিন্ন উপায়-অসীলার দরকার মুসলিমের।

আমাদের সামনে যে বড় ঝড় আসছে তা হল কুফরী ও ধর্মহীনতার ঝড়। পশ্চিম থেকে যে ঝড়ের লাল মেঘ দেখা দিয়েছে, তা হল জরায়ু-স্বাধীনতা ও যৌনবাদের ঝড়। সর্বগ্রাসী চরিত্রবিনাশী যে তুফান আমাদেরকে ধ্বংস করতে এবং যৌন-উন্মাদনার যে বন্যা প্রবল তান্ডবের সাথে নৃত্য করতে করতে আমাদেরকে গ্রাস করতে আসছে, তার কবল হতে রক্ষার জন্য আমাদের প্রয়োজন হল নূহের কিশ্তীর। আর সে কিশ্তী হল শরীয়ত ও তার নীতি-নৈতিকতা। যদি তাতে কেউ না চড়ে তবে ডুবে ও ভেসে যাবে ঐ পাপাচারের বন্যায়। প্লাবিত হবে তার যথাসর্বস্ব। আর যদি কেউ নূহের ছেলে কিনআনের মত বলে যে, 'আমি কিশ্তীতে না চড়ে কোন উঁচু পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেব' তবুও সে রেহাই পাবে না। কারণ, এ তুফান হল 'আকাশ-তুলতুল', হিমালয় পর্বতও এ প্লাবনের নিচে হাবুডুবু খাবে।

হে যুবক বন্ধু! কিন্তু তুমি পরিবেশ নোংরার ওজুহাতে নোংরায় গা ভাসিয়ে দিও না। তোমার অভিযোগ, দেশে ইসলামী শাসন কায়েম না হলে পরিবেশ ভালো হবে না। অবশ্য তোমার কথা নিশ্চয়ই ঠিক। পরন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এ কথাও ঠিক যে, পরিবেশ ভালো না করতে পারলে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠাও সম্ভব নয়। কারণ, পরিবেশের অধিকাংশ লোক এ আসমানী শাশ্বত শাসনকে মেনে নিতে না চাইলে তুমি কার জোরে কার উপরে তা জারী করবে?

হে ভাই যুবক! তুমি তো এক রাজা। তোমার রাজত্বে তোমার এমন সার্বভৌমত্ব আছে যে, ঐ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বাইরের কারো জন্য বৈধ নয়। তুমি পার তোমার রাজ্যকে সোনা দিয়ে মুড়তে। তোমার ঐ রাজ্য থেকে অবিচার, অনাচার, অন্যায়, অত্যাচার, অরাজকতা ও বিভিন্ন দুর্নীতি দূরীভূত করে শান্তিময় ইলাহী শাসন পরিপূর্ণরূপে কায়েম করতে তোমাকে কেউ বাধা প্রদান করতে পারে না। তুমি পারবে নির্ভয়ে ঘুসবাজি, চাঁদাবাজি, মস্তানি, গুন্ডামি, ভন্ডামি প্রভৃতি অন্যায়ের দ্বার রুদ্ধ করতে। আর এ কাজে তোমার ভোট যাওয়ারও ভয় থাকবে না এবং গদি হাত ছাড়া হওয়ারও আশঙ্কা থাকবে না।

তুমি যদি তোমার গৃহরাজ্যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পার, তাহলে দেখবে, দেশের রাজাও তার রাজ্যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হচ্ছে। নচেৎ অন্ততঃপক্ষে তোমার রাজ্যকে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দিতে অবশ্যই আগ্রহী হচ্ছে। কারণ, এতটুকু না করলে তার গদি যে উল্টে গিয়ে নদীতে ভেসে যাবে।

হ্যাঁ, তুমি তোমার পরিবার ও গৃহরাজ্যের রাজা। সংসারের সকল ব্যক্তির দায়িত্ব আছে তোমার উপরে। মহানবী ﷺ বলেন, "সতর্ক হও! তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্বশীলতা প্রসঙ্গে কাল কিয়ামতে কৈফিয়ত দিতে হবে। পুরুষ হল তার সংসারের সকল ব্যক্তির জন্য দায়িত্বশীল। তাকে তার দায়িত্বশীলতা বিষয়ে কিয়ামতে জবাবদিহি করতে হবে।---" *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবূদাঊদ, তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৪৫৬৯ নং)*

সুতরাং পথে-ঘাটে ক্ষিপ্ত কুকুরদের 'ঘেউ-ঘেউ' ভেকানি যদি বন্ধ না-ও করতে পার, তাহলে এতটুকু নিশ্চয়ই পারবে যে, সেই কুকুরদলকে তুমি তোমার গৃহাঙ্গনে প্রবেশ না করতে দিয়ে তোমার পরিবেশকে অন্ততঃ শান্ত রাখবে।

বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষার জন্য যেমন তোমার শিশুদেরকে 'ভ্যাকসিন' বা টিকা দিয়ে থাক, ঠিক তেমনিই এমন বিষাক্ত পরিবেশের সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য তাদেরকে

প্রতিষেধক ঈমানী ও তরবিয়তী টিকা পূর্ব থেকেই দিয়ে রেখো।

হ্যাঁ, আর অপরের দোহাই দিয়ে এ কথা বলো না যে, 'কে আর মেনে চলছে?' অর্থাৎ, সবাই যখন নোংরা, তখন আমিই বা ভালো কেন থাকি? লোকে মানে না, তাই আমিও মেনে চলি না।

কিন্তু ভেবে দেখ, তুমি মানবে তোমার সৃষ্টিকর্তাকে, তোমার নিজের ভালাইর জন্য। তুমি কোন মানুষকে ভয় করে, কোন মানুষের খাতিরে ভালো হয়ে চলবে না -এটাই হবে তোমার নিজস্ব স্বকীয়তা ও সবলতার পরিচয়। দুনিয়ার সমস্ত লোক দোযখে গেলে তুমিও কি দোযখে যাবে? দুনিয়ার মানুষ অধিকাংশই কাফের বলে তুমিও কি (নাঊযু বিল্লাহ) কুফরী করবে? তুমি কি চাও না মুক্তি? চাও না বেহেশ্ত?

হ্যাঁ, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের সামনে এমন যুগ আসছে, যে যুগে আমাদেরকে অপসংস্কৃতির দুর্নিবার তুফানের সম্মুখীন হতে হবে। প্রগতিশীল অবাধ যৌনচারিতার বন্যায় ভেসে যাবে আমাদের নীতি নৈতিকতা। ভেঙ্গে যাবে সকল প্রকার সচ্চরিত্রতার বাঁধ।

কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, ব্যভিচার ব্যাপক আকারে প্রকাশ পাবে, মহিলার সংখ্যা পুরুষের তুলনায় অনেক বেশী হবে। একটি মাত্র পুরুষ পঞ্চাশ জন মহিলার দেখাশোনা করবে। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৫৪৩৭ নং)* বাদ্যযন্ত্র ব্যাপক আকারে দৃষ্ট ও ব্যবহৃত হবে, ব্যাপক আকারে প্রকাশ পাবে নর্তকীদলের মক্ষীরাণীরা। যেমন মদ্যপানকে হালাল মনে করা হবে। *(সহীহুল জামে' ৩৬৬৫ নং)* অযোগ্য লোক নেতৃত্ব পাবে। *(বুখারী ৬৪৯৬ নং)*

আর এ কথাও প্রায় সকলের বিদিত যে, তেমন উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশ পাশ্চাত্যে শুরু হয়ে গেছে বহু দিন আগে থেকেই। যে পরিবেশে ব্যভিচার কোন নোংরা বা মন্দ কাজ নয়; বরং আইন-সম্মত বৈধ কাজ। অবৈধ যৌন-সম্পর্ক ও ফেলসানী নিয়ে কোন মাথা-ব্যথা নেই তাদের। যত মাথা-ব্যথা হল, কুমারী ও কিশোরীদের গর্ভধারণ নিয়ে। সেখানে যৌনতা কোন গোপনীয় বিষয় নয়। সেখানে স্কুলে যৌনতা শিক্ষা দেওয়া হয়। কিশোরীদেরকে ব্যভিচার ও হারাম যৌন-সম্পর্কে জড়িত না হতে উপদেশ দেওয়া হয় না; বরং উপদেশ দেওয়া হয়, যাতে তারা এ সম্পর্কে গর্ভবতী না হয়ে পড়ে। তাই তো কোন চৌদ্দ বছরের মেয়ে যদি যৌন-মিলন না করে থাকে, তাহলে তাকে নিয়ে তার সখী ও সহপাঠিনীরা ব্যঙ্গ করে। আমাদের দেশে যেমন পনের-বিশ বছরের কোন তরুণ কলকাতা না দেখে থাকলে বন্ধুরা বলে, 'এখনো কলকাতা দেখিস্নি? তুই এখনো মায়ের পেটে আছিস্ রে!' অনুরূপ ঐ সব দেশে তের-চৌদ্দ বছরের কিশোরীকে নিয়ে তার সখীরা আশ্চর্য হয়ে ও ঠাট্টা করে বলে, 'এখনো এ মজা চাখিস্নি? তুই এখনো মায়ের পেটে আছিস্ রে।' এর ফলে দুই দিনের ভিতরে সেই কুমারীও অকুমারী হয়ে যায়!

এর ছোঁয়া আমাদের পরিবেশে যে লাগেনি তা নয়। বর্তমানে দিল্লী, বোম্বাই, কলকাতা, ঢাকা সহ বড় বড় শহরের পার্কগুলিতে এ যৌন-পরিবেশ বেশ পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন সমুদ্র-সৈকতে পরিদৃষ্ট হয় সেই পাশ্চাত্য অসভ্যতার অকপট পূর্ণ অনুকরণ!

পাড়া-গ্রামে এ ধরনের পরিবেশের বিরুদ্ধে মানুষ এখনও বড় সচেতন ও সোচ্চার। কিন্তু সেখানেও যে ঘুণ ধরেনি তা নয়। বর্তমানের সিনেমা, ভিডিও ও টিভির মাধ্যমে সে অসভ্যতা ভালো ঘরেও অনুপ্রবেশ করছে। যারা এমন অসভ্যতা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে

তাদেরকে 'সাদা-সিধা, ক্ষ্যাপা' মনে করা হয়! একদা এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে কথা প্রসঙ্গে ভর্ৎসনার সুরে বলল, 'তোমার ছেলেরা বড্ড শয়তানী করে বেড়ায়; শাসন করো।' দ্বিতীয় জন বলল, 'এখন সবারই ছেলেরা এমন করে। শুধু আমার ছেলেরা কেন?' প্রথম ব্যক্তি বলল, 'আমার ছেলেরা ও পথে নেই।' তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি অবজ্ঞার সুরে বলল, 'তোমার ছেলেরা তো ক্ষ্যাপা!'

এ কথা সত্য যে, পরিবেশে এমন প্রবাদ তৈরী করেছে যে, যার ফলে বলা হয়ে থাকে, 'পাগল ও শিশু ছাড়া কেউ সত্য কথা বলে না। আর ক্ষ্যাপা ছাড়া কেউ ভালোবাসা (ব্যভিচার) ছাড়ে না!' অতএব যে পরিবেশে কেউ ভালো থাকতে চাইলে তাকে 'ক্ষ্যাপা' বলা হয়, সে পরিবেশে এ টিপ্পনী শোনার পর কে আর ভালো থাকতে চেষ্টা করবে?

যাঁরা এমন নৈতিক অবক্ষয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করেন তাঁদেরকে লোকেরা নাক সিঁটকে 'মৌলবাদী', 'প্রাচীন-পন্থী' প্রভৃতি বলে ব্যঙ্গ করে। ঐ শ্রেণীর ছন্নছাড়ারা ভাবে যে, নৈতিকতার পথ হল প্রাচীন। এ আধুনিক যুগে যৌনতাই হল নারী-পুরুষের স্বাধীনতা ও প্রগতির পথ। নতুনত্ব হল সংস্কারপন্থীদের (?) পথ। নতুনত্বে আছে জীবনের নতুন আনন্দ। গতানুগতিক সেকেলে 'মোডেল চেঞ্জ' না করলে এক-ঘেয়ে কোন জিনিসই ভালো লাগে না। আরবীতে একটি প্রবাদ আছে, (كل جديد لذيذ) অর্থাৎ, প্রত্যেক নতুন জিনিসই মনোহর হয়, মজাদার হয়। হাতে নতুন নোট এলে তা খরচ করতে মায়া লাগে, অন্য কেউ দেখলে তা নিতেও চায়। নতুন কনের প্রতি বরের টান একটু বেশীই থাকে। নতুনত্ব প্রায় সকলের মন আকর্ষণ করে। কিন্তু পরক্ষণেই যখন তা পুরাতন হয়ে যায়, তখন সেই জিনিসের প্রতি মনের ততটা বা মোটেই টান ও আগ্রহ থাকে না। তখন 'নূতন নূতন ন' কড়া, পুরনো হলে ছ' কড়া' তে পরিণত হয়। এটাই বাস্তব।

অবশ্য সব কিছুতেই যে নতুনত্ব ভালো তা সকলেই স্বীকার করবে না। যেমন, 'পুরনো চাল ভাতে বাড়ে, পুরনো ঘিয়ে মাথা ছাড়ে।' যতই নতুন নতুন চাল আবিষ্কার হোক এবং ফলন যত বেশীই হোক না কেন, পুরনো যুগের ও পুরনো চালের মত ভাত আর অন্য চালের হয় না। অনেকে বলে, 'উনি পুরনো মেট্রিক পাশ, উনার শিক্ষাগত যোগ্যতা বেশী। আগেকার পড়া পড়াই ছিল---' ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে সবচেয়ে আধুনিকতম ঐশীধর্ম ইসলামের নীতি-নৈতিকতাকে যাঁরা প্রাচীন ও বস্তাপঁচা মনে করেন, তাঁরা নিজেদের ধর্মের কথা ভেবে দেখতে পারেন। আর যদি ধর্মহীন নাস্তিক হন, তাহলে তো তাঁর নিকট নূতন-পুরাতনের কোন প্রশ্নই নেই। পক্ষান্তরে নতুনত্ব ও সংস্কার আনার অর্থ যদি এই হয় যে, কিছুদিন অতিবাহিত হলেই তা বদলাতে হবে তাহলে আসল সংস্কৃতিটা কি? এর কি কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা বা রূপরেখা থাকবে?

নারীবাদী ও যৌনদুষ্ট পরিবেশে নারী তথা জরায়ু-স্বাধীনতার যে দাবী চরিত্রহীনরা করে আসছে তা আসলে কি সংস্কার? পর্দার অন্তরাল থেকে বের হয়ে বেআবরু অবস্থায় মঞ্চে পুরুষের পাশাপাশি অবস্থানই কি সংস্কৃতি?

মহিলাদের নিয়ে পুরুষদের বিভিন্ন উষ্ণ যৌনসুখ উপভোগের প্রবণতা, তাদেরকে কাছে-পাশে পাওয়ার বিভিন্ন ব্যবস্থা ইসলামের পূর্বে জাহেলী যুগে ছিল। নারী নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হত,

নৃত্যগীত হত, অর্ধনগ্ন দেহ নিয়ে যৌনসুখ ভোগ করা হত। পতিতালয় ছিল, অনেক বেশ্যাই তার ঘরের দরজায় বিশেষ পতাকা উড্ডীন রাখত, যা দেখে খদ্দের জমা হত। ৮/৯ জন পুরুষ একত্রে জমায়েত হয়ে একটি নারীর সহিত যৌন-মিলন করত এবং তাতে গর্ভ হলে ঐ মহিলা নিজের পছন্দমত ওদের একজনকে তার সন্তানের পিতা বলে চিহ্নিত করত। কোন কোন ঈর্ষাহীন স্বামী তার স্ত্রীকে অন্যের কাছে বীর্য সংগ্রহ করে গর্ভধারণ করতে পাঠাত!

ইসলাম এসে ব্যভিচার হারাম ঘোষণা করে রমণীর মান বাড়িয়ে তুলল। সংস্কার এল মানুষের চরিত্রে। সভ্যতা বলতে যা কিছু ছিল সৃষ্টিকর্তার তরফ থেকে তা মানুষকে দেখিয়ে ও জানিয়ে দেওয়া হল। এ সংস্কারের আবার কি সংস্কার চাই? এর পরেও সংস্কার কি অপসংস্কার নয়? একটি মৃত ভূমিকে উৎপাদনশীল করে তাকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করা হলে বলা হয় ভূমি-সংস্কার হয়েছে। এখন যদি কোন বুদ্ধিজীবী বলেন, 'এ ভূমিরও সংস্কার চাই; অর্থাৎ, ফুল-ফলের গাছ নষ্ট করে কাঁটা ও আগাছা লাগাও, তাহলেই নতুনত্ব আসবে এবং গতানুগতিক সৌন্দর্য থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা যাবে।' তাহলে এমন বুদ্ধিজীবী যে কুবুদ্ধিজীবী তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আজ যারা নারীকে মাঠে-ঘাটে, পথে-পার্কে, বাজারে-অফিসে বেপর্দায় এবং নৃত্য-গীত ও শিল্প-কলায় অবৈধ ও অশ্লীলভাবে ব্যবহার করাকে সংস্কার ও সংস্কৃতি মনে করে, সেই মাথা-মোটাদেরকে আর কি বলা যায়?

আর সংস্কার নয়ই বা কেন? নারীই তো এখন সবকিছু। নারীর হাতে রয়েছে সার্বিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। নারীর হাতে রয়েছে পুরুষের শান্তি ও স্বস্তি। সকল জ্বালার মলম। ব্যবসায় উন্নতি চাইলে একজন সুন্দরী যুবতীকে ম্যানেজার করে দাও, ব্যবসা দারুণ চলবে। চা, পান, মিষ্টি অথবা যে কোন দোকানে রূপসী যুবতীকে বসিয়ে দাও, খদ্দের বেশী আসবে তোমার ঐ দোকানেই। সেলুন খুলে যুবতীকে বসিয়ে দাও, আর কোন যুবক তোমার সেলুন ছাড়া অন্য সেলুনে যাবে না চুল-দাড়ি কাটতে। হোটেল খুলে সুন্দরী আধুনিকাদেরকে পরিচারিকা রেখে নাও, সমস্ত হোটেল বন্ধ হয়ে গেলেও তোমার হোটেল খুব ভালোভাবে চলবে। যে কোন ব্যবসায় যোগাযোগের ক্ষেত্রে সুন্দরী পাঠাও, সফলতা সুনিশ্চিত। যে অফিসে বারবার গিয়েও তোমার কার্য সিদ্ধ হয় না, সে অফিসে তুমি নিজে না গিয়ে তোমার আধুনিকা 'মিসেস'কে পাঠাও, তড়িঘড়ি কাজ হয়ে যাবে। কোন কিছুর বিজ্ঞাপন দেবে? সুন্দরীর মুখশ্রী ও সুঠাম রম্য আবেদনময়ী দেহ ব্যবহার কর, ক্রেতাদল তোমার মালকেই বেশী পছন্দ করবে। দর্জি যুবতী হলে আবার কি চাই? সমস্ত যুবকদল ভেঙ্গে পড়বে তার কাছে জামা-প্যান্টের মাপ দিতে। পত্রিকায় মডেল যুবতী বা হিরোইনের ছবি বেশি বেশি ছাপো, পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা বেড়ে যাবে নাটকীয়ভাবে। তাছাড়া পতিতালয়, ফিল্ম, ব্লু ফিল্ম্ প্রভৃতির ক্ষেত্রে নারীর অবদান অস্বীকার করা যায় কি? সংস্কৃতি (?) নৃত্যশালায় যুবতী নর্তকীদের পিছনে অর্থ কামাও, এমন অর্থকরী ব্যবসা আর অন্য কিছু নেই।

মোট কথা, অর্থ উপার্জনের এক আজব যন্ত্র এই নারী। একে গোপনে রাখলে, সতীর হালে ঘরের বউ করে রাখলে কি করে চলে?

অনেক মোটা বুঝের মানুষ মনে করে থাকে যে, ইসলাম বা মুসলিমরা নারীকে 'ভোগ্যপণ্য'

বা 'ভোগের বস্তু' গণ্য করে। আসলে জলাতঙ্ক রোগী তো, তাই নির্মল জলেও কুকুর দেখে থাকে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য যে, যাদের ঘরে-বাইরে নারী, বডিগার্ড নারী, প্রাইভেট-সেক্রেটারী নারী, নাপিত নারী, পরিচারিকা নারী, কফি পরিবেশক নারী, সম্মুখে নারী, পশ্চাতে নারী, ডানে নারী, বামে নারী, বিয়ের আগেও শয্যাসঙ্গী নারী, অফিসে নারী, ক্লাবে নারী, খেলার মাঠে নারী, পার্কে নারী, যাদের কাছে নারী পুরুষ সমাজের 'সেফটি ভাল্ব্', যাদের কাছে পত্নী ও উপপত্নী সমান, যাদের জীবনই নারীতে নারীময়, তাদের কাছে নারী ভোগের বস্তু, নাকি যারা নিজের বিবাহিতা স্ত্রী নিয়ে সন্তুষ্ট এবং অন্য কোন গম্য নারীর মুখদর্শনও অবৈধ ভাবে, তাদের কাছে নারী ভোগের সামগ্রী?

যুবক বন্ধু আমার! নারীবাদীদের কুহকে পড়ে 'মেড়া' হয়ে যেও না। স্ত্রী-কন্যা ও বোনের ব্যাপারে ঈর্ষাহীন হয়ে পড়ো না। তাদেরকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে তুমি নিজে সীমাহীন পরাধীনতার শিকার হয়ে যেও না। আমাদের সমাজ-বিজ্ঞানী নবী ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ বেহেশ্ত্ হারাম করে দিয়েছেন; এদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হল মদ্যপায়ী, দ্বিতীয় ব্যক্তি হল পিতামাতার অবাধ্য সন্তান, আর তৃতীয় ব্যক্তি হল 'মেড়া' পুরুষ; যে তার পরিবারের নোংরামীতে মৌনসম্মতি জানায়।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে' ৩০৪৭ নং)*

নারী-স্বাধীনতাবাদীর অবস্থা এই যে, তার নতি স্বীকার করা দরকার ছিল আল্লাহর বিধানের কাছে; কিন্তু তা না করে গোবেচারা নতি স্বীকার করে স্ত্রীর কাছে! তাই স্ত্রীকে অন্যের সাথে অবৈধ সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে আঁটতে পারে না। কোন কোন কাজে বা খিদমতে বাধ্য করতে পারে না। কারণ, সে তো আধুনিক যুগের মানুষ। সে লাগাম-ছাড়া নারী-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তাই স্ত্রীকে চরম ও পরম স্বাধীনতা দিয়ে মনের উদারতা প্রকাশ করে থাকে। কেউ তাকে 'ভেঁড়া' বললেও স্ত্রী ও তার বন্ধুরা তো তাকে 'উদার মনের মানুষ' বলে প্রশংসা করে। এ যুগে এটাই তো পৌরুষ। অথচ সে বেচারা যে নিজে পরাধীনতার শিকার হয়ে পড়ে, তা হয়তো নিজেও অনুভব করতে পারে না। অবশেষে সে 'স্ত্রৈণ ও আঁচল-ধরা' পুরুষে পরিণত হয়, তা নিজে বুঝতে না পারলেও সমাজের সচেতন মানুষরা অবশ্যই বোঝে।

আর একটি কথা মনে রেখো বন্ধু! লজ্জা হল নারীর ভূষণ এবং সতীত্ব হল তার মূলধন। এ দুই না থাকলে নারীর আর কিছুই থাকে না। তখন অবস্থা হয় বাদুড়-চোষা তালের মত। এতদুভয় নিয়ে নারী বা অন্য কেউ যখন ব্যবসা বা চিত্তবিনোদন শুরু করে, তখন নারী যে কেবল শাড়ী-সর্বস্বই থেকে যায় -তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু নারীবাদীদের তাতে কি এসে যায়? তারা তো আসলে 'কানা বেগুনের ডোগলা খদ্দের।' প্রগতিবাদীর প্রগতির চাকা সদা গতিময়। স্বামী-স্ত্রীর সংসার। সর্বদা ঘরে থেকে এক-ঘেয়েমি জমে ওঠে মনে। এরও একটা সংস্কারের দরকার। এই গতানুগতিকতা দূর করতে প্রগতির পথে খোলা-মেলা বের হতে হবে প্রগতির ময়দানে মুক্ত আকাশের নিচে, কোন পার্কে, সবুজ বনানীতে, অথবা সমুদ্র সৈকতে। যেখানে প্রগতিময় প্রেমের সাক্ষী হবে ছায়াঘন বন, ফুটন্ত ফুল ও তার সুবাস, বিশাল সমুদ্রের ফুলে ফুলে ওঠা তরঙ্গমালা, সৈকতের ধুলাহীন বালি এবং সন্ধ্যা আকাশের কোটি কোটি তারকারাজি। জ্যোৎস্না-আলোকিত স্নিগ্ধময় রাত্রে প্রেমিক-প্রেমিকার মনে ক্ষণে ক্ষণে পুলক জেগে উঠবে। রোমান্স্ ছাড়া প্রেম জীবনের

আর স্বাদ কোথায়? কুকুর-বিড়াল রাস্তা-ঘাটে প্রেম-মিলন ঘটায়, বাঘ-শিয়াল ঘটায় বনে-ঝোঁপে, সুতরাং মানুষ কেন তা ঘরের কোণে গোপনে ঘটাবে? আমি যে একজনকে ভালোবাসি, প্রেমের মিলন উপহার দিই, তা যদি অপ্রকাশিত থেকেই গেল এবং প্রকৃতির কেউ জানতেও পারল না, তাহলে সে ভালোবাসা ও প্রেমের মূল্য কি?

বলা বাহুল্য এই হল প্রগতির গতি। পরন্তু সঙ্গিনী যদি উপপত্নী অথবা 'গার্ল ফ্রেন্ড্' হয় তাহলে প্রগতির প্রকৃতিই হল উক্ত প্রকার রোমান্স্।

আসলে এসবের মূলে রয়েছে লজ্জাহীনতা ও মুসলিমের ঈমানী দুর্বলতা। মহানবী ﷺ বলেন, "অবশ্যই লজ্জাশীলতা ও ঈমান এক অপরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুতরাং দু'টির একটি উঠে গেলে অপরটিও উঠে যায়।" *(হাকেম, সহীহুল জামে' ১৬০৩ নং)* সুতরাং এ শ্রেণীর মানুষদের ঈমান দুর্বল অথবা একেবারে নেই বলেই লজ্জা-হায়াও নেই। আর এ কথা ঠিক যে, বেহায়া মানুষের মনে ঈমানও লুপ্তপ্রায় হতে থাকে।

পরিবেশ নোংরা করতে বড় হাত রয়েছে ঐ তথাকথিত নারীবাদী বহু লেখক-লেখিকাদের। যারা নারী-পুরুষের সর্ব বিষয়ে সমান অধিকার দাবী করে থাকেন। যারা বলেন,

'সাম্যের গান গাই-
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোন (?) ভেদাভেদ নাই।'

ইসলাম যদিও নারীর উপর কোন পীড়ন আনেনি তবুও ঐ শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা ইসলামের পর্দার বিধানকে নারীর জন্য অবরোধ-প্রথা মনে করে দ্বীনের উপর বাক্‌তরবারির আঘাত চালান। এদের ধারণা হল, ইসলামে নারী হল নরের দাসী। মুসলিম পরিবেশে নারীদেরকে হেরেম কারাগারে বন্দিনী করে রাখা হয়! অবশ্য এ হল কোন কোন বাহ্যিক পরিবেশের অবস্থা দর্শনের পর সীমিত ও সংকীর্ণ জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির ফল। আর উক্ত দাবীর ফলেই কবির এ কথা সত্য হয়ে প্রকাশ পেয়েছে,

'পার্শ্ব ফিরিয়া শুয়েছেন আজ অর্ধনারীশ্বর,
নারী চাপা ছিল এতদিন, আজ চাপা পড়িয়াছে নর।'

আজ সর্বক্ষেত্রে নারী ও নারীবাদীরা পুরুষের মত সমান অধিকার দাবী করছে। ভাবতে অবাক লাগে যে, তারা এমন অধিকার দাবী করে বসে, যাতে তাদের নিজেদেরই ক্ষতি থাকে। আমেরিকার কিছু মহিলা সৈনিক দাবী জানায় যে, বৈষম্য না রেখে পুরুষ সৈনিকদের মত তাদেরকেও মাথা নেড়া করতে অনুমতি দেওয়া হোক! কেউ চায় পুরুষদের মত প্যান্ট পরে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে, পুরুষদের মত খালি গায়ে থাকতে! গরমে পুরুষরা খালি গায়ে মেয়েদের সামনে হাওয়া খাবে, অথচ মেয়েরা পুরুষদের সামনে খালি গায়ে হাওয়া খেতে পারবে না কেন? অনেকে কার্যক্ষেত্রে সমান অধিকার নিতে গিয়ে বন্ধুত্ব ও অবাধ স্বাধীনতায় সমান অধিকার দাবী করে। পুরুষ যে কাজ করবে সে কাজ নারী করবে না কেন? নারীদেরকে যে কষ্ট ভোগ করতে হয় তা তারা একা ভোগ করবে কেন? পুরুষদেরকেও তাতে ভাগী হতে হবে। আর পরিশেষে হয়তো সম্ভব হলে এ দাবীও উঠবে যে, প্রথম সন্তান যদি স্ত্রী প্রসব করে তাহলে দ্বিতীয় সন্তান প্রসব করতে হবে স্বামীকে!

অথচ সৃষ্টিকর্তা নারী-পুরুষ সকলকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে রেখেছেন ইনসাফের সাথে। তিনি

নারীর উপর নরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আর এ কথাও স্পষ্ট ঘোষণায় বলে দিয়েছেন যে, “যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তোমরা তার লালসা করো না। পুরুষ যা অর্জন করে, তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে, তা তার প্রাপ্য অংশ। তোমরা আল্লাহরই নিকট অনুগ্রহ ভিক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।” *(সূরা নিসা ৩২ আয়াত)*

শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিতেই নয় বরং বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও নারী ও পুরুষ এক অপরের সমকক্ষ নয়। দৈহিক ও প্রকৃতিগত বহু পার্থক্য রয়েছে নারী-পুরুষের মাঝে। যেমন, পুরুষরা নারীদের চেয়ে শতকরা ১০ ভাগ বেশি লম্বা, ২০ ভাগ বেশি ভারী এবং ৩০ ভাগ বেশী শক্তিশালী। পুরুষ এবং মহিলা একই খাদ্য খেলে নারীদের পক্ষে তা হজম করতে বেশি সময় লাগে। নারীদের ব্যথার অনুভূতি অনেক তীব্র। মানসিক দিক দিয়ে নারীদের পক্ষে বিষাদগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। মস্তিষ্কের উপর হরমনের প্রতিক্রিয়াও মহিলা এবং পুরুষ ভেদে যথেষ্ট আলাদা। মানুষের মন-মেজাজ নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী ‘সেরেটনী’ নামক রাসায়নিক পদার্থ নারীদের দেহে কম তৈরী হয়। যার ফলে নারীদের মানসিক প্রতিক্রিয়া পুরুষদের তুলনায় তীব্র। সে জন্যই বাইরের ঘটনার প্রতি নারীদের প্রতিক্রিয়া অনেক প্রবল। হার্ট এ্যাটাকের ফলে পুরুষদের মারা যায় শতকরা ২৪ জন এবং মহিলাদের মৃত্যুর সংখ্যা হল ৪২। বেশি বয়সের নারীদের হাড় দুর্বল হয়। তাদের হাড়ের ওজনও পুরুষদের তুলনায় অনেক কম। এমনকি তাদের মাংসপেশী কম জোড়ালো এবং তার ওজনও কম।

মোটকথা, আন্দোলনের ফলে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নারীবাদীদের নিকট অংশতঃ স্বীকৃত হলেও প্রাকৃতিক দিক দিয়ে পুরুষ পুরুষ এবং নারী নারীই। তারা সমান হতে পারছে না। হয়তো কোন কালে পারবেও না। *(বিবিসির প্রতিবেদন)*

সুতরাং যুবক বন্ধু! পানি ঘোলা করে মাছ শিকার করে যারা খেতে চায়, তাদের কুহকে পড়ে তুমিও অনুরূপ শিকারীতে পরিণত হয়ো না। এটাই আমার উপদেশ।

আমরা যে পরিবেশে বসবাস করি তার অবস্থা একেবারে ‘উল্টা বুঝিল রাম।’ যেখানে কথা ছিল, দাড়িহীন মুখ দেখে লোকে ঠাট্টা করে বলত, ‘আরে! পুরুষ অথচ মুখে দাড়ি নেই!’ অথবা ‘মুসলিম অথচ মুখে দাড়ি নেই!’ সেখানে লোকে বলে, ‘এ্যাঁ! মুখভর্তি দাড়ি!’ যেখানে দরকার ছিল অর্ধনগ্নতা দেখে অবাক হওয়া, সেখানে তা না হয়ে অবাক হয় পর্দা-পুশিদা দেখে! যেখানে কথা ছিল, নারী (মাথা সহ) গলা-ঢাকা ও পায়ের গাঁট-ঢাকা লেবাস পরিধান করবে, সেখানে এ শ্রেণীর লেবাস ব্যবহার করে পুরুষরা। আর নারীরা করে তার বিপরীত! অর্থাৎ, পুরুষের গলা টাই দ্বারা টাইট করে বাঁধা হয় এবং প্যান্ট ইত্যাদি মাটিতে ঝুলিয়ে পরা হয়। আর মহিলাদের মাথা ও গলার কাপড় নেমে যায় স্তনের উপর এবং গাঁটের নিচের কাপড় উঠে আসে হাঁটুর উপর! পুরুষদের চুল ছোট এবং মেয়েদের চুল বড় করার কথা ছিল। কিন্তু তা না হয়ে অধিকাংশ তার উল্টাটাই হয়ে থাকে। আর সম্ভবতঃ এ ধরণের উল্টাপাল্টা করার নামই হল বর্তমানের সংস্কৃতি ও প্রগতি। সুতরাং সমাজে ইসলামী সংস্কার আনার জন্য যে তোমার বিশেষ ভূমিকা থাকা উচিত, তা বলাই বাহুল্য।

বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতি এই যে, সমাজে যে শ্রেণীর মানুষ বেশী হবে তাদেরই হবে

জয়জয়কার এবং তাদের চরিত্রই পরিণত হবে নৈতিকতা ও সভ্যতায়। লম্পটের সংখ্যা অধিক হলে পুরো সমাজের প্রতিনিধি হয়ে বসবে লম্পট! বেশ্যার সংখ্যা অধিক হলে তাদের স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষার দাবী উত্থাপিত হলে তাদেরকেও দেওয়া হবে প্রতিনিধিত্ব! কেউ তা দিতে না চাইলে সমাজের কত চিন্তাবিদ্ ও কবিরা তাদের সুরে সুর মিলিয়ে গাইবেন,

'কেহ নহে হেথা পাপ-পঙ্কিল কেহ সে ঘৃণ্য নহে,
ফুটিছে অযুত বিমল কমল কামনা-কালিয় দহে।
শোন মানুষের বাণী,
জন্মের পর মানব জাতির থাকে না ক' কোন গ্লানি।'
'---- শুনো ধর্মের চাঁই-
জারজ-কামজ সন্তানে দেখি কোনো সে প্রভেদ নাই!'

যদিও ধর্মে উভয় সন্তানের মাঝে মানবিকতায় কোন পার্থক্য নেই তবুও উভয়ের পিতামাতার মাঝে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে তা বলাই বাহুল্য। যেমন নিজ হাতে কামাই করা টাকাও টাকা এবং চুরি করা টাকাও টাকা। কিন্তু পরিশ্রমী ও চোরের মাঝে যে বিরাট পার্থক্য আছে, তা তো সকলকেই মানতে হবে। পরন্তু সংখ্যাধিক্যের কারণে লম্পট ও বেশ্যাদের দাবী রক্ষার্থে দেশে বিশেষ আইন তৈরী হবে! বরং তাদের ঐ লাম্পট্য ও বেশ্যাবৃত্তি সুবিধা ও সহজ করার জন্য দেশের সরকার সাহায্য-সহযোগিতা করবে। তাদেরকে সমাজের বন্ধু মনে করে দেশ উন্নয়নের (যৌন) কর্মী মনে করা হবে! মানবাধিকার রক্ষার নামে সংগঠন ও সংস্থা কায়েম হবে! এটাই হল বাস্তব, যাদের সংখ্যা ও ভোট বেশী, জয় তাদের। আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও তাদেরই হাতে।

আর এও এক বাস্তব যে, পৃথিবীতে চিরদিনই সৎ ও ভালো লোকের সংখ্যা তুলনামূলক-ভাবে অনেক কম। জগতের অধিকাংশ লোকই অসৎ। অধিকাংশ লোকেই যৌনবাদ ও জরায়ু-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। কারণ, এতেই আছে জীবনের পরম তৃপ্তি, মানুষের প্রকৃতিগত চরম সুখ। সুতরাং তারাই যে পৃথিবীর নেতৃত্ব হাতে পাবে, তা তো গণতন্ত্র-শাস্ত্র আমাদেরকে ভবিষ্যৎ-বাণী করে।

আজ যারা অর্ধনগ্ন হয়ে কোমর দুলিয়ে দুনিয়াকে অশ্লীল নাচ দেখাচ্ছিল, তারাই কাল দুনিয়ার নেতৃত্ব হাতে পাবে। কারণ, দুনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তাদের নাচে খুশী হয়েছে, তাই তাদেরকে পছন্দ ও নির্বাচিত করবে। কাল যাদের দেহরূপ ও অঙ্গভঙ্গি দেখে চক্ষুশীতল করেছে, আজ দুনিয়া তাদের নিকট মাথা নত করে তাদের আনুগত্য করবে!

যুবক বন্ধু! মহানবী ﷺ এর এক অহীলব্ধ ভবিষ্যৎ-বাণী শোন, তিনি বলেন, "মানুষের নিকট এমন ধোকাব্যঞ্জক যুগ আসছে, যাতে মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদীরূপে এবং সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদীরূপে পরিগণিত করা হবে। যখন খেয়ানতকারীকে আমানতদার মনে করা হবে এবং আমানতদার আমানতে খেয়ানত করবে। যখন জনসাধারণের ব্যাপারে তুচ্ছ লোক মুখ চালাবে।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৩৬৫০ নং)*

তিনি বলেন, "কিয়ামত ততদিন পর্যন্ত কায়েম হবে না, যতদিন না পার্থিব ব্যাপারে সবচেয়ে সুখী ও সৌভাগ্যের অধিকারী হবে অধমের পুত্র অধম।" *(আহমাদ, তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৭৪৩১ নং)*

বলা বাহুল্য, সে যুগ যে এসে গেছে তাতে কোন মু'মিনের সন্দেহ থাকতে পারে না।

গণতান্ত্রিক, স্বাধীন ও লাগাম-ছাড়া পাশ্চাত্য সভ্যতা-ঘেরা দেশ ও পরিবেশ। যেখানকার এমন কোন আইন নেই, যা মানুষের প্রবৃত্তিপূজায় বাধা দেয়। বরং অনেক আইনেই উদ্বুদ্ধ করা হয় প্রবৃত্তিপূজায়, ভোগবাদিতায় এবং ধর্মহীন অবাধ স্বেচ্ছাচারিতায়। তাদের সকলের মুখেই যেন একই বাণী,

'দুনিয়াটা মস্ত বড়, খাও-দাও ফূর্তি কর,
আগামী কাল বাঁচবে কি না বলতে পার?'

মরণের পরপারের কথায় অবিশ্বাসীদের এই ভোগবাদী পরিবেশে মুসলিমদের অবস্থাও বিপর্যস্ত। তারপর আবার 'ঘরের ঢেঁকি কুমীর।' মুর্তাদ্দ্ বুদ্ধিজীবীরা; যারা নিজেদের কুবুদ্ধিকে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে জীবিকা ও অর্থ অর্জন করে তাদের লেখনি, বক্তৃতা ও ব্যবহারেও মুসলিম যুবক কুহকগ্রস্ত। এদের মাধ্যমেই মুসলিম সমাজ ও পরিবেশ অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। বাইরের শত্রু যত ক্ষতি সাধন করতে না পারে, তার চেয়ে বহুগুণ বেশী পারে ঐ মীরজাফরেরা।

আর বাইরের শত্রুরা এদেরকে ব্যবহার করে, এদের বুদ্ধিকে ক্রয় করে নিয়ে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার কাজ করিয়ে নেয়। তাদের শক্তিশালী প্রচার-মাধ্যমে তাদেরকেই সমাজসেবী বীর-বাহাদুররূপে চিত্রিত করে।

ভাইজান! যদিও এই শ্রেণীর মানুষদের নিকট থেকে 'গোঁড়া-রক্ষণশীল' বলে অনেক গালি ও কটাক্ষ শোনা যায়, তবুও তুমি মনে মনে আল্লাহর আদেশ পালনে গর্ববোধ করো। আর তাদের ঐ কথায় কর্ণপাত না করে ভেবো, 'কুত্তা ভুঁকতা রহেগা, আওর হাথী চলতা রহেগা।'

মুসলিম আজ সুপরিকল্পিতরূপে হিংসা ও পরশ্রীকাতরতার শিকার। মুসলিমের অমূল্য ধন চরিত্র ও নৈতিকতা দেখে সারা বিশ্বের চোখ-টাটানি রয়েছে ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই। তাছাড়া এমনিতেই মানুষ এক অপরের ভালাই দেখতে পারে না। হাসলে বলে, লোকটা প্রগল্‌ভ। কাঁদলে বলে, ছিঁচকাদুনে। বেশী কথা না বললে বলে, গোমরামুখো। কথা বললে বলে, গপে। সহ্য করলে বলে, ভীরু। প্রতিশোধ নিলে বলে, অসহিষ্ণু, সন্ত্রাসী। ভালোর চেষ্টা থাকলেও মানুষ তাকে মন্দ আখ্যা দিতে দেরী করে না। দেখতে না পারলে চলন বাঁকা লাগে চোখে। অবশ্য এর মূলে থাকে ভুল বুঝাবুঝি ও কুধারণা মাত্র।

ইসলামের প্রতি কিছু সাধারণ শিক্ষিত মানুষদের নাক-সিঁটকানির একটি কারণ এই যে, তাঁরা মনে করেন, ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মত একটি ধর্ম অথবা মতবাদ। অন্যান্য ধর্মের বিভিন্ন তথ্য যেমন বিজ্ঞানের সাথে সংঘর্ষ বাধিয়েছে এবং বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ও বাস্তব তথ্য প্রকাশ করে বহু বৈজ্ঞানিককে ধর্ম-যাজকদের হাতে নিগৃহীত হতে হয়েছে -যেমন হয়েছে গ্যালিলিও প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের সাথে -তেমনি ইসলামেরও বহু তথ্য আছে যা অবৈজ্ঞানিক।

আসলে তাঁরা কিন্তু নিছক ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে মধুকে মদ মনে করেছেন। তুলনা করেছেন দুধকে আলকাতরার সাথে। তাদের চুন খেয়ে গাল তেঁতেছে, তাই দই দেখেও ভয় পাচ্ছেন!

অথচ তাঁরা যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে ইসলাম ও তার সংবিধান

কুরআন ও সহীহ হাদীস এবং উভয়ের সঠিক ব্যাখ্যা নিয়ে বিবেচনা-গবেষণা করতেন, তাহলে অন্ততঃপক্ষে তাঁদের সে ভুল ধারণা ও সন্দেহের মেঘ মনের আকাশ থেকে পরিষ্কার হয়ে যেত। আর উর্ধ্বপক্ষে তাঁরা প্রমাণ করতে পারতেন যে, ইসলাম কোন বিকৃত ধর্ম বা মানব-রচিত মতবাদের নাম নয়। বরং ইসলাম হল মহান সৃষ্টিকর্তা মহাবৈজ্ঞানিক আল্লাহর তরফ থেকে সমগ্র মানব-জাতির জন্য একটি অক্ষত জীবন-ব্যবস্থা। আর তার সাথে তাঁদের দই দেখে সেই ভয় দূর হয়ে যেত; যে ভয় চুন খেয়ে গাল তাঁতার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল।

বিশ্বপরিচালনা করার মত শক্তি কোন ধর্মের না থাকলেও ইসলামের আছে। যেহেতু ইসলাম হল সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। মানব-জীবনের সকল প্রকার সমস্যার পূর্ণ সমাধান এক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে নেই। তাই তো খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বী হয়েও আমেরিকার এক গবেষক লেখক 'মাইকেল এইচ হার্ট' তাঁর 'দি হানড্রেড' নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ কে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে স্বীকার করেছেন এবং একশত মনীষীর মধ্যে তাঁকেই ঐ পুস্তকের প্রথমে স্থান দিয়েছেন। আর এর কারণ উল্লেখ করে বলেছেন যে, অন্যান্য মনীষী ছিলেন শুধু জাগতিক অথবা শুধু ধার্মিক নেতা। কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন জাগতিক এবং ধার্মিক উভয় ক্ষেত্রের পুরোধা। *(শ্রেষ্ঠ ১০০, ৪পৃঃ)*

সুতরাং অন্য ধর্মের ব্যর্থতা দেখে অনুমান করে এ ধারণা এক প্রকার অজ্ঞতা যে, অন্য ধর্ম যা পারেনি, তা ইসলামও পারবে না। অথবা অন্যান্য ধর্মমতের অনুরূপ ইসলামও একটা ধর্মমত। বরং প্রকৃত বাস্তব এই যে, ইসলাম হল স্বয়ংসম্পূর্ণ, আত্মনির্ভরশীলতায় পরিপূর্ণ একটি শ্বাশত ও চিরন্তন ধর্ম।

বহু যুবকই ঐ শ্রেণীর হীনন্মন্যতার শিকার হয়ে পড়েছে। পরিবেশের বিষাক্ত ধুঁয়া নাকে-মুখে লেগে তাদের শ্বাস-রোধ করে ফেলেছে। এর একটি ছোট্ট উদাহরণ হল দাড়ি রাখার ব্যাপার। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা আমাদের সারা দেহে বিভিন্ন ধরনের লোম সৃষ্টি করেছেন। বান্দার কাছে আনুগত্যের পরীক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি কিছু লোম ছাঁটতে, কিছু চেঁছে ফেলতে, কিছু সৌন্দর্যের সাথে বহাল তবীয়ত ছেড়ে রাখতে আদেশ করেছেন; আর তা অবৈজ্ঞানিক নয়। কারণ আল্লাহ বিজ্ঞানময় সৃষ্টিকর্তা। "সৃষ্টি ও নির্দেশ কেবলমাত্র তাঁরই। বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ মঙ্গলময়।" *(সূরা আ'রাফ ৫৪ আয়াত)* এবারে তাঁর আদেশ হল দাড়ি রাখা। যা পুরুষের প্রতীক, সকল মহামনীষীদের আদর্শ এবং মুসলিমের জন্য (কমপক্ষে এক মুষ্ঠি পরিমাণ) ওয়াজেব। কিন্তু পরিবেশের চাপে মুসলিম তা অস্বীকার করতে চায়। কেউ বুকের দিকে ইঙ্গিত করে বলে, 'ঈমান তো এখানে।' অর্থাৎ, মুখে নয়, বুকে। আর তার মানেই হল, বুকে ঈমান রাখাই যথেষ্ট। কাজে পরিণত না করা বা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করা কোন প্রকার ক্ষতিকারক নয়! অথচ ঈমান হল, বুকে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার এবং কর্মে পরিণত করার নাম।

কেউ কেউ বলে, 'সে যুগে ব্লেড ছিল না, তাই লোকে দাড়ি রেখে নিত।' অর্থাৎ, সে যুগে ব্লেড থাকলে তারাও দাড়ি রাখত না এবং এ যুগে ব্লেড আছে, তাই দাড়ি রাখাটা যুক্তিহীন।

অবশ্য এ কথা বলা মূর্খামি বৈ কিছু নয়। যেমন বহু মূর্খ বলে থাকে, 'সে যুগে লোকেরা খেতে পেত না বলে রোযা রাখত। তাছাড়া উপবাস করতে হবে কেন?!' অথচ জ্ঞানী মাত্রই

জানেন যে, দাড়ি রাখার সাথে সাথে কিছু লোম না রাখারও আদেশ দেওয়া হয়েছে। গুপ্তাঙ্গ ও তার চারিপাশের লোম চেঁছে পরিষ্কার করার জন্য ৪০ দিন সময়-সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। অতএব সে যুগেও যে চাঁছা-ছিলার ব্যবস্থা ছিল তা বলাই বাহুল্য।

এই পরিবেশগত কারণেই বহু মহিলা পুরুষের মুখে দাড়ি পছন্দ করে না। তাই তো অনেক স্বামী পছন্দ সত্ত্বেও শুধুমাত্র 'মিসেস'কে খুশ করার জন্য মহানবী ﷺ এর আদেশ লংঘন করে তার আনুগত্য বরণ করে নেয়!

অমুসলিম পরিবেশে বয়সে হাজার ছোট হলেও দাড়ি রাখলেই বয়োজ্যেষ্ঠদের নিকট থেকেও 'চাচা' ব্যঙ্গ শুনতে হয়। অনেকে বিশ্বকবির অনুকরণে আব্দুল মাঝির মত সকলকেই এক নজরে মুখে ছুঁচলো দাড়ি, কামানো গোঁফ এবং নেড়া মাথা থাকা অবস্থায় দেখতে পায়। তাই বহু মুসলিম যুবক শুধু কাফেরদের ঐ শ্রেণীর বিদ্রূপের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে ইচ্ছা সত্ত্বেও আর দাড়ি রাখতে পারে না। অথবা রাখলেও ফ্যাশন মত কেটে-ছেঁটে বাদ দিয়ে রাখে! আর ঐ একই কারণে অনেকে চাকরি পাওয়ার আগে পুরুষের পৌরুষ ও দাড়ি নষ্ট করে ফেলে।

অবশ্য অনেকে এর দায়ে লড়াইও করে থাকে। যেমন এক যুবক বাসের সীটে বসে আছে। সীট বলে রাখার জন্য বাপের বয়সের এক লোক তাকে ব্যঙ্গচ্ছলে জিজ্ঞাসা করল, 'ও চাচা! তুমি কোথায় নামবে?' অমনি যুবক চকিত হয়ে বলে উঠল, 'ভাইপো! আমি অমুক বাসষ্ট্যান্ডে নামব। ভাবী কেমন আছে?' বয়স্ক লোকটা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ভাবী কে?' যুবকটি বলল, 'কেন? তোমার মা। তুমি না আমার ভাইপো?' লোকটি বলল, 'তুমি রাগছ কেন? দাড়ি-ওয়ালা লোকদেরকে তো চাচা বলা হয়।' যুবক বলল, 'তাহলে রবি ঠাকুর তোমার কোন চাচা ছিল? মুনি-সাধুরাও কি তোমার এক একটি চাচা?'

লোকটি স্তম্ভিত হয়ে ভুল স্বীকার করতে বাধ্য হল। হয়তো সে এ ভুল আর কোন দিন করবে না।

এক সহপাঠী তার মুসলিম সহপাঠীকে বহুদিন পর সাক্ষাৎ হলে বলল, 'কিরে তুই এই বয়স থেকে দাড়ি ছেড়ে বুড়ো সাজলি কেন?' মুসলিম যুবক উত্তর দিল, 'বুড়ো সাজার জন্য নয় রে, পুরুষ সাজার জন্য দাড়ি ছেড়েছি।'

সেই সহপাঠীও সেদিন তওবা করেছিল। কিন্তু নরম জায়গায় বিড়ালের আঁচড় যে বড় সুবিধা।

আসলে মুসলিমদের উচ্চ ও দৃঢ় মনোবল নেই বলেই তাদেরকে নিয়ে লোকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের ঐ পা-চাঁটা বহুরূপী মন-মানসিকতাই অন্যের নিকটে তাদের ওজন হাল্কা করে দিয়েছে। যে মুসলিমদের কথা ছিল, আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করবে না, সেই মুসলিমরা আজ সৃষ্টির দাসে পরিণত হয়ে গেছে। অর্থ ও গদির লোভে নিজের স্বকীয়তা বর্জন করতে পর্যন্ত রাজী হয়েছে। হয়তো কোনদিন যদি এর জন্য খাসি হতে হয় তাও হবে!

পক্ষান্তরে রাজনৈতিক যে মর্যাদাতেই উন্নীত হোক না কেন, কোন শিখ তার ধর্মীয় প্রতীক পাগড়ী ও দাড়ি বর্জন করে না। তবুও কই, তাদেরকে কেউ 'চাচা' বলে না, বলতে পারে না। কারণ, তাদের আছে সুদৃঢ় মনোবল, সুউচ্চ আত্মমর্যাদা এবং ধর্মীয় প্রতীকের প্রতি পরম শ্রদ্ধা ও চরম গুরুত্ব। কিন্তু মুসলিম হীনম্মন্যতার শিকার। নিজেদের কাছে নিজেরাই নীচ,

হীন ও নিকৃষ্ট। অপরের কাছে নিজেদেরকে নেহাতই ছোট ও লাঞ্ছিত ভাবে। যে জাতি সর্বের সেরা ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়ে আল্লাহ-প্রদত্ত খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে পৃথিবীতে এসেছিল, যে জাতি আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে নতি স্বীকার করতে জানত না, যে জাতির জন্য মহান প্রতিপালকের ঘোষণা ছিল, "তোমরা নিজেদেরকে হেয় মনে করো না এবং চিন্তিত হয়ো না। তোমরাই হবে (পৃথিবীর) সর্বোপরি, যদি তোমরা মু'মিন হও।" *(সূরা আ-লি ইমরান ১৩৯ আয়াত)* সেই জাতির অবস্থা এই যে, সে নিজের চোখে নিজেকে ছোট ও নীচ এবং অপরকে বড় ও সমুন্নত দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। আজ শুধু মনের ভিতর প্রশ্ন জাগে যে, কোথায় সে জাতি, 'ভিখারীর বেশে খলীফা যাদের শাসন করিল আধা জাহান'? কোথায় সে জাতি, যে জাতির শিক্ষা ছিল,

'আল্লাহর কাছে কখনো চেয়ো না ক্ষুদ্র জিনিস কিছু,
আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে শির করিও না নিচু।'

আজ মনে শুধু প্রশ্ন জাগে,

'আল্লাহতে যার পূর্ণ ঈমান কোথা সে মুসলমান,
কোথা সে আরিফ, অভেদ যাহার জীবনে-মৃত্যু-জ্ঞান?
যার মুখে শুনি' তৌহিদের কালাম,
ভয়ে মৃত্যুও করিত সালাম।
যাহার দ্বীন রবে কাঁপিত দুনিয়া জিন্-পরি-ইনসান।।
স্ত্রী-পুত্রে আল্লারে সঁপি' জিহাদে যে নির্ভিক,
হেসে কুরবানী দিত প্রাণ যারা, আজ তারা মাগে ভিখ!
কোথা সে শিক্ষা আল্লাহ ছাড়া,
ত্রিভুবনে ভয় করিত না যারা।
আজাদ করিতে এসেছিল যারা সাথে লয়ে কুরআন।।'

আসলে আজকের মুসলিম মানসিক আগ্রাসন ও পরাজয়ের শিকার। তাই নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দিতেও লজ্জাবোধ করে! বাঘের বাচ্চা ছাগের পালে পড়ে নিজেকে ছাগ থেকেও ছোট ও হেয় মনে করে নিয়েছে। হিরার টুকরা মাটিতে পড়ে ধূলিধূসরিত হয়ে নিজের পরিচয় ভুলে গিয়ে নিজেকে মাটির ঢেলাই মনে করেছে। অথচ 'মুসলিম' বলে পরিচয় দিতে তার গর্ব হওয়া উচিত ছিল।

মহান আল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকাজ করে এবং বলে, 'আমি একজন (আত্মসমর্পণকারী) মুসলিম', সে ব্যক্তির কথা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কথা আর কার?" *(সূরা ফুসসিলাত ৩৩ আয়াত)*

কিন্তু যে শক্তিবলে সে নিজেকে 'মু'মিন' ও 'মুসলিম' বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করবে, সে শক্তি ঈমান' ও 'ইসলাম' যদি তার মন, কথা ও কাজে দুর্বল বা বিলীন থাকে তাহলে সে নিজেকে গোপন করবে না কেন? যে দেশের রচিত বিকৃত ইতিহাস তার চেহারাকে কালিমাময় করে ফেলেছে সে দেশে নিজ চেহারাকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করবে না তো আর কি করবে? ইতিহাসের পর্দা তুলে কে তার আসল পরিচয় জেনে মনের মাঝে সে হারানো শক্তি

ফিরিয়ে আনবে?

হে ভাই যুবক! পারবে না কি তুমি তোমার বদনামকে সুনামে পরিণত করতে? অবশ্যই পারবে। অতএব সে শক্তি আনয়ন কর, যে শক্তি ছাড়া তুমি হীন ও ক্ষীণ। যে শক্তি পরমাণু বোমা থেকেও অনেক শক্তিমান!

অতঃপর যেখানেই থেকো, যে পরিবেশেই থেকো, মাথা উঁচু করে বলো, 'আমি মুসলিম।' বুক ফুলিয়ে বলো, 'আমি মুসলিম।' জোর গলায় বলো, 'আমি মুসলিম।' গর্বের সাথে বলো, 'আমি মুসলিম।' মনের তৃপ্তির সাথে বলো, 'আমি মুসলিম।' নির্ভয়ে বলো, 'আমি মুসলিম।' নির্দ্বিধায় বলো, 'আমি মুসলিম।' হিম্মতের সাথে বলো, 'আমি মুসলিম।' মনের সকল সংকোচ কাটিয়ে বলো, 'আমি মুসলিম।' জিহ্বার জড়তা কাটিয়ে বলো, 'আমি মুসলিম। আমি সেই সত্তার নিকট আত্মসমর্পণকারী, যিনি বিশ্বজাহানের সৃজনকর্তা ও দয়াময় পালনকর্তা।'

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তুমি যদি কেবল নামসর্বস্ব মুসলিম হও, অন্তঃসারশূন্য মুসলিম হও অথবা ঈমানবিহীন মুনাফিক হও, তাহলে সে সৎসাহস, সে তৃপ্তি, সে গর্ব আসবে কোত্থেকে? পায়খানায় বসে তো আর মৌমাছির পরিচয় দেওয়া চলে না ভাই!

বন্ধু আমার! এত লোক, এত সমাজ, এত ধর্ম ও জাতির মধ্যে একমাত্র তুমিই শ্রেষ্ঠ জাতি, সে কথা কোন সময়ের জন্য ভুলে বসো না। কুরআন সাক্ষ্য দেয়, "তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি; তোমরা মানবমন্ডলীর জন্য উদ্ভূত হয়েছ। তোমরা সৎকাজের আদেশ দেবে এবং মন্দকাজে বাধা দেবে। আর আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে।" *(সূরা আ-লি ইমরান ১১০ আয়াত)* "এভাবেই আমি তোমাদেরকে এক আদর্শ মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি; যাতে তোমরা মানব-জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হতে পার।" *(সূরা বাক্বারাহ ১৪৩ আয়াত)*

আর মহানবী ﷺ বলেন, "ইসলাম চির উন্নত, অবনত নয়।" *(দারাক্বুত্বনী, বাইহাক্বী, সহীহুল জামে' ২৭৭৮ নং)*

সুতরাং মুসলিম হেয় নয়, তুচ্ছ নয়, নয় অবজ্ঞার পুতুল। শত হালাকুর হালাকের মুখে শত শতবার ভেঙ্গে পড়েছি, তবুও আমি আমার স্বকীয়তা নিয়ে জীবিত আছি। কত ফেরআউনের কুটিল চক্রান্ত আমাকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছে, তবুও আমি মূসার অনুসরণ করে আজও টিকে আছি। কত ঝড়-ঝঞ্ঝার মুখে উড়ে-উড়ে আঘাত খেয়েছি, তবুও সেই ঘাত-প্রতিঘাতের প্রবল দ্বন্দ্বের মাঝে আমি বিলীন হয়ে যাইনি। শত বাতিলের তুফান এসে আমাকে বিনাশ করতে চেয়েছে, তবুও আমি সবকিছুকে উল্লংঘন করে পাহাড়ের মত অটল থেকেছি। আর এইভাবে বাতিলের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে এবং আঘাত খেতে খেতে আমি কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত টিকে থাকব দুনিয়াতে। কেউ নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না আমাকে।

কি দোষ আমার যে, সে দায়ে আমি অত্যাচারের নির্মম আঘাত সহ্য করব? কেন আমাকে গৃহহীন ও দেশ-ছাড়া করার এত কুটিল চক্রান্ত? আমিও তো ঐ জালেমদের মতই একজন মানুষ। হয়তো আমার অপরাধ এই যে, আমি সত্যের আহ্বানে সাড়া দিয়েছি। আমি আমার ও সারা সৃষ্টির স্রষ্টারই কেবল ইবাদত করে থাকি। এ দোষেই কি আমি আমার মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কৃত হব?

এ পৃথিবীর আসল উত্তরাধিকারী হল মুসলমান। এ পৃথিবী সুসজ্জিত ও সুশোভিত আছে

শুধু মুসলিমদের জন্যই। মুসলমান ধ্বংস ও নিঃশেষ হলে পৃথিবীও ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। যতদিন পৃথিবীতে একটিও মুসলিমও বেঁচে থাকবে ততদিন পৃথিবীও মহাপ্রলয়ের কবলিত হবে না। *(মুসলিম, মিশকাত ৫৫১৬ নং)*

'তাওহীদ কী আমানত সীনুঁ মেঁ হ্যায় হামারে
আসাঁ নেহী মিটানা নাম ও নিশাঁ হামারা।'

সুতরাং যারা মুসলিমদের ধ্বংস কামনা করে, যারা দুনিয়া থেকে মুসলিমদের নাম ও নিশানা মিটিয়ে দিতে চায়, যারা ইসলামকে মানবতার শত্রু মনে করে, সে হিংস্র মানুষেরা জানে না যে, তারা সেই হিংসুক শিয়ালের মত, যে একদিন একটি কাককে গাছের মগডালে বসে থেকে মনের সুখে 'কা-কা' করতে দেখে হিংসা-জ্বালায় ফেটে পড়ে বলেছিল, 'ঈশ্বর একটি আকাশ-তুলতুল তুফান দেয়, তাহলে শালার কাক কোথায় থাকে তাই দেখব!' অথচ শিয়াল মশায় নিজের কথাটা ভুলেই গেছে। সে এ কথাটা মনে ভেবেও দেখেনি যে, আকাশ-তুলতুল তুফানে গাছপালা ধ্বংস হলে বা ডুবে গেলে কাক ধ্বংস হওয়ার আগে সে নিজে ধ্বংস হয়ে যাবে। গাছের মগডালে পানি পৌঁছনর আগেই তার গর্তের ভিতরে যে পানি থৈ-থৈ করবে সে কথা হিংসার বিষ-জ্বালায় ভাবতেও সুযোগ পায়নি।

ভাই মুসলিম যুবক! তুমি যে পরিবেশেই থাক না কেন, নিজের মাথা উঁচু রেখো; তবে অহংকারী হয়ো না। তুমি তোমার ব্যবহার ও পরিবেশকে এমন নোংরা করে রেখো না, যাতে তা দেখে ইসলাম থেকে মানুষ দূরে সরে যায়, বা দূর থেকেই ইসলামের নাম শুনেই নাক সিঁটকায়। এ জগতে বহু মানুষ আছে, যারা ইসলামকে মনে-প্রাণে পছন্দ করে; কিন্তু ইসলামকে দ্বীনরূপে গ্রহণ করে না। এ শ্রেণীর মানুষের ইসলাম গ্রহণ না করার যে বিভিন্ন কারণ রয়েছে তার মধ্যে একটি কারণ হল, বহু মুসলিম পরিবেশের অবাঞ্ছিত নোংরা ব্যবহার এবং অনেক ফাসেক মুসলিমের বিভিন্ন অনাচার ও দুরাচার। মুসলিমদের দুরবস্থা দেখেই তারা ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয় না। অনেকে অতি পিপাসায় পিপাসার্ত হয়ে দূর দূর থেকে কাজল-জলা দীঘির সন্ধান পেয়েও তার পানির উপর মড়া ভাসতে দেখে আর সে পানি পান করতে রুচিবোধ করে না। ইসলামে মুগ্ধ হয়েও মুসলিমদের বেআমল পরিবেশ দেখে দূর থেকে দূরেই সরে যায়।

অবশ্য এ শ্রেণীর মানুষেরা যে জ্ঞানী মানুষ তা নয়। হীরের টুকরা যদি কারো দোষে কর্দমাক্ত হয় এবং তাতে কাদা দেখে যে হীরে কুড়িয়ে নেয় না সে জ্ঞানী হয় কি করে? 'ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার' দেখে কেউ সে হার বরণ করতে নারাজ হলে সে জ্ঞানী নয়। যে হক দেখে ব্যক্তি চেনে না; বরং ব্যক্তির মুখ দেখে হক চিনতে চায়, তাকে কেউ জ্ঞানী বলতে পারে না। জ্ঞানী হল সেই ব্যক্তি, যে কাদা পরিষ্কার করে হীরের টুকরা কুড়িয়ে নেয় এবং ছুঁচোর কারণে চন্দ্রহারের কদর কম মনে করে না। সেই হল জ্ঞানী, যে হক দেখে পরিবেশের বিচার করে; পরিবেশ দেখে হকের বিচার নয়।

মদীনা ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসর আমার ওস্তায ডক্টর যিয়াউর রহমান আ'যমী সাহেব যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর কর্তৃপক্ষ ও আপনজনেরা তাতে প্রতিবাদ জানিয়ে নানা প্রলোভন ও প্রচেষ্টার বলে স্বধর্মে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল। কিন্তু তবুও তিনি হক থেকে এতটুকু বিচলিত হননি। তাঁকে বলা হয়েছিল, 'ধর্ম পরিবর্তন করার ইচ্ছা যদি তোমার একান্তই ছিল, তাহলে ইসলাম কেন? ইয়াহুদী বা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করলেই তো পারতে।

আজ সারা বিশ্বে তাকিয়ে দেখ, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অর্থ-সম্পদের দিক থেকে কত উন্নত ও সমৃদ্ধ। আর মুসলিমদের অবস্থা তো অধঃপতনের অতল তলে। তাদের ব্যবহার ও পরিবেশ দেখেও কি তাদের ধর্মেই দীক্ষিত হতে উদ্বুদ্ধ হলে?'

আমার ওস্তায বলেন, এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েও আমি সকলের সামনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলেছিলাম, 'আমি আসলে মুসলমান ও তাদের পরিবেশ দেখে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হইনি। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি কেবল ইসলামের সৌন্দর্য দেখেই।'

যত ধর্ম পৃথিবীতে ছিল বা আছে তার কিছু আল্লাহর তরফ থেকে হলেও তাঁর শেষ ও মনোনীত ধর্ম হল ইসলাম। বিজ্ঞানের যুগে এই ছোট্ট গ্রামের মত পৃথিবীতে একটা ধর্মই যথেষ্ট। তাছাড়া অন্যান্য ধর্মে ভেজাল ও বিকৃতি অনুপ্রবেশ করে তার আসলত্ব বিলীন করে ফেলেছে এবং সকল ধর্মের ধর্মগ্রন্থেই এই সর্বশেষ ধর্মের অনুসরণ করার আদেশ রয়েছে। এই সকল সত্যকে উপলব্ধি করেই জ্ঞানী-গুণীরা ইসলাম গ্রহণ করেন। এবারে সে সত্য ধর্মের অনুসারীরা যদি তার সঠিক অনুসরণ না করে চলে, তাতে সত্যের কি আসে-যায়? সত্য যা তা অম্লান আছে, তা বরণ করে নিজেকে সত্যের অনুসারী করার অধিকারী তো প্রত্যেক মানুষের আছে।

যুবক ও প্রচার-মাধ্যম

কাফের ও ফাসেকদের বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যমে মুগ্ধ হয়ে, রেডিও, টিভি, ফিল্ম, পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তকের নানান্ অপপ্রচারের প্যাঁচে পড়ে যুবক তার ধর্ম-বিশ্বাসে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। উঁচু মানের চরিত্র থেকে নিচে নেমে নোংরামির অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে। যদি যুবকের নিকট এমন কোন সুগভীর দ্বীনী-সভ্যতার মজবুত ঢাল এবং প্রদীপ্ত চিন্তাশক্তি না থাকে যার দ্বারা সে হক ও বাতিল এবং উপকারী ও অপকারীর মাঝে পার্থক্য নির্বাচন করতে পারে, তাহলে সে কুফরী, ফাসেকী ও অশ্লীলতায় পতিত হতে বাধ্য। নাস্তিক ও বিধর্মীয় প্রচার-মাধ্যমে মুগ্ধ হয়ে যুবক সম্পূর্ণ বিপরীতমুখে পশ্চাদগামী হয়ে চলতে শুরু করে। যেহেতু তাদের কথা-কৌশলের বীজ বিনা বাধায় যুবকের মন ও মগজে উর্বর জমি পায়। অতঃপর তা তাতে বদ্ধমূল হয়ে কান্ড ও শাখা-প্রশাখা শক্ত হয়ে গজিয়ে ওঠে এবং নাস্তিক্যবাদের ঐ ধাঁধাঁয় যুবক তার জ্ঞান ও জীবনের দর্পণে সবকিছুকে উল্টা দেখে থাকে।

এই রোগের প্রতিবিধানার্থে যুবকের উচিত, পূর্ব থেকেই ঈমানী শিক্ষার প্রতিষেধক টিকা গ্রহণ করা, ঐ সকল দ্বীন ও চরিত্র-বিনাশী প্রচার-মাধ্যম থেকে দূরে থাকা এবং এমন প্রচার-মাধ্যমের সাহায্য নেওয়া যা হৃদয়ে আল্লাহ ও তদীয় রসূলের প্রতি মহব্বতের বীজ বপণ করে, ঈমান ও সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করে। আর এমন প্রচার-মাধ্যম নিয়ে সন্তুষ্ট থেকে দ্বীন ও নৈতিকতা বিরোধী সমস্ত রকমের প্রচার-মাধ্যমকে বর্জন করার উপর ধৈর্য ধারণ করা জরুরী। কারণ, মানুষের মন তো। মন হয়তো অনেক সময় ঐ অপকারী পত্র-পত্রিকা ও শ্রাব্য-দৃশ্য বিভিন্ন প্রোগামের প্রতি ঢলতে চাইবে এবং উপকারী পত্র-পত্রিকাদি পড়তে ও কল্যাণকর কিছু শুনতে ও দেখতে বিরক্তিবোধ করবে, এ সবে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হবে। সে ও তার মনের মাঝে যুদ্ধ

হবে। সে আল্লাহর অনুগত হতে চাইলেও মন চাইবে খেল-তামাশা, অসারতা ও নোংরামিতে মত্ত থাকতে। কারণ, মানুষের মন অধিকাংশে মন্দ-প্রবণ।

ঈমান সজীব ও তাজা রাখতে যুবককে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান প্রধান পুস্তকাদি পড়তে হয় তার মধ্যে (অনুবাদ সহ) আল-কুরআনের বিশুদ্ধ তফসীর, সঠিক বঙ্গানুবাদ হাদীস গ্রন্থ এবং কিতাব ও সহীহ সুন্নাহকে ভিত্তি করে লিখিত বিভিন্ন সত্যানুসারী উলামাগণের বই-পুস্তক। আমাদের দেশে রেডিও টিভিতে তো সঠিকভাবে ঈমানের আলো পাওয়া তো অবাস্তব কল্পনা। বরং তাতে যা কিছু প্রচার হয়ে থাকে তার সিংহভাগই হল ঈমান ও ইসলাম বিরোধী কার্যক্রম।

শায়খ সালেহ আল-ফাওযান বলেন, বর্তমানে যুব-সমাজ বিপজ্জনক স্রোতের সম্মুখীন। যা যুব-সমস্যার মহাসমস্যাবলীর অন্যতম। যদি তাদেরকে ঐ স্রোতের মুখে ভাসতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে তাতে তাদের চরিত্র ধ্বংস হয়ে যাবে। আচরণ বিশৃঙ্খলগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে এবং আকীদা ও দ্বীনী বিশ্বাস বিনষ্ট ও বিলীন হয়ে যাবে। এ ধরনের বহু প্রকার বহুমুখী স্রোত, যার বহু উৎসমুখ রয়েছে। কিছু স্রোত যা বিভিন্ন প্রচার-তরঙ্গে প্রবাহিত। যেমন, রেডিও, টিভি, পত্র-পত্রিকা চরিত্র-বিধ্বংসী বই-পুস্তক ইত্যাদি যা (মিঠা অথচ) তীব্র হলাহল। যুব-সমাজ অথবা তার কিছু তরুণদল, যারা অপকারী থেকে উপকারী নির্বাচন করতে পারে না, তারা তা হাত পেতে গ্রহণ করে নিয়েছে।

যদি পাঠ্য, দৃশ্য ও শ্রাব্যের এই প্রবাহধারাগুলিকে যুবসমাজকে কবলিত করতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে এর পরিণাম হবে চরম ভয়ানক প্রতিকূল। যেহেতু আজকের যুবকদলের অনেকের চরিত্র বিগড়ে গেছে এবং তারা প্রাচ্য অথবা প্রতীচ্যের পরিচ্ছদ, চিন্তাধারা ও আচরণ-বিধির ঠিক তেমন অন্ধানুকরণ করতে লেগেছে; যেমন তারা শুনছে, দেখছে ও পড়ছে। যা ঐ সমস্ত প্রচার-মাধ্যমগুলো তাদের নিকট এনে পৌঁছে দিচ্ছে। যার অধিকতর পরিস্থিতি এই যে, তাতে যুবসমাজকে (চরিত্রগত দিক দিয়ে) ধ্বংস (ও তাদেরকে পদানত) করার গুপ্ত ষড়যন্ত্রই বেশী। বরং এর চেয়ে গুরুতর আপদ এই যে, যুবকের আকীদা ও ধর্মবিশ্বাসকে পরিবর্তন করার বড় অভিসন্ধি থাকে। তাই তো সত্যসত্যই কতক (বরং অধিকাংশ) যুবক মুসলিম নাম নিয়েও নাস্তিক্য, কমিউনিজম ইত্যাদি সর্বনাশী মতবাদের বিশ্বাসীতে পরিণত হয়ে গেছে। যেহেতু সে যখন এই সমস্ত প্রচার-আহ্বানের বিষয়ের প্রতি আগ্রহী থাকে; যা তার জন্য অতি ধীরে ধীরে ও অনায়াসে নিবেদন করা হয় এবং যখন তার মন ও মস্তিষ্ক প্রত্যেক মতবাদ থেকে শূন্য থাকে, আবার তার নিকট এমন কোন প্রতিরক্ষার হাতিয়ার আর না-ই কোন এমন ইলম থাকে; যার দ্বারা সে এই সন্দিগ্ধ অভিসন্ধি অথবা এই ভ্রষ্টকারী প্রচারাদিকে বুঝতে সক্ষম হয় -তখন তার নিকট যা আসে তাই সাদরে গ্রহণ করে নেয়।

অতএব যে যুবক এই প্রচার-আহ্বানকে সত্বর বরণ করে এবং যার মস্তিষ্ক প্রত্যেক উপকারী ইল্‌ম থেকে খালি থাকে, তার মস্তিষ্কে তা যে বদ্ধমূল হয়ে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বলা বাহুল্য তা তার মন-মগজ থেকে ছিঁড়ে ফেলা বড় দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে। আর এটা হল আধুনিক অন্যতম যুবসমস্যা। *(মিন মুশকিলাতিশ শাবাব ১৫- ১৬পৃঃ)*

কচি-কাঁচা মন নিয়ে যুবক যৌবনে পদার্পণ করে। খোলা ও উদার মন তখনও পঙ্কিল ও আবর্জনাময় থাকে না। নিরীশ্বরবাদ, নাস্তিক্যবাদ, বহুশ্বরবাদ, সর্বেশ্বরবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা (ধর্মহীনতা) বাদ, ইয়াহুদীবাদ, খৃষ্টবাদ, মির্জাবাদ, সূফীবাদ, জরায়ু-স্বাধীনতাবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন মতবাদ, সংগঠন ও প্রভাবশীল মিশনারির প্রলোভন ও খপ্পরে যখনই কোন মুসলিম-মন সর্বপ্রথম ফেঁসে যায়, তখনই মুশকিল বাধে তার সঠিক পথে ফিরে আসার ক্ষেত্রে।

আরবীতে একটি কবিতা আছে,

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى ۞ فصادف قلباً خاليا فتمكنا

এর ভাবার্থ হল, কে না চায় তার জীবন-সঙ্গিনী প্রেমিকা সুন্দরী হোক, ধনবতী হোক, উচ্চবংশীয়া তথা মর্যাদাসম্পন্না হোক। কিন্তু তবুও দেখা যায় বহু যুবক নীচ-বংশীয়া কুৎসিত নারীর প্রেম-জালে ফেঁসে তার দায়ে জীবন দিতেও প্রস্তুত হয়। আর তার কারণ হল এই যে, উদার ও উন্মুক্ত মনে প্রথমে যার প্রেম এসে বাসা বেঁধে নেয়, সুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার আগে আকৃষ্যমান মনে অসুন্দরীই বিশ্বসুন্দরীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ফলে সমস্ত বাধা উল্লংঘন করে তাকেই তুলে নেয় জীবন-তরীতে। অথচ ঐ অবসরে যুবক নিজে অথবা তার অভিভাবক যদি সুন্দর-অসুন্দরের মাঝে পার্থক্য নির্বাচন করতে পারে, সুন্দর লাভের সুফল ও অসুন্দর লাভের কুফল যুবকের মনে বদ্ধমূল করে দিতে পারে, সত্যের রূপরেখা তার মানসপটে প্রদীপ্ত রাখতে পারে এবং অসত্যের বাহ্যিক ও কৃত্রিম রূপের ভুয়ো বাহারে যাতে ধোকা না খায় -সে বিষয়ে চেষ্টা রাখে, তাহলে অবশ্য এমন দুর্ঘটনা ঘটে না।

রেডিও, টিভি যাই বল না কেন, এ সবে প্রচারিত অধিকাংশ বিষয়-বস্তুই হল চিত্তবিনোদন। এতে যা লাভ হয় তার চাইতে ক্ষতির পরিমাণ অনেক গুণ বেশী। মুসলিম জাতি-গঠনমূলক তো কোন বিষয়ই নেই বললেই চলে। বরং ইসলামের আদর্শ ম্লান হয় এ সবে, কলঙ্কিত হয় মুসলিমের চরিত্র। কোন কোন প্রোগামে ইসলাম নাম থাকলেও আসলে তা প্রকৃত ইসলাম-বিরোধী। অমুসলিম স্টুডিওতে ইসলামের নামে কথা বলে কোন কাদিয়ানী অথবা বাহায়ী অথবা ভ্রষ্ট কোন দলনেতা। তাদের মুখে বিকৃত হয় ইসলামের আসল ভাবমূর্তি। মুসলিম স্টুডিওতেও জোরে-শোরে প্রদর্শিত হয় গান-বাজনা সহ ঈদ-মীলাদুন্নাবী, মুহার্রম, শবেবরাত প্রভৃতি বিদআতী পর্বের প্রোগাম। তাছাড়া বহুলাংশে পাশ্চাত্য সমাজ ও সভ্যতার ‘এ্যাডভার্টাইজম্যান্ট’ চলে। কিছুতে থাকে ইসলাম-বিরোধী প্রকাশ্য ও সরাসরি আক্রমণ এবং কিছুতে থাকে সময়বিনাশী রঙ্-তামাশা ও যৌন-অনুভূতি জাগরণকারী সুড়সুড়ি। ম্লান করা হয় চরিত্রবাণদের চরিত্র। আর অম্লান ও প্রশংসিত হয় লম্পট ও বেশ্যাদের চরিত্র। বেশ্যাদেরকে ‘যৌনকর্মী’ বলে সমাজ-কল্যাণমূলক কর্মতালিকায় নাম চড়িয়ে তাদেরকে সমাজের বন্ধুরূপে মর্যাদা দিতে ধৃষ্টতা প্রকাশ করে। আর এতে সহায়তা করে শুঁড়ির সাক্ষী মাতালরা, লম্পট ও বেশ্যা, যোনী ও যৌন-স্বাধীনতাবাদী কুপ্রবৃত্তির তাবেদাররা।

সিনেমা থেকে যুবক কি লাভ করে? যে সিনেমার কোন ফিল্মই অবৈধ প্রেমমুক্ত নয়। অপসংস্কৃতি ও যৌনপ্রবৃত্তির সহজ প্রচার-কেন্দ্র এই প্রেক্ষাগৃহ। ১৪ থেকে ১৬ বছর বয়স্কা ২৫২ জন তরুণীকে নিয়ে এক জরিপে দেখা গেছে যে, এদের মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ তরুণী সিনেমা দেখার ফলে অবৈধ যৌন-মিলনে লিপ্ত হয়েছে। আর এদের মধ্যে শতকরা ৩৮ ভাগ

তরুণী অবৈধ পথে পা না বাড়ালেও তারা বিভিন্ন কুচিন্তা ও মানসিক অশান্তির মাঝে কালাতিপাত করে থাকে। *(আল-ইফ্ফাহ ৫৫পৃঃ)*

এরপর রয়েছে নোংরা পত্র-পত্রিকার ভূমিকা। টাইম পাশ করার জন্য বহু যুবকই এর সাহারা নিয়ে থাকে। এদের হাতে থাকে প্রচুর সময়। এমনি বসে থাকতে ভালো লাগে না। তাই উপন্যাস পড়ে, পড়ে বিভিন্ন প্রেম ও যৌন-নিবেদনমূলক কাল্পনিক কাহিনী। কিন্তু এর মাঝে তার ঈমানী হৃদয় কতরূপে ঝাঁঝরা হয়ে যায়, তা হয়তো অনেকে টেরও পায় না।

আসল কথা বলতে কি? আজ মুসলিম বিশ্ব ও বিশেষ করে তার যুবশক্তি মিডিয়া আগ্রাসনের শিকার।

'আধিপত্য বিস্তারে যুদ্ধ জয় এক সময় অপরিহার্য ছিল। যুদ্ধ জয় অপরিহার্য ছিল মূলতঃ তিনটি কারণে। (এক), বিজিত দেশে অর্থনৈতিক লুটপাট, বাজার দখল ও রাজস্ব আয়। (দুই), রাজনৈতিক প্রভুত্ব। (তিন), শত্রুর চেতনায় পঙ্গুত্বসাধন, সাংস্কৃতিক আধিপত্য, নৈতিক বিপর্যয়সাধন ও এভাবে শত্রুর পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা রোধ। কিন্তু এখন যুদ্ধ জয় ছাড়াও এসব সম্ভব। আধুনিক প্রযুক্তির ফলে প্রচারের সামর্থ্য এখন প্রচুর, কোন দেশের সীমানাই আজ আর অগম্য বা দুর্গম্য নয়। সুউচ্চ পর্বত বা বিস্তৃত মহাসাগর কোন কিছুই প্রচারের কাছে অনতিক্রম্য নয়। বিশ্বের ঘরে ঘরে যা কিছু বলার তা এখন অনায়াসেই বলা যায়, বাহিরের কথা ঘরে প্রবেশের এখন আর কোনই বাধা নেই। কিন্তু মুসলমানদের সমস্যা হল, এ কাজে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্য, এর কোনটিই তাদের নেই। শত্রুরা যখন এ ময়দানে বীরদর্পে খেলছে, সেখানে তারা প্রায় নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রচার-মাধ্যমের প্রায় সবই এখন অমুসলিমদের দখলে। ফলে মুসলমানেরা কি শুনবে বা দেখবে সেটিও এখন অন্যের নিয়ন্ত্রণে। চিন্তার প্রভাব প্রতিফলনে প্রচার-যন্ত্রের চেয়ে সফল মাধ্যম আর নেই। নিরেট মিথ্যাও সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা পায় প্রচারের ফলে। প্রযুক্তির বদৌলতে শত্রুর মাইক্রোফোন এখন ঘরে ঘরে, এমনকি বেডরুমেও অনাকাঙ্খিত শত্রু হাজির ও সোচ্চার। ফলে সংকট বেড়েছে মুসলমানদের, এমনকি মুসলমান থাকা নিয়েও। শত্রুর প্রচারের বানে ভেসে গেছে অনেক মুসলমানই, এমনকি বিনষ্ট তো হয়েছে অনেকেই। ইসলামের প্রতি তাদের নেই ন্যূনতম ঈমান-আকীদা, যা মুসলিম পরিচিতির জন্য অপরিহার্য। প্রায় দুই শত বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের যাঁতাকলে মুসলমানদের যে ক্ষতি হয়েছে, প্রচারের প্রভাবে তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি হয়েছে বিগত তিরিশ বা চল্লিশ বছরে। *(তথ্য সন্ত্রাস ১৩৮পৃঃ)*

প্রায় সকল প্রকার শক্তিশালী প্রচার-মাধ্যম হল পাশ্চাত্যের হাতে। জাতি-সংঘের হিসাব মত দেখা গেছে যে, আমেরিকা শুধু ইউরোপের জন্য বাৎসরিক ২২ লক্ষ ঘন্টা টিভি সম্প্রচার করে থাকে! ইউনিস্কোর এক জরিপে বলা হয়েছে যে, সারা বিশ্বে যে টেলিভিশন প্রোগ্রাম চলছে, তার মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগই হল আমেরিকার উৎপাদন। তাছাড়া ইন্টারনেট জগতের ৮৮% বিষয়বস্তু হল ইংরেজী ভাষায়। আসলে টিভি যোগে পৃথিবীটা এখন চারিপাশে আয়না বসানো সেলুনের মত হয়ে গেছে। অন্য কথায় গোটা বিশ্বটাই এখন এক রঙ্গমঞ্চে পরিণত হয়ে পড়েছে। যাতে রয়েছে সকল প্রকার সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংস ও বিলীন করে

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে একাকার হওয়ার প্রতি আহ্বান। আমেরিকা আজ সারা বিশ্বের মাটি দখল না করলেও সারা বিশ্বের মানুষের মন-মানসিকতা ও নৈতিকতা দখল করতে চলেছে। দুর্নিবার গতিতে তাদের সেই অপসংস্কৃতির বিভিন্ন কর্মকান্ড এই 'গ্লোবোলাইজেশন'-এর যুগে সারা বিশ্বমনে জাঁকিয়ে বসতে চলেছে।

বর্তমানের শিশু জন্মের পরে সামান্য জ্ঞান লাভ করার পর হতেই টিভির সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে। তাছাড়া গবেষণায় দেখা গেছে যে, কচি-কাঁচা শিশুমনে অনুকরণের মাত্রা রয়েছে খুব উচ্চ। শিশুরা দেখা ছবির নায়ক-নায়িকার প্রায় ৬৭% অনুকরণ করে থাকে। *(আল-ইফ্ফাহ ৫৪পৃঃ)*

আজকাল প্রায় ঘরে ঘরে টিভি। কারো ঘরে না থাকলে পাশের ঘরে গিয়ে দেখে আসতে শিশুদেরকে বাধা দেওয়া বড় শক্ত। একটা শিশুর জীবনে বর্তমানে টিভির চিয়ে অধিক প্রিয় 'খেলনা' বা খেলার সাথী আর অন্য কিছু নেই। ফলে এই সাথীর সম্পূর্ণ প্রভাব যে তার কাঁচা মনে পড়েই থাকে, তা বলাই বাহুল্য। সাথীর অনুকরণে নিজেকেও গড়ে তুলতে চায় এক হিরো বা হিরোইন রূপে। তার স্বভাব ও আচরণ হয় প্রায় নায়ক-নায়িকার মত। আর প্রায় ছবিতেই নায়ক-নায়িকার অভিনয় ও চরিত্র হল, অপরাধ, যৌনতা, প্রেম-ভালোবাসা, অপরাধ-রহস্য, যুদ্ধ, শৈশব, ইতিহাস, ভ্রমণ, কমেডি অথবা সামাজিক প্রোপাগান্ডা নিয়ে। এর মধ্যে পনের শ' ছবির তিন চতুর্থাংশই নির্মিত হয়েছে অপরাধ, যৌনতা ও প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে। ফলে এসব ছবি দেখার কারণেই অঙ্কুর থাকতেই উক্ত শিশুদের নৈতিক চরিত্র বিনষ্ট হতে শুরু করে। এরা পড়াশোনা করতে চায় না। পড়তে মন পায় না। সহপাঠী ও খেলার সাথীদের সঙ্গে মারামারি করে জিততে চায়। খেলাধুলা, পোশাক-পরিচ্ছদ, চুল আঁচড়ানোর ধরন ও কথাবার্তার রীতি পাল্টে যায়। পর্দায় যা দেখে, শিশুমন তার সবটারই অনুকরণ করার চেষ্টা করে।

শিক্ষক ও মা-বাপ যা শিক্ষা দিতে পারেন না, সিনেমা তা পারে। শিশুর মনে ছবির নায়ক-নায়িকাদের অঙ্গ-ভঙ্গি, তাদের রুচিহীন আলাপন, ক্রোধ ও অপরাধ সংঘটনে কৌশল সবই দাগ কাটে। তখন শিশু আর শিশু থাকে না। 'ইচর-পাকা' হয়ে তার মধ্যে ফুটে ওঠে বয়স্ক অপরাধীর ভয়ঙ্কর অভিব্যক্তি। ছবির নায়কের মত সে কোমরে হোলষ্টার বাঁধে অথবা পকেটে পিস্তল রেখে হঠাৎ তার প্রতিপক্ষকে গুলি করতে চায়। চলচ্চিত্রে অভ্যস্ত একটি শিশুর আচরণ থেকে ফুলের পাঁপড়ির মত ঝরে পড়তে থাকে সুকুমার বৃত্তিগুলো। শৈশবেই সে পা বাড়ায় অপরাধ জগতের অন্ধকার গলিতে। *(তথ্য সন্ত্রাস ১৩৬পৃঃ)*

যান্ত্রিক সভ্যতার এই যুগে বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তির এক অনন্য উপহার হল এই টিভি। যন্ত্রের এই যাদুকাঠির মাধ্যমে মানুষ যেন পুরো বিশ্বটাকে শোবার ঘরে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। সকল দেওয়াল, দরজা ও প্রহরীর বাধা উল্লংঘন করে যেমন শিশু-কিশোরদের মন কেড়ে নিতে পেরেছে, তেমনি সকল সতর্কতা ও পর্দা সত্ত্বেও অন্তঃপুরের মহিলাদেরকে 'চোখ মারতে' এবং সতী-সাধ্বীদের সতীত্ব হনন করতে প্রয়াস পেয়েছে। এমনকি স্যাটালাইটের মাধ্যমে সারা বিশ্বে প্রচারিত এই যন্ত্র-মন্ত্র যে মু'মিনের ঈমানও ছিনিয়ে নিতে চলেছে, তা বলা নিষ্প্রয়োজন। ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরমাণু বোমার চাইতেও অধিক শক্তিশালী অস্ত্র এই টেলিভিশনকেই পশ্চিমা-বিশ্ব ব্যবহার করছে। বিশ্ব-জনমতে

প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে তারা। ইসলাম ও মুসলিমদের খামাখা বদনাম করার সুযোগ প্রয়োগ করছে এরই মাধ্যমে। ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও বিভিন্ন অপবাদকে এক শ্রেণীর মানুষ ঘরের ভিতরে নরম বিছানায় শুয়ে শুয়ে লুফে নিচ্ছে! পশ্চিমা-সভ্যতার নৈতিকতা-বিবর্জিত চরিত্রহারী বিভিন্ন রঙ-তামাশায় চমৎকৃত হয়ে ভাবতে শুরু করেছে, তারাই হল উন্নত ও সভ্য মানুষ। আর বিবেক যখন মেরে ফেলা হয়, তখন সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য, সভ্যতাকে বর্বরতা এবং বর্বরতাকে সভ্যতারূপে বিবেচনা করা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

বিবেক ধ্বংস করার মত যত মাধ্যম আছে, তার মধ্যে টেলিভিশন হল সবচাইতে বেশী বিপজ্জনক। ইউনিস্কোর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, মানুষ তার ৯০% জ্ঞান লাভ করে থাকে দর্শন-শক্তির মাধ্যমে। আর ৮% লাভ করে শ্রবণ-শক্তির মাধ্যমে। বিভিন্ন আকার-আকৃতি ও ভাব-ভঙ্গিমা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে জ্ঞান দান করে কোন ভাষা বা বা শব্দ তা পারে না। *(আল-ইফ্ফাহ ৫১পৃঃ)*

সুতরাং এই যন্ত্র যে ছয়কে নয় এবং নয়কে ছয় করার কাজে কত বেশী উপযোগী তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

হক-নাহক বা ন্যায়-অন্যায় ও সত্য-অসত্যের দ্বন্দ্ব অতি পুরাতন। 'হক' যেখানেই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সোচ্চার হয় 'নাহক' সেখানেই তাকে পরাভূত করার উদ্দেশ্যে অধিক শক্তিশালীরূপে তৎপর হয়। যখনই সত্যের সূর্য বিশ্বজগৎকে আলোকমন্ডিত করতে চায় তখনই অসত্যের মেঘমালা তাকে আড়াল করার জন্য বিশ্বব্যাপী ঝড়-তুফান সৃষ্টি করে। ঐতিহাসিকভাবে এটাই চির সত্য।

'মুসলমানরা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে পিছিয়ে আছে একথা ঠিক, কিন্তু চারিত্রিক সম্পদে আজও বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জাতি। প্রযুক্তিগত উন্নতিতে পাশ্চাত্যে ভোগ-বিলাসের জোয়ার বইলেও নৈতিকতার মানদন্ডে তারা পশুর পর্যায়ে নেমে গেছে। পশুর কাছে মনুষ্যত্ব যেমন অকাম্য, তেমনি ভোগবাদী ও জড়বাদী পাশ্চাত্যের কাছে তাওহীদবাদী মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বও অসহ্য। যুদ্ধ করে অথবা অস্ত্র দিয়ে কারো চরিত্র ধ্বংস করা যায় না। চরিত্র ধ্বংসের জন্য হানা দিতে হয় মানুষের মনোজগতে। এজন্য প্রয়োগ করতে হয় মনস্তাত্ত্বিক অস্ত্র। আর প্রচার-মাধ্যমই হচ্ছে সেই অস্ত্র, যা পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অত্যন্ত কার্যকরভাবে প্রয়োগ করছে মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে।

যে ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের পূর্বপুরুষকে দিয়েছে গোলামীর জিঞ্জির এবং তাদের দিয়েছে ব্লু-ফিল্ম্ ও হেরোইন উপহার, সেই পাশ্চাত্যের শক্তির বিরুদ্ধে তাদের কোন অভিযোগ নেই। আশীর্বাদকে তারা অভিশাপ আর অভিশাপকে তারা আশীর্বাদ মনে করছে কেন? সঙ্গত কারণেই অনুসন্ধিৎসু মনে এসব প্রশ্নের উদয় হতে পারে। এসব প্রশ্নের জবাব দেয়াও কোন কঠিন কাজ নয়, মুসলিম তরুণ-তরুণীদের জীবন থেকে ইসলামী পরিচয় মুছে দিতে যে প্রতিষ্ঠানকে এককভাবে দায়ী করা যায়, তা হচ্ছে পাশ্চাত্য পরিচালিত প্রচার-মাধ্যম।' *(তথ্য সন্ত্রাস ১৩৪পৃঃ)*

'প্রচার-যন্ত্রের উপর মুসলিম-মালিকানা যে নেই, তা নয়। তবে ব্যাপ্তি ও ব্যাপকতার তুলনায় পাশ্চাত্যের প্রচার-মাধ্যমকে সূর্য বললে মুসলিম প্রচার-মাধ্যমকে মোমবাতির চেয়ে

বেশী কিছু বলা যায় না। প্রচার-যন্ত্রের প্রায় সব ক'টি আবিষ্কৃত হয়েছে ইউরোপ ও আমেরিকায়। ধনকুবের, লেখক ও বুদ্ধিজীবীদেরও অভাব নেই সেখানে। এ মৌলিক সুবিধার জন্য পাশ্চাত্য জগৎ মুসলিম বিশ্বসহ বাদবাকি পৃথিবীতে আধিপত্য কায়েম করতে পেরেছে। ঔপনিবেশিকতার যুগ শেষ হয়ে গেলেও প্রচার-মাধ্যমের কল্যাণে শুরু হয়েছে এক নয়া ঔপনিবেশিকতার যুগ। সাবেক ঔপনিবেশিক শাসনকে চোখে দেখা যেত, কিন্তু বর্তমান ঔপনিবেশিক আধিপত্যকে দেখা যায় না। মুসলিম দেশগুলোর প্রশাসনিক পদগুলোয় দেশীয় মুসলমানরাই রয়েছে। তবে এসব দেশের আত্মার শাসক পাশ্চাত্য। এটা এমন এক মানসিক দাসত্ব, যা অন্যের নজরে আসে না এবং যে তার শিকার, সে নিজেও বোঝে না। ঔপনিবেশিক শাসনের কুফলস্বরূপ মুসলিম দেশগুলোয় এ মানসিক দাসত্ব বিস্তার লাভ করছে। স্বাধীনতা লাভ করেও আমরা নিজেদের ভাষায় কথা বলি না, নিজেদের পোশাক পরিধান করি না, নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ভালোবাসি না। ঘরে থেকেও আমরা যেন বিলেতী। ইংরেজীতে কথা না বললে অভিজাত হওয়া যায় না। মাকে ম্যাম্মি, বাবাকে ড্যাডি, চাচাকে আংকেল, চাচীকে আন্টি বলে না ডাকলে জাতে উঠা যায় না। আমাদের এ মানসিক বৈকল্যের জন্য কে দায়ী? দায়ী আমরাই। চিত্তবিনোদন ও জ্ঞানার্জনের জন্য যেসব মাধ্যমকে আমরা মোক্ষম বলে মনে করি, সেগুলোর স্বরূপ কি আমরা কখনো তলিয়ে দেখেছি? এ দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সর্বনাশ ডেকে আনছে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, ফুল থেকে যেমন মধু আহরণ করা যায়, তেমনি বিষও আহরণ করা যায়। আমরা মধুর পরিবর্তে যেন বিষ আহরণ করছি। সে জন্য পুঁজিবাদীরা আমাদের চারপাশের পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছে চোখ ধাঁধানো উপকরণ। টিভি, রেডিও, সিনেমা, উপগ্রহ, ডিশ এ্যান্টিনা, ভিসিআর, ব্লু-ফিল্ম, পর্নো পুস্তক-পত্রিকা ইত্যাদি। এগুলো আধুনিক জীবনের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বাহ্যত আমাদের জীবনকে করেছে সুন্দর ও সহজ, একথা যেমন সত্য, তেমনি এসব উপকরণকে কাজে লাগিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালিয়ে গভীর ষড়যন্ত্রে মেতেছে, একথাও সমান সত্য।' *(ঐ ১৩৩পৃঃ)*

কিন্তু 'কেন তারা এ পথ বেছে নেয়? প্রথম কথা হল, নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়োজনে। তারা মনে করে, শত্রুর উন্নত মাথা অবনত করার জন্য এ অস্ত্রের চেয়ে অধিকতর মারাত্মক অস্ত্র আর কিছু হতে পারে না। সম্মুখ-সমরে যেতে হয় না, কৌশলে কর্ম সারা যায়। ধরা পড়ার ভয় থাকে না। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা যায় অনায়াসে। সবচেয়ে বড় দুশমনকে কাবু করার জন্য তারা এই শক্তিকেই পারমাণবিক বোমার চেয়েও অধিকতর শক্তিশালী মনে করে। মুসলমানই তাদের প্রধান শত্রু। তারা জানে, মুসলমানদের হাতে শক্তিশালী কোন মিডিয়া নেই এবং তাদের 'ইনট্রিগ্রিটি অব কারেক্টার'ও নেই। তাই মিডিয়া সন্ত্রাসের অস্ত্রের মাধ্যমে তাদের দুর্বল করে রাখলে কখনো আর তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। যদি তারা অতীতের মত আর একবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে, তাহলে দুনিয়ার বাদশাহী আবার তাদের হাতে চলে যাবে। তাই তারা বিশ্বের সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী অস্ত্র এই মিডিয়ার সম্রাট হয়ে গোটা বিশ্বকে বিশেষ করে মুসলিম দুনিয়াকে পঙ্গু করে রেখেছে। প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যেই তারা এ পথ বেছে নিয়েছে।' *(তথ্য সন্ত্রাস)*

অবশ্য মুসলিম ছাড়া অমুসলিমরা যে উক্ত যন্ত্রের ক্ষতির থাবাতে পরিণত হয় না, তা নয়। তাদের ধর্মীয় ও নৈতিক মাথাব্যথা ততটা না থাকলেও সাংসারিক জীবনে সুখ কে না চায়?

১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ সালের মধ্যে ২০ হাজার লোকের উপর চালানো একটি জরিপে দেখা গেছে যে, ২৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী সুখী দম্পতির সংখ্যা ৪৪% থেকে ৩২% এ নেমে গেছে। এর কারণ স্বরূপ যা বলা হয়েছে তা হল দু'টি; প্রথমতঃ বহু যুবতীর চাকরী-প্রবণতা এবং দ্বিতীয়তঃ স্বামী-স্ত্রীর চরিত্র-ব্যবহারে টিভি ও সিনেমা তথা চলচ্চিত্র জগতের বিপুল প্রভাব। কারণ, এ জগৎ থেকেই পাওয়া যায় স্বামীর অধীনে থেকেও স্বাধীনা হয়ে চলার শিক্ষা। স্ত্রী থাকতেও 'গার্ল-ফ্রেন্ড' রাখার আধুনিক ফ্যাশন!

তদনুরূপ অপরাধ জগতেও চলচ্চিত্রের অবদান বড়। স্পেনের এক জরিপ মতে দেখা গেছে যে, ৩৯% অপরাধ (খুন, ডকাতি, ধর্ষণ ইত্যাদি) অপরাধীরা সিনেমা ও টিভির বিভিন্ন সিরিজ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সম্পন্ন করেছে। *(আল-ইফ্ফাহ ৫২পৃঃ)*

ব্যাপক হারে গুপ্ত হত্যা, বিমান ছিনতাই, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও সাম্প্রদায়িকতার পশ্চাতেও রয়েছে এই সর্বনাশীর সক্রিয় ভূমিকা। ' ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ১০ বছরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে একশ' ভাগ অপরাধ-প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এ দুর্যোগপূর্ণ সময়ে ১৯৬৮ সালে সহিংসতার কারণ অনুসন্ধান ও প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণে এক নির্বাহী আদেশে প্রেসিডেন্ট জনসন একটি জাতীয় কমিশন গঠন করেন। কমিশন তদন্ত করে দেখতে পায় যে, এবিসি, এনবিসি ও সিবিএস টেলিভিশন নেটওয়ার্কে প্রচারিত অপরাধ-বিষয়ক অনুষ্ঠানই এসব দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য দায়ী।

ঐ মার্কিন মুল্লুকের হাল অবস্থা এই যে, সে দেশে প্রতি ৭ মিনিটে একটি করে নারী ধর্ষণ এবং প্রতি ২৪ মিনিটে একটি করে হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়। প্রতি দু'টো বিয়ের একটি এক বছরের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়। সে দেশে ১৪ বছরের কুমারী মেয়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। দেশটি যে সব কারণে এত কলঙ্কিত হয়েছে তা আমাদের দেশে চালান দিয়ে আমাদের তাই বানাতে চায়। ভাবখানা এই যে, আমরা তো মরেছি, এবার তোমরাও মর। আমরাও দু'বাহু বাড়িয়ে তা বরণ করে নিয়েছি। এই আগ্রাসী 'কালচার' ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে গণমাধ্যমগুলো। এটা করা হচ্ছে অত্যন্ত সুকৌশলে। রেডিও-টিভি বিশেষ কায়দায় সে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। কারণ, ওখানে বসে যারা কলকাঠি নাড়েন, তাদের অনেকেই ডিস্কো চরিত্রের। নানাভাবে গণমাধ্যমগুলো তরুণদের জীবন-বিচ্ছিন্ন সংস্কৃতি চর্চায় অনুপ্রাণিত করছে, কখনো বিজ্ঞাপনের আবরণে, কখনো সংগীতের আবহে, কখনো বিদেশী চলচ্চিত্র প্রদর্শন করে, কখনোও সরাসরি এই কাজটি করে যাচ্ছে। *(অপসংস্কৃতির বিভীষিকা ১৭পৃঃ)*

সম্প্রতি এক জরিপে দেখা গেছে যে, প্রতি ৮ সেকেন্ডে একজন মার্কিন মহিলা ধর্ষিতা হয়। এ হিসেবে বছরে সাড়ে ৩৯ লাখ মহিলা ধর্ষিতা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা ২৬ কোটি। এর মধ্যে মহিলার সংখ্যা ৮ কোটির কাছাকাছি। বছরে যদি সাড়ে ৩৯ লাখ মহিলা ধর্ষিতা হয়, তাহলে এ পর্যন্ত তাদের মহিলার শতকরা কত ভগ্নাংশ মহিলা ধর্ষণের হাত থেকে রক্ষা পায় সেটাই প্রশ্ন। হিলারী ক্লিনটন বাংলাদেশে এসে এখানকার নির্যাতিত মহিলাদের জন্য চোখের পানি ফেলেছেন। চোখের পানি তো ফেলার কথা তাঁর জন্য আমাদের। যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ষণের

পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে মনে প্রশ্ন জাগে, হিলারীদের কত জন ধর্ষণের হাত থেকে অক্ষত থাকতে পারছেন?

কাউকে পোড়াতে গেলে নিজেই পুড়ে মরতে হয়। মুসলমানদের বিনাশের জন্য যে যুক্তরাষ্ট্র অবাধ তথ্য-প্রবাহের নামে বিকৃত প্রচার-যন্ত্রগুলোর মুখ উন্মুক্ত করে দিয়েছে, সে যুক্তরাষ্ট্রে কারো শান্তি নেই। ঘুম হয় না; ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমাতে হয়। অনেকের বড়িতেও কাজ হয় না।

গায়ের জোরে মুসলিম দেশগুলোকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র বলে গালি দেয়া হচ্ছে। অথচ পৃথিবীতে সন্ত্রাসের আদি জন্মদাতাই হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশ। সন্ত্রাসের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে ডিশ এ্যান্টিনার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের টিভি নেটওয়ার্কগুলো। বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস ও সহিংসতা ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব পাশ্চাত্যের টিভি নেটওয়ার্কগুলো কিভাবে এড়াবে? স্টার টিভিতে প্রচারিত অনুষ্ঠানমালার ৯০ শতাংশই অপরাধ বিষয়ক। এসব ছবিতে আছে র‍্যাম্বো স্টাইলে ফাইটিং, মারদাংগা, মারামারি। শিল্পকলা হচ্ছে জীবনের প্রতিচ্ছবি। অথচ পাশ্চাত্য ছবিতে মানুষের জীবনে মারামারি, গোলাগুলি ছাড়া আর কিছু নেই। এদের টিভি অনুষ্ঠানমালায় জীবনের সুকুমারবৃত্তির প্রতিফলন নেই, নৈতিক উন্নয়নের উপযোগী শিক্ষণীয় কিছু নেই। এটা কেন?

প্রচারণার জোরে নাৎসীবাদ যেমন টিকে থাকতে পারেনি, তেমনি পাশ্চাত্যের ঘৃণিত পুঁজিবাদও প্রচারণা চালিয়ে টিকে থাকতে পারবে না। সত্যকে কিছুদিনের জন্য আড়াল করে রাখা যায়, চিরদিনের জন্য নয়। ইতিহাসের অমোঘ বিধানে ভেসে গেছে হিটলার মুসোলিনী। একই পথে হারিয়ে যাবে ইংগ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। বিশ্বের অগণিত মানুষের মনের মণিকোঠায় চিরভাস্বর হয়ে জেগে থাকবে সত্যের আলো। *(শাহাদাত হোসেন খান, তথ্যসন্ত্রাস ১৩৭পৃঃ)*

চলচ্চিত্র জগতের যে সব সিরিজ আমরা নিয়মিত দর্শন করে চলেছি তা আসলে আমাদের শত্রুরা সরবরাহ করে থাকে, সে কথা হয়তো আমার বহু যুবক বন্ধু জানে না। সিনেমা বা ভিডিও হলের টিকিট কেটে অথবা টিভির পর্দায় চোখ ফেলে রেখে ছেলে-মেয়ে নিয়ে অথবা গুরুজনদের পাশে বসে যে ছবি দর্শন করে তৃপ্তি লাভ করা হয়, তা আসলে আমাদের কত বড় ক্ষতি করছে এবং সারা দুনিয়াকে কোন্ পথে নিয়ে যাচ্ছে ঐ শত্রুপক্ষ, তা হয়তো অনেকে তলিয়ে দেখতেও চায়না। এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ইহুদীরা সারা দুনিয়াতে সন্ত্রাস এবং চরিত্র-বিধ্বংসী বিষ ছড়াচ্ছে। চলচ্চিত্র জগতে 'হলিউড'ই হলো বিশ্বের এক নম্বর প্রধান শহর, সেখানকার চলচ্চিত্র সারা দুনিয়াতে সরবরাহ হয়ে থাকে। হলিউডের চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রধান অংশ ইহুদী। হলিউড হতে প্রচুর অশ্লীল ছবি নির্মিত হয়ে পুরো বিশ্বে তা ছড়িয়ে পড়ে অবশ্য টিভি সিরিজের নির্মাতারাও অশ্লীল সিনেমা নির্মাণ করে থাকে। অত্যন্ত বড় মাপের পাঁচটি টিভি কোম্পানী ছাড়াও আরো ২টি আমেরিকান টিভি কোম্পানী রয়েছে, যেগুলোর নাম হলো কেনিন এবং 'ইটিভি'। এরা বিভিন্ন অশ্লীল সিরিজ নির্মাণ করে এবং পুরো দুনিয়ায় সাপ্লাই করে। শুধু 'মধ্যপ্রাচ্যেই' এদের ৪২টি শাখা রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে আমেরিকা, লন্ডন ও ফ্রান্সে তৈরী ব্লু -ফিল্মও তারা ব্যাপকভাবে প্রচার করে থাকে।

এ হল আমেরিকার মিডিয়া জগতের মোটামুটি চিত্র। আমেরিকান মিডিয়ার পুরোটাই

ইহুদীদের দখলে এবং সেই মিডিয়ার মাধ্যমে ইহুদীরা আমেরিকার ছত্রছায়ায় সংঘাত, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলা ঘটিয়ে পুরো বিশ্বেই যেন ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে চলেছে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। *(তথ্য সন্ত্রাস ১৩১পৃঃ)*

আমাদেরকে মুসলিম হিসাবে একটা কথা খুব সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখতে হবে যে, এই সব প্রচার-অভিযানের বিরাট একটা অংশের পশ্চাতে রয়েছে ইসলামী পুনর্জাগরণের আন্দোলনসমূহকে বানচাল করার আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা। পৃথিবীর সকল ইসলাম-বিদ্বেষী শক্তি নিজেদের যাবতীয় মতবিরোধ সত্ত্বেও ইসলামী পুনর্জাগরণের বিশ্বময় আন্দোলনসমূহকে বানচাল করে দেয়ার উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ ও একমত। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ওরা এক দিকে যেমন মুসলিম-বিশ্বের পুতুল সরকারগুলোকে সুকৌশলে ব্যবহার করছে, অপর দিকে বিষাক্ত অপপ্রচারণার মাধ্যমে মুসলমানদের মাঝে শ্রেণী বিরোধকে উৎসাহিত করছে এবং উস্কানি দিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে। *(ঐ ১১০পৃঃ)*

ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিশ্বের অন্যান্য জাতিকে উত্তেজিত করে লেলিয়ে দিয়ে মুসলিমদের আসল পরিচয় বিকৃত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। তাদেরকে সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত করে সকল জাতির নিকটে 'হিংস্র-জীব' রূপে তাদের পরিচয় প্রচার করা হচ্ছে!

বিশ্বজুড়ে রাজনীতির চাবিকাঠি হাতে নেওয়ার যে ইয়াহুদী পরিকল্পনা কাজ করছে তা তাদের 'প্রটোকল'-এ স্পষ্টভাবেই উল্লেখ রয়েছে। তাদের কর্মসূচিতে রয়েছে যে, 'আমরা ইহুদীরা দুনিয়ার সকল আন্তর্জাতিক প্রচার-মাধ্যমগুলো সংবাদ-সংস্থাসমূহের মাধ্যমে কন্ট্রোল করব; যাতে করে দুনিয়াবাসীকে আমরা যে চিত্র দেখাতে চাই সে চিত্রই দেখবে। অপরাধ-জগতের খবরগুলো আমরা এমন সূক্ষ্মভাবে জনগণের সামনে তুলে ধরব, যাতে পাঠকদের ব্রেন ওয়াশ হয়ে উল্টো অপরাধীদের প্রতিই তারা সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে।'

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ইহুদীরা তাদের জন্য ঘৃণ্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মিডিয়ার সাহায্যে প্রথমতঃ তারা নিজেদের প্রকৃত চরিত্র তথা সন্ত্রাসী তৎপরতা, দাঙ্গাবাজি, অসভ্যতার লোভ-লালসা, লাঞ্ছনা, হৃদয়ের কঠোরতা, হৃদয়হীনতা এবং মানবতা-বিরোধী জঘন্য চরিত্র ঢেকে রেখে ইহুদী জাতিকে মজলুম জাতি হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছে। ইহুদী মিডিয়া তাদের শ্বেতী চেহারাকে প্লাস্টিক সার্জারীর মাধ্যমে মেকআপ দ্বারা সুন্দর করে দুনিয়ার সামনে তুলে ধরেছে।

ইসলামের ফজর থেকেই ইয়াহুদী-চক্রান্ত মুসলিমদের বিরুদ্ধে সমভাবে কাজ করে আসছে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ হয়েছে সূদী ইত্যাদি কারবারে অর্থনৈতিক ময়দানে অভাবনীয় সফলতা অর্জন করার পর। অর্থ যেখানে, স্বার্থ ও সাফল্য সেখানে। অবশেষে তারা ইউরোপ ও আমেরিকার প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় এক ইয়াহুদী রাষ্ট্র কায়েম করতে সক্ষম হল। বিভিন্ন মুসলিম দেশ জয় করে নীলনদ থেকে ফোরাতের অববাহিকা পর্যন্ত প্রায় গোটা আরব-বিশ্বকে গ্রাস করে একটি বৃহত্তর 'ইসরাঈল রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তারা আজও কাজ করে যাচ্ছে এবং তাদের প্রসিদ্ধ আন্তর্জাতিক নেতা দাজ্জাল আসা পর্যন্ত করতেই থাকবে।

এরা জানে, তাদের এ কাজে বিশেষ সহায়ক হবে প্রচার-মাধ্যম। তাই পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংবাদ-সংস্থা গড়ে তুলেছে। তাদের সংস্থার পক্ষ থেকে সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে রয়েছে হাজার হাজার সাংবাদিক ও রিপোর্টার। যাদের প্রধান দায়িত্ব হল, বিশ্বের সকল স্থান হতে সংবাদ সংগ্রহ করে তা প্রচার-সংস্থাগুলোর কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং তাদের অনুমোদন নিয়ে তা প্রচার করা।

বিশ্বের অন্যতম প্রধান সংবাদ সংস্থা হল রয়টার। দুনিয়ার এমন কোন সংবাদপত্র, রেডিও সেন্টার ও টিভি সেন্টার নেই, যারা রয়টার থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে না। বর্তমান বিশ্বের প্রধান দু'টো প্রচার-মাধ্যম বিবিসি এবং ভয়েস অব আমেরিকা প্রায় ৯০% সংবাদ রয়টার থেকে সংগ্রহ করে। এ রয়টার ছাড়া দুনিয়ার সমস্ত সাংবাদিকতা যেন অচল। রয়টার হচ্ছে আকাশ সংবাদ-সংস্থার মহারাজাধিরাজ। আর তা হল ইয়াহুদীদের নিয়ন্ত্রণে।

এ ছাড়া এসোসিয়েটেড প্রেস (এপি), ইউনাইটেড প্রেস (ইউপি), এজেন্সী ফ্রান্স্ প্রেস (এ এফ পি) -এ সবই ইয়াহুদীদের।

বর্তমান বিশ্বে সব চাইতে প্রসিদ্ধ সংবাদ প্রচার-মাধ্যম হল বিবিসি। এখান হতে ৪৩টি ভাষায় সংবাদ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়ে থাকে এবং এর খবরকে অধিকাংশ লোকে 'অহী' বলে ধারণা ও বিশ্বাস করে। মনে করে, এই প্রচার কেন্দ্রের খবর হল নির্ভুল সত্য এবং নিরপেক্ষও। অথচ তারা যে দ্বীনদার মুসলিমদের প্রতি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি রাখে না, তা হয়তো দ্বীনদাররাই বোঝেন এবং পাশাপাশি আরবী, উর্দু, হিন্দী ও বাংলা অনুষ্ঠান যাঁরা শোনেন তারাও একথা নিশ্চয়ই অনুধাবন করে থাকবেন। আসলে এই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রটিও ইয়াহুদী পরিচালিত। এর পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে তারাই। ওদিকে স্টার টিভি যখন থেকে বিশ্বকে তা প্রোগ্রামের সেবাদাস বানিয়ে ফেলেছে, তখন থেকে ইহুদীদের প্রচার-প্রোপাগান্ডা আরো অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রিটেনের সংবাদপত্রের উপর ইহুদীদের প্রভাব প্রায় শত ভাগ। ধীরে-ধীরে তারা সবই দখল করে নিয়েছে। ব্রিটেনের নেতৃস্থানীয় ১৫টি দৈনিকের মালিকই তারা। *(তথ্য সন্ত্রাস ১২১-১২৬পৃঃ)*

ভাই যুবক! এই দীর্ঘ আলোচনায় বিরক্ত না হয়ে হয়তো বুঝতে পেরেছ যে, বিধর্মীদের অধর্ম প্রচারে যে জোর, মুসলিমদের ইসলাম প্রচারে সামান্যও সে জোর নেই। বিজাতির প্রচার-মাধ্যম ও শক্তির কাছে মুসলিম প্রচার-মাধ্যম ও শক্তি নেহাতই দুর্বল। তাদের সে আলো-ঝলমল সুশোভিত, সুরঞ্জিত বিভিন্ন প্রোগ্রাম ছেড়ে ধর্ম-নিয়ন্ত্রিত সাদা-মাঠা প্রোগ্রাম আর কেই বা দেখে অথবা কেই বা শোনে? ঢাকের শব্দের মাঝে মোহন বাঁশীর সূর বিলীন হওয়ারই কথা। তাছাড়া ইসলামী সে প্রচার-মাধ্যম আছেই বা ক'টা? থাকলেও সঠিক ও শুদ্ধ ইসলাম প্রচার হয়ই বা কোন্‌টায়?

পক্ষান্তরে মানুষের মন হল মন্দ-প্রবণ, প্রবৃত্তিপরায়ণ। ভালো-মন্দ উভয়ই পাশাপাশি সুসজ্জিত থাকলে বেশীর ভাগ মানুষের মন মন্দের দিকেই আকৃষ্ট হতে থাকে, ধাবিত হয় ভালো ছেড়ে ঐ নোংরার দিকে। কিন্তু পূর্ব হতেই যদি প্রতিষেধক ঈমানী ও ইসলামী টিকা বা ভ্যাকসিন নেওয়া থাকে, তাহলে ঐ সংক্রমণের ভয় আর থাকে না। সংক্রামক ব্যাধি বিষয়ে পূর্ব-সতর্কতা থাকলে তার সংস্পর্শ ও ছোঁয়াচ থেকে সুদূরে থাকলেও সে ব্যাধির কবল থেকে

নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়।

আজ বর্তমান বিশ্বে আমরা শত্রুর তরফ থেকে পাতা ফাঁদের মাঝে বাস করছি। শত্রুদল আমাদেরকে নখে কাটতে পারলে আর তরবারি চায় না। তারা চায় যে,মুসলিমরা তাদের ধর্মমত অবলম্বন করুক। নতুবা তা না করলেও অন্ততঃ পক্ষে মুসলিমরা যেন মুসলিম না থাকে বরং তারা ধর্মান্ধত্ব (?) থেকে বেড়িয়ে এসে ধর্মহীনতার আলোয় (?) আলোক-শোভিত হোক। অবশ্য বিজাতিরা একাজে বড় কৌশল ও অতি সন্তর্পণে সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করছে আমাদেরই জাত-ভাইকে। তাই ইসলামের প্রদীপ, রহমানের আলোকবর্তিকা হয়েও ইসলাম ও রহমানের উজ্জ্বল নামকে ম্লানকে করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। রহমান ও কাদেরের বন্ধু ও দাস হয়েও তাঁর শত্রুতা করতে মোটেই দ্বিধা করে না। আর এ ব্যাপারে প্রতিবেদন তৈরী করার জন্য ব্যবহার করা হয় তথাকথিক কতক মুসলিম চিন্তাবিদ ও কবি-লেখককে। যার ফলে লোহার কুঠারের কাঠ কাটার ক্ষমতা যদিও ছিলনা, তবুও তার পশ্চাতে লাগানো ঐ কাঠেরই জাত-ভাই 'বাঁট' সেজে বড় ঠাটবাটের সাথে চোখ বুজে আপন স্বজাতি নিধন করে চলেছে। আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও একক মা'বূদ আমাদেরকে সতর্ক করে বলেন,

"নিশ্চয় কাফেরদল তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" *(সূরা নিসা ১০১ আয়াত)*

"তুমি যখন তাদের দিকে তাকাও, তখন ওদের চেহারা তোমার নিকট প্রীতিকর মনে হয় এবং যখন ওরা কথা বলে, তখন আগ্রহভরে তুমি ওদের কথা শ্রবণ করে থাক। যদিও ওরা দেওয়ালে ঠেকানো কাষ্ঠসদৃশ। প্রত্যেক শোরগোলকে ওরা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। ওরাই শত্রু, অতএব ওদের সম্পর্কে সতর্ক হও। আল্লাহ ওদেরকে ধ্বংস করুন। ওরা বিভ্রান্ত হয়ে কোথায় চলেছে?" *(সূরা মুনাফিকূন ৪ আয়াত)*

"তোমাদেরকে কাবু করতে সক্ষম হলে ওরা তোমাদের শত্রু হবে এবং হাত ও জিভ দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে, আর চাইবে যে, কোনরূপে তোমরাও কাফের হয়ে যাও।" *(সূরা মুমতাহিনাহ ২ আয়াত)*

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না; তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না, তোমরা কষ্টে থাক -তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতা-প্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বের হয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে আছে, তা আরো জঘন্য। তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হল, যদি তোমরা অনুধাবন করতে সক্ষম হও। দেখ! তোমরাই তাদেরকে ভালোবাস, কিন্তু তারা তোমাদেরকে মোটেও ভালোবাসে না, আর তোমরা সমস্ত (ঐশী) কিতাবে বিশ্বাস রাখ। (অথচ তারা তা রাখে না।) তারা যখন তোমাদের সাথে এসে মিশে তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি।' পক্ষান্তরে তারা যখন নির্জনে যায় তখন তোমাদের প্রতি রোষবশতঃ আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। বল, 'তোমরা আক্রোশে মরতে থাক। আল্লাহ মনের কথা ভালোভাবেই জানেন।' তোমাদের যদি কোন মঙ্গল হয় তাহলে তাদের মনঃকষ্ট হয়, আর যদি তোমাদের কোন অমঙ্গল হয়, তাহলে তারা আনন্দবোধ করে। অবশ্য যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং পরহেযগার হও, তবে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা কিছু করে, সে সমস্তই আল্লাহর আয়ত্তে রয়েছে।" *(সূরা আ-লি ইমরান ১১৮- ১২০ আয়াত)*

"ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানগণ কখনই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না তুমি তাদের মতবাদ মেনে নিয়েছ। তুমি বল, 'আল্লাহর প্রদর্শিত পথই প্রকৃত সুপথ। আর তোমার নিকট যে জ্ঞান উপনীত হয়েছে তার পরও যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা পেতে তোমার কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই।" *(সূরা বাক্বারাহ ১২০)*

"ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের অনেকেই তাদের নিকট সত্য সুপ্রকাশিত হওয়ার পরেও তাদের মনের প্রতিহিংসাবশতঃ চায় যে, মুমিন হওয়ার পর তোমাদেরকে কোন রকম কাফের বানিয়ে দেয়। *(ঐ ১০৯ আয়াত)*

"ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের একদল তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার আশা পোষণ করে। অথচ প্রকৃত-প্রস্তাবে তারা কেবল নিজেদেরকেই ভ্রষ্ট করে, কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না।" *(সূরা আ-লি ইমরান ৬৯)*

"তাদের মনোবাসনা এই যে, তারা যেমন কাফের আছে, তেমনি তোমরাও কাফের হয়ে যাও; যাতে তোমরা এবং তারা সকলে একাকার হয়ে যাও।" *(সূরা নিসা ৮৯ আয়াত)*

"বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে। যাতে করে তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে -যদি তা সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজ দ্বীন থেকে ফিরে যাবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হবে দোযখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে।" *(সূরা বাক্বারাহ ২১৭ আয়াত)*

অতএব হে মুসলিম যুবকদল! "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের কোন গোষ্ঠীর কথা মেনে নাও, তাহলে ঈমান আনার পর তারা তোমাদিগকে কাফেরে পরিণত করে ফেলবে।" *(সূরা আ-লি ইমরান ১০০ আয়াত)*

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি কাফেরদের কথা শোন, তাহলে ওরা তোমাদেরকে পেছনে ফিরিয়ে দেবে এবং তাতে তোমরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়বে।" *(ঐ ১৪৯ আয়াত)*

হে ভাই যুবক! জেনে রেখো, "ওরা দোযখের দিকে আহ্বান করে। আর আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছায় ক্ষমা ও বেহেশ্তের দিকে আহ্বান করেন এবং মানবমন্ডলীর জন্য স্বীয় নিদর্শন বর্ণনা করেন, যেন তারা তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে। *(সূরা বাক্বারাহ ২২১ আয়াত)*

আর মনে রেখো যে, "যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের অভিভাবক, তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কাফের তাদের অভিভাবক হল তাগূত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই দোযখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।" *(ঐ ২৫৭ আয়াত)*

হ্যাঁ, আর বিজাতীয় প্রচার-মাধ্যমগুলোতে যা দেখ বা শোন অথবা পড়, তাই বিশ্বাস করে তুমি নিজের বা স্বজাতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠো না। কারণ, বুঝতেই তো পারছ, তারা কোনদিন ইসলামের স্বার্থে কিছুও গাইবে না। মহান আল্লাহর সতর্কবাণী সর্বদা মনের মণিকোঠায় তুলে রেখো, তিনি বলে, "হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসেক (পাপাচারী) ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে। যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।" *(সূরা হুজুরাত ৬ আয়াত)*

হ্যাঁ, ফাসেকের সংবাদ হলে তা পরীক্ষা করে না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস করো না। সুতরাং বলাই বাহুল্য যে, কোন কাফের বা ইসলাম-বিদ্বেষী কোন সংবাদ পরিবেশন করলে তা নিশ্চয়ই অবতীর্ণ 'অহী'র মত বিশ্বাস করতে পার না।

হে মুসলিম যুবকবৃন্দ! "শয়তান তোমাদের শত্রু, অতএব তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহ্বান করে, যাতে তারা জাহান্নামী হয়।" *(সূরা ফাত্বির ৬ আয়াত)*

"আর আল্লাহ তোমাদিগকে শান্তিনিকেতন (বেহেশ্তের) দিকে আহ্বান করেন, যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।" *(সূরা ইউনুস ২৫ আয়াত)*

সুতরাং দুই দিকে এই দুই শ্রেণীর আহ্বান। এদিকের আহ্বান হল, মানুষের মত সুশ্রী ও সভ্য জীবন গড়ার প্রতি। পক্ষান্তরে ওদিকের আহ্বান হল, পশুর মত স্বেচ্ছারিতার জীবন গড়ার প্রতি। এবারে জীবনের মূল্যায়ন ও নিজের কদর নিজেই করা জ্ঞানীর জন্য অবশ্য-কর্তব্য।

হে যুবক বন্ধু! ঈমানের প্রদীপ্ত জ্যোতি তোমার হৃদয়কে জ্যোতির্ময় করে রাখলে বিজাতীয় মিডিয়া তা নির্বাপিত করার চেষ্টা করছে বুঝতে পেরে তোমার মন ব্যথায় টনটন করে উঠবে। সে সময় প্রয়োজন হবে ধৈর্যের। অতএব প্রচার-যুদ্ধের ঐ বাক্-তরবারির আঘাতে ধরাশায়ী হয়ে অধৈর্যের সাথে ঈমানত্যাগী হয়ে যেও না। "অবশ্যই ধন-সম্পদে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে এবং অবশ্যই শুনবে পূর্ববর্তী আহলে-কিতাব (ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান) ও মুশরিক (পৌত্তলিক)দের নিকট থেকে বহু অশোভন উক্তি। কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং পরহেযগারী অবলম্বন কর, তবে তা হবে একান্ত সৎসাহসের ব্যাপার।" *(সূরা আ-লি ইমরান ১৮৬)*

"আর তাদের কথায় দুঃখ নিও না। আসলে সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর। তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা।" *(সূরা ইউনুস ৬৫ আয়াত)*

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে সারা অমুসলিম সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ। দুনিয়ার সকল জাতি যেন কেবল মুসলিম জাতিকেই কোণঠাসা করে রাখতে চায়। সাম্প্রদায়িক, সন্ত্রাসী, ধর্মান্ধ গোঁড়া, মৌলবাদী, মোল্লাতন্ত্র প্রভৃতি বলে বদনাম দিয়ে, ভৌগলিকভাবে তাদের দেশ জবরদখল করে, মানসিকভাবে আগ্রাসন সৃষ্টি করে, তাদের মৌলিক অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে; বরং তাদের যথাসর্বস্ব লুটে নিয়ে তাদেরকে সর্বহারা করতে চায় সকলেই। এক ভবিষ্যৎ-বাণীতে এ কথার কারণ উল্লেখ করে মহানবী ﷺ বলেন যে, "অদূর ভবিষ্যতে চতুর্দিকের সকল জাতি পরস্পরকে আহ্বান করে তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে যেমন ভোজনকারীরা ভোজনপাত্রের উপর একত্রিত হয়ে এক সাথে মিলে ভোজন করে থাকে।" কোন এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তখন কি আমরা সংখ্যায় কম থাকব, হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "না, কিন্তু তোমরা হবে স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার মত। তোমাদের শত্রুদের হৃদয় থেকে তোমাদের প্রতি ত্রাস ও ভীতি তুলে নেওয়া হবে এবং তোমাদের হৃদয়ে দুর্বলতা প্রক্ষিপ্ত হবে। আর সে দুর্বলতা হল, দুনিয়াকে ভালোবাসা ও মরণকে অপছন্দ করা।" *(আহমাদ, আবূদাউদ, সহীহুল জামে' ৮১৮৩ নং)*

পক্ষান্তরে এ কথায় কোন সন্দেহ নেই যে, এইভাবে মনঃকষ্ট পাওয়া এক বড় মসীবত। তবে সে মসীবত কেবল সেই মুসলিমের জন্য, যে তার নবী ﷺ কে ভালোবাসে। আর যে তার নবী ﷺ কে ভালোবাসে না, তার তো কোন ইসলাম-বিদ্বেষী প্রচার-প্রোপাগান্ডায় কোন প্রকার

মাথাব্যথা হওয়ার কথা নয়। মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে সে ব্যক্তির নিকট মসীবত গন্তব্যস্থলের দিকে ধাবমান স্রোতের চেয়েও বেশী দ্রুতবেগে উপস্থিত হয়ে থাকে।” *(সহীহুল জামে' ১৫৯২ নং)*

প্রত্যেক জাতির মেরুদন্ড হল তার যুব-সমাজ। যুবকের মাঝে আছে সুউচ্চ আকাঙ্খা, দৃঢ় মনোবল এবং দৈহিক শক্তিও। যুবকের মাঝে আছে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধতা, আছে কোন কিছু মানা বা না মানার উচ্চ প্রবণতা। নৈতিকতার শত্রুরা তা ভালোভাবে জেনেই যুবকদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য ঐ সকল প্রচার-মাধ্যমগুলোতে এমন টোপ ব্যবহার করছে, যা যুবকদল না গিলে পারে না। অভিনেতা-অভিনেত্রী, শিল্পী, খেলোয়াড় প্রভৃতির প্রেম সৃষ্টি করে এবং পরম নৈতিকতাকে 'মৌলবাদ', 'রক্ষণশীলতা' প্রভৃতি বদনাম দিয়ে যুবকদের মন লুটেছে ও তাদের ঈমান কেড়েছে ওরা। ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমেই তারা সুন্দরকে ঘৃণ্য এবং ঘৃণ্যকে সুন্দর নাম দিয়ে সুশোভিত করে ঘৃণ্যদলকেই সাবাসী দিয়ে পৃথিবীর নেতৃত্ব তুলে দিয়েছে ও দিতে চলেছে তাদের হাতে!

সুতরাং মুসলিম যুবকের উচিত, চারার গন্ধে ছুটে গিয়ে চটকদার টোপ না গিলা। কারণ, ঐ টোপের আড়ালে আছে বড় ধারালো বঁড়শী; যা একবার মুখে গেঁথে গেলে টেনে ছাড়ানো হবে বড় মুশকিল কাজ।

মুসলিমের যুবকের উচিত, তাঁদের চরিত্র ও জীবন-কাহিনীর খবর হৃদয়-মন দিয়ে শোনা ও পড়া, যাঁদের খবরে রয়েছে তার পারলৌকিক মঙ্গল। আজ পৃথিবীতে যে যাকে ভালোবাসবে, কাল কিয়ামতে তার তারই সাথে হাশর হবে। সুতরাং নবী ও সাহাবাকে ভালোবাসলে তাঁদের সাথে, নচেৎ কোন শিল্পীকে ভালোবাসলে তারই সাথে কিয়ামতে অবস্থান করবে।

কোন ফাসেক ও কাফেরকে নিয়ে মুসলিমের গর্ব করা উচিত নয়। উচিত নয় তাদের অনুকরণ, অনুসরণ ও সাদৃশ্য অবলম্বন করা। কারণ, “যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে সে তাদেরই একজন।” *(আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ৬১৪৯ নং)*

ভাই ইসলাম-দরদী যুবক! তুফান দেখে ভয়ের কারণ নেই। কারণ তুমিও যে মহাবীর। তোমার আছে ইতিহাস ও অতীত। তোমার আছে ভবিষ্যত ও বিজয়। সুতরাং যে তুফানে তুমি ভেসে যাওয়ার ভয় করছ সে তুফানের চেয়ে আরো বড় তুফান সৃষ্টি কর। তবে মন্দের মোকাবেলায় মন্দ দিয়ে এবং পেশাব দিয়ে পায়খানা ধোয়ার মাধ্যমে কারো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার চেষ্টা করো না। নচেৎ বাত ভালো করতে গিয়ে কুষ্ঠরোগ সৃষ্টি করে কি লাভ? বরং তোমার মাঝে যে উৎকৃষ্ট শক্তি নিহিত আছে তা ব্যয় কর। শক্তিপ্রার্থীকে শক্তি যোগাও, দাও উৎসাহ ও মনোবল। দুর্নিবার ঐ মহাপ্লাবনের সম্মুখে তুমিও নির্বিচল পর্বতসম প্রাচীর খাড়া করে দাও। প্রতিহত হোক প্লাবনের সে গতি। “তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য শক্তি প্রস্তুত কর, প্রস্তুত রাখ অশ্বদল। তার দ্বারা আল্লাহর শত্রুকুলকে ভীতি-প্রদর্শন ও সন্ত্রস্ত কর, তাছাড়া অন্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন।” *(সূরা আনফাল ৬০)*

আর 'ঘরের ঢেঁকি কুমীর' সাংবাদিক ও উপস্থাপকদের উদ্দেশ্যে মহানবী ﷺ এর একটি মহাবাণীর নজরানা পেশ করি। তিনি জিবরীল মারফৎ বর্ণনা করে বলেন, “মধ্যজগতে এক শ্রেণীর লোক নিজ নিজ কশা চিরে নিজেদেরকে শাস্তি দিচ্ছে। আর ঐ শ্রেণীর অপরাধী হল

তারা, যারা ছিল এমন মিথ্যাবাদী, যাদের মিথ্যা দিকচক্রবালে পৌঁছে যেত। তাদের এমন শাস্তি কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে।” *(বুখারী ১৩৮৬নং)* পরন্তু কিয়ামত হওয়ার পর তাদের যে কি শাস্তি হবে তা আল্লাহই জানেন।

ভিডিও, টিভি, ফিল্ম্ প্রভৃতির ডাইরেক্টর, প্রযোজক, তারকা, হলের মালিক, প্রচারক, নোংরা পত্র-পত্রিকার লেখক, প্রকাশক, এজেন্ট, বিক্রেতা ও পাঠক প্রভৃতি যারা মানবতা ও নারী স্বাধীনতার নামে তাদের প্রচার-মাধ্যমগুলোকে উচ্ছৃঙ্খলতা ও যৌনচারিতা প্রচার কাজে ব্যবহার করছে এবং এই চাচ্ছে যে, চরিত্রবাণ মুসলিম পরিবার ও পরিবেশেও যৌনতা, অশ্লীলতা ও নোংরামী প্রবেশ করুক, তাদের উদ্দেশ্যে মহান প্রতিপালকের একটি সতর্কবাণী ঘোষিত রয়েছে, যা পাঠ করে অন্ততঃপক্ষে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী মুসলিমকে সাবধান হওয়া উচিত। তিনি বলেন, “যারা কামনা ও পছন্দ করে যে, ঈমানদার (মুসলিমদের) মাঝে অশ্লীলতা (ও ব্যভিচার) প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্য রয়েছে ইহকাল ও পরকালে মর্মন্তুদ শাস্তি।” *(সূরা নূর ১৯ আয়াত)*

আর মানবমন্ডলী তথা মুসলিম জাতির উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, “হে মানুষ! তোমরা পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তুসামগ্রী ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না; সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তো তোমাদেরকে এ নির্দেশই দেবে যে, তোমরা অন্যায় ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়ে পড় এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন সব কথা বল, যা তোমরা জান না।” *(সূরা বাক্বারাহ ১৬৮- ১৬৯ আয়াত)*

এমন সাংবাদিকদল রয়েছে, যারা কোন নৈতিকতা বা আদর্শভিত্তিক খবর প্রচার করে না। অথচ যৌনতা, চরিত্রহীনতা প্রভৃতির খবর শোভনীয় ও লোভনীয় ভঙ্গীমাতে প্রচার করে থাকে; যারা মুসলিম হয়েও প্রভাবশালী অমুসলিম কোন সম্প্রদায়ের নিকট সম্মান বা অর্থ লাভের আশায় ইসলাম ধ্বংসের পশ্চাতে উঠে-পড়ে গর্বের সাথে কাজ করে যাচ্ছে, যারা চায় মুসলিমরাও কাফেরদের মত কুফরীতে একাকার হয়ে যাক, যারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিষাক্ত কলম ও লাগামহীন জিহ্বা ব্যবহার করে, তারা যে মুসলিমদের কাছে মানবরূপী শয়তান তাতে কোন সন্দেহ নেই। এমন শয়তানদল থেকেও পানাহ চাওয়া মুসলিমের কর্তব্য।

মহান আল্লাহ বলেন, “বল আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের অধিপতির, মানুষের উপাস্যের কাছে, তার অনিষ্ট হতে, যে কুমন্ত্রণা দিয়ে আত্মগোপন করে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, (সে কুমন্ত্রণাদাতা) জিনের মধ্য থেকে (হোক) অথবা মানুষের মধ্য থেকে।” *(সূরা নাস)*

যুবক ও শিক্ষা-ব্যবস্থা

ঈমান-চোর শিক্ষা-ব্যবস্থাও যুবকের নৈতিকতার পথে এক শ্রেণীর কাঁটা-স্বরূপ। শিক্ষাঙ্গনে যুবক-যুবতীর অবাধ মিলামিশা, প্রেম-ভালোবাসা ও যৌন-স্বাধীনতা যুবক ছাত্রের চরিত্র হনন করে। ইসলাম-বিরোধী সিলেবাস ও পাঠ্য-পুস্তক যুবকের ঈমান ধ্বংস করে। মগজ-ধোলাই হয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাঠ-ব্যাখ্যায়। মনের কোণে নাস্তিক্যবাদ দানা বেঁধে ওঠে। শিরায়-উপশিরায় ইসলাম-বিতৃষ্ণা ও মুসলিম বিদ্বেষ প্রবাহমান হয়ে যায়।

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। তবে ঐ জাতীয় শিক্ষার ফলে শিক্ষিত হওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু চরিত্রবাণ মুসলিম হওয়া যায় না। দুনিয়ার চাকা চালানো যায় বটে, কিন্তু আখেরাতের চাকা অচল হয়ে যায়।

হে যুবক বন্ধু আমার! শিক্ষা গ্রহণ করা ফরয; কিন্তু যে শিক্ষায় তোমার দ্বীন ও ঈমান লুটা যায় তা শিক্ষা করা হারাম। যে শিক্ষা না শিখলে তোমার পরকাল বরবাদ হয় সে শিক্ষা শিখাই তোমার জন্য ফরয, বাকী তো তোমার গরজ। জ্ঞান-বিজ্ঞানে তুমি সমৃদ্ধ হও, প্রযুক্তি ও প্রকৌশলে তুমি চির উন্নত হও, কিন্তু তা বলে তার পশ্চাতে 'সময় নেই' এর ওজুহাতে ফরয শিক্ষা ত্যাগ করে বসে দুনিয়া আবাদ ও আখেরাত বরবাদ করে দিও না।

শিক্ষা লাভ করে যাও, চাকুরীর আশা থাক চাই না থাক। শিক্ষার মাঝে লুকিয়ে আছে তোমার সভ্যতা, তোমার উন্নতি। শিক্ষার মাধ্যমেই তুমি লাভ করবে উচ্চ আসন, পদমর্যাদা এবং অম্লান গৌরব। তবে হ্যাঁ, স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা বহাল রেখে চল এবং ঈমান হারিয়ে দিও না এই কামনাই করি।

দেশমাতার প্রশংসা কর, দেশের ভক্তি থাকুক তোমার হৃদয়ে। তবে জাতীয়তাবাদের অন্ধ-পক্ষপাতিত্ব যেন তোমার মাঝে না থাকে। পক্ষান্তরে মাথা নত কর একমাত্র আল্লাহর সম্মুখে, অন্য কিছুর সম্মুখে নয়। বন্দনা ও বন্দেগী কর কেবল তাঁরই, অন্য কিছুর নয়। আর মনে-প্রাণে এ বিশ্বাস রেখো যে, ভাগ্যবিধাতা একমাত্র মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা, তাঁর কোন সৃষ্টি নয়।

যুবক ও অনুকরণ-প্রবণতা

যে জাতি শিক্ষা দিতে এসেছিল পৃথিবীর সকল জাতিকে, যে জাতি ছিল পূর্ণ মানবতার মূর্ত-প্রতীক, যে জাতি ছিল বিশ্ব-জনমন্ডলীর জন্য একক আদর্শ, সে জাতির অবস্থা এই যে, নিজের স্বাতন্ত্র্য, স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য হারিয়ে অপর জাতির মাঝে একাকার হয়ে বিলীন হয়ে পড়েছে। অন্য জাতির পার্থিব সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার ভালো-মন্দ সকল বিষয়ে চক্ষু বন্ধ করে অনুকরণ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। নিজের আচার-আচরণ, নৈতিকতা ও চরিত্র তথা লেবাস-পোশাকও নিজের কাছে অপছন্দনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। নিজের চোখে নিজেকে দেখেছে দীন-হীন-ক্ষীণরূপে। তাই তো এ জাতির এমন অবস্থা।

এ জাতির কাছে দুনিয়া না থাকলেও দ্বীন আছে আসল রূপে। অর্থ না থাকলেও আছে নৈতিকতা, যা মুসলিমের অমূল্য ধন এবং মানবের আসল মানবতা। যাদের দ্বীন নেই, নৈতিকতা নেই তাদের পার্থিব সৌন্দর্য দেখে চমৎকৃত হয়ে, তাদের প্রতি মুগ্ধ হয়ে ঝুঁকে পড়া অবশ্যই উচিত নয় কোন মুসলিমের। মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা সীমা লংঘনকারীদের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ো না, অন্যথায় অগ্নি তোমাদেরকে স্পর্শ করবে। আর এই অবস্থায় আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু থাকবে না এবং তোমরা সাহায্যও পাবে না।" *(সূরা হূদ ১১৩)*

সুতরাং বিজাতীয় চাল-চলন, আচার-আচরণ ও বেশভূষায় আকৃষ্ট হয়ে বিজাতির সভ্যতার প্রতি ঝুঁকে পড়ার মানেই হল নিজের স্বরূপতা ও স্বকীয়তা বিকিয়ে সত্যকে না চিনে অথবা অপছন্দ করে অসত্যকে লুফে নেওয়া, আর তা হল দোযখবাসীদের কাজ। তাছাড়া সমাজ-বিজ্ঞানী প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি যে জাতির আনুরূপ্য অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই দলভুক্ত।" *(আহমাদ ২/৫০, আবূ দাঊদ ৪০৩১, সহীহুল জামে' ৬০২৫ নং)*

ভালো-মন্দ বাচ-বিচার না করে অন্ধভাবে অপরের ভঙ্গিমা নকল করে চলা, কোন কোন অথবা সকল কাজে অপরের হুবহু অনুকরণ করা মানুষের জন্য নিন্দনীয়। কারণ, এমন স্বভাব হল বানরের। এই জাতিই কোন প্রকার বিচার না করেই চোখ বুজে অপরের অনুকরণ করে তৃপ্তি পেয়ে থাকে। কিন্তু মানুষ, বিশেষ করে কোন মুসলিম পারে না বিজাতির কোন অসভ্য ভঙ্গিমা নকল করে চলতে। কারণ, মুসলিমের আছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। আর তা বিনাশ করে অপরের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করার মানেই হল, নিজেকে ধ্বংস ও বিলীন করা। কবি বলেন,

'পরের মুখে শেখা বুলি পাখীর মত কেন বলিস,
পরের ভঙ্গি নকল করে নটের মত কেন চলিস?
আপনারে যে ভেঙ্গে-চুরে গড়তে চাহে পরের ছাঁচে,
অলীক, ফাঁকি, মেকী সেজন, নামটা তার ক'দিন বাঁচে?'

তবে কাফেরদের সর্ববিষয়ে সব রকম কাজেই যে অনুকরণ নিন্দনীয়, তা নয়। নিন্দনীয় হল সেই সব কাজের অনুকরণ করা, যা তাদের কল্পনা-প্রসূত, অমূলক ধারণা বা বিশ্বাস-জনিত। যা তাদের অশ্লীলতাময় আচরণ ও অভ্যাস এবং যা নৈতিকতা-বর্জিত। যা তাদের

মনগড়া উপাসনামূলক ধর্মীয় আচার। যা তাদের ধর্মীয় বা জাতীয় প্রতীক এবং অন্য জাতি থেকে পার্থক্য নির্বাচনকারী পৃথক বৈশিষ্ট্য। আর যে বিষয়ে আমাদের শরীয়তে রয়েছে কঠোর নিষেধাজ্ঞা। কারণ, তা করলে অসত্যকে সমর্থন করা হয়, যাতে হয় সত্যের অপলাপ।

এ ছাড়া নিছক পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান; যার সম্পর্ক মুসলিমের আকীদা, দ্বীন ও নৈতিকতার সাথে নেই, বরং পার্থিব উপকার আছে, তাতে যে কোন ব্যক্তির অনুকরণ অবৈধ নয়। কারণ, এ বৈশিষ্ট্য কোন জাতীয় বা ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য নয়। বরং মুসলিমই তার অধিক হকদার। অতএব মুসলিমকেই এ বিষয়ে অগ্রণী হওয়া উচিত। তবে তা তার প্রধান লক্ষ্য নয়, যেমন আমরা পূর্বেই জেনেছি।

বিজাতির অনুকরণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করলে আমরা জানতে পারি যে, যেহেতু তাদের প্রায় সকল কর্ম হল ভিত্তিহীন, ভ্রষ্টতাপূর্ণ ও পন্ড, সেহেতু অনুকরণে ভ্রষ্টতায় পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ বিজাতির অনুকরণ মানেই হল, স্বজাতির আচরণকে অপছন্দ বা ঘৃণা করা অথবা মন্দ জানা। যাতে রয়েছে পথের দিশারী মহানবী ﷺ এর বিরুদ্ধাচরণ। আর মহান আল্লাহ বলেন, "সুপথ প্রকাশিত হওয়ার পর কেউ যদি রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায়, আমি সেই দিকেই তাকে ফিরিয়ে দেব এবং দোযখে তাকে নিক্ষেপ করব, আর তা কতই নিকৃষ্ট আবাস!" *(সূরা নিসা ১১৫ আয়াত)*

তৃতীয়তঃ অনুকরণে রয়েছে অনুকৃত জাতির প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ ও ভালোবাসা; যা ঈমানের পরিপন্থী।

চতুর্থতঃ অনুকরণ হল এক ধরনের মানসিক পরাজয় স্বীকারের নামান্তর। কারণ, অনুকরণকারী তখনই অপরের অনুকরণ করে, যখন সে অপরকে বড় ও সবল এবং নিজেকে ছোট ও দুর্বল মনে করে। আর এতে রয়েছে মুমিনের জন্য লাঞ্ছনা ও অপমান।

মুসলিম জাতি হল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি; যে জাতির অনুকরণ করে মানুষ ধন্য হয়ে থাকে। অতএব মুসলিম কেন বিজাতির অনুকরণ করবে? যে জাতির আদর্শ হলেন নবীকুল-শিরোমণি সৃষ্টির সেরা মানুষ হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ; সে জাতির অনুসরণীয় আদর্শ পৃথিবীতে আর কে আছে?

কিন্তু তবুও সে জাতি বিজাতির গুণে মুগ্ধ, বিজাতীয় সভ্যতা নিয়ে গর্বিত, বিজাতীয় আচরণে অভ্যস্ত, এর কারণ কি?

এর কারণ প্রথমতঃ এই যে, এ জাতি নিজের সভ্যতা বিষয়ে অজ্ঞ, নিজের কৃষ্টি ও কালচার বিষয়ে উদাসীন, দ্বীন ও তার শিক্ষা থেকে বহু দূরে। তাই তো অপরের সৌন্দর্য তার চোখে ধরেছে।

দ্বিতীয়তঃ জাতির দিকে তাকালে যেন গোটা জাতিকে কাঠের গড়া একটা পুতুল মনে হয়। এ জাতি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অন্যান্য জাতির তুলনায় বহু দুর্বল, মানসিক দিক দিয়ে আগ্রাসন ও পরাজয়ের শিকার, আর অস্ত্র-শস্ত্র ও যুদ্ধ-সামগ্রীর ব্যাপারেও বড় কমজোর। তাই বিজাতির প্রভুত্ব তার মনে-প্রাণে অনায়াসে বিস্তার লাভ করেছে এবং বিজাতীয় আচরণ

প্রাধান্য পেয়েছে তার জীবনের পদে পদে।

পাশ্চাত্য-সভ্যতার ছোঁয়া লাগা মানুষ হীনম্মন্যতার শিকার হয়ে পশ্চিমা-বিশ্বের অনুকরণ করে। কাফেরদের বিভিন্নমুখী বিভব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং পার্থিব উন্নয়ন দেখে মুসলিম নিজেদেরকে হেয় ও তুচ্ছজ্ঞান করে বসেছে। ভেবেছে, দুনিয়ায় ওরা যখন এত উন্নত, তখন ওদের সভ্যতাই হল প্রকৃত সভ্যতা। সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণে এটাই ধরে নিয়েছে যে, ওরা যেটা করে, সেটাই উত্তম ও অনুসরণীয়। ওদের মত করতে পারলে তারাও ঐরূপ উন্নতির পরশমণি হাতে পেয়ে যাবে। মনে করেছে যে, ওদের ঐ ছন্নছাড়া, লাগামছাড়া, বাঁধনহারা যৌন-স্বাধীনতাপূর্ণ জীবনই হল ওদের উন্নতির মূল কারণ এবং প্রগতির মূল রহস্য।

তৃতীয়তঃ ইসলামকে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে দেওয়ার জন্য বিশ্বজুড়ে পরিকল্পিত প্রচেষ্টার যে কুফল, তা বহু সংখ্যক মুসলিমদের মাঝে প্রকাশ পেয়েছে। অর্থ ও নারী পেয়ে মানুষ মনুষ্যত্ব ভুলে যায় এবং পশুত্ব বরণ করে পশুবৃত্তি চালিয়ে যেতে এতটুকুও দ্বিধা করে না। মুর্তাদ্দ, মুনাফিক, ও ফাসিক মুসলিমদল সে জালে ফেঁসে কাফেরদেরকে সর্বতোভাবে সহায়তা করছে। অর্থ ও নারী তথা যৌন-স্বাধীনতার স্বর্গে বসে অপরকেও ঐ স্বর্গগামী রথে চড়ে বসতে আহ্বান জানাচ্ছে। মানবতার নামে পশুত্বের পূজারীরা পশুবৃত্তিকে সুশোভিত করে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতার বন্যা আনয়ন করছে। আর তৃপ্তি সহকারে ধৃষ্টতা ও গর্বের সাথে ঐ অধোগতিকে 'প্রগতি' বলে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

কাফেররা এ কথা খুব ভালোভাবে জানে যে, ইসলাম তাদের তথাকথিত ঐ প্রগতির পথে বাধ সাধবে। তাই মুসলিমের জীবন থেকে ইসলামের আদর্শকে অথবা ইসলামের পরশ থেকে মুসলিম ও সারা বিশ্বকে পাকেপ্রকারে দূরে সরাতে না পারলে কোন শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। তাই তো ঐ প্রচেষ্টায় ওদের এক দক্ষ নেতার দূরভিসন্ধিমূলক বক্তব্য হল, 'শারাবের পেয়ালা ও নারী মহামেডানদের মাঝে সেই কাজ করবে যা এক হাজার তোপেও করতে পারে না। অতএব ওদেরকে অর্থলোলুপতা ও যৌনচারিতার সাগরে ডুবিয়ে দাও।'

চরিত্রবিনাশী ইয়াহুদী প্রটোকল সংকল্পবদ্ধ যে, 'আমরা ওদেরকে নানা প্রকার মন-মাতানো বিষয়-বস্তু ও খেলাধুলা দ্বারা বিভোর করে রাখব। ----আমাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য হল, নৈতিকতা ধ্বংস করা। যৌন-সম্পর্ক সূর্যের আলোতে প্রকাশ পাবে। যাতে যুবকের মনে পবিত্রতা ও সচ্চরিত্রতা বলে কিছু অবশিষ্ট না থাকে এবং তার যেন প্রধান চিন্তা ও লক্ষ্য হয়, কেবল যৌনক্ষুধা নিবারণ করা। এইভাবে আমরা নৈতিকতা বিনাশ সাধনে সমর্থ হব।' *(আল-ইফ্ফাহ ৬২পৃ দ্রঃ)*

ওদের প্রধান লক্ষ্য হল, যাতে মুসলিম ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান অথবা অন্য কোন ধর্মে ধর্মান্তরিত হোক। আর তা না হলেও অন্ততঃপক্ষে সে যেন ইসলাম থেকে বহু দূরে সরে যায়। দ্বীনী তা'লীমের ব্যাপারে তার যেন বিতৃষ্ণা জন্মে। যথাসম্ভব সে যেন পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়। মগজ ধোলাই করার উদ্দেশ্যে সে যেন পশ্চিমে পড়াশোনা বা চাকুরীর সুযোগ পায়।

ইসলামী সংস্কৃতি ধ্বংস করার সবচাইতে বড় উপায় হল যৌনতা এবং প্রধান মাধ্যম হল নারী-দেহ। অতএব প্রচার-মাধ্যমগুলোর সিংহভাগ বিষয়বস্তু হোক নারী, প্রেম ও যৌনতা। নারীকে পুরুষের পাশাপাশি বসিয়ে দেওয়া হোক। বেশ্যালয়গুলো সরকারী অনুমোদন পাক।

বেশ্যাদেরকে 'বেশ্যা' না বলে 'যৌনকর্মী' (?) বলা হোক। বিভিন্ন নারী-আন্দোলনমূলক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হোক, সে সংগঠনগুলো নারী-স্বাধীনতার দাবী নিয়ে যৌন-স্বাধীনতার কাজ চালিয়ে যাক। চাকুরী দেওয়ার লোভ দেখিয়ে নারীকে বাইরে বের করে আনা হোক। সভ্য লেবাসের অন্তরাল থেকে বের করে এনে তাদেরকে 'আলোকপ্রাপ্তা' করা হোক। যাতে যুবকদল লালায়িত হয়ে নৈতিকতার বাঁধ ও বেড়া ভেঙ্গে যৌনতার তুফান নিয়ে আসে।

বিভিন্ন 'নাইট ক্লাব' তৈরী হোক। অবাধ মিলামিশার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন বিলাসকেন্দ্র ও মিলনক্ষেত্র নির্মিত হোক। সুন্দরী-প্রতিযোগিতা এবং ফ্যাশন-ডিজাইনের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হোক। যুবক-যুবতীর সকল পার্থক্য দূরীভূত হোক। দূর হোক গতানুগতিক সামাজিক বিবাহ-প্রথা। নারীকে সুযোগ দেওয়া হোক তার ইচ্ছামত মডেল ও সংখ্যার জীবন-সঙ্গী খুঁজে ও বেছে নিতে। গর্ভপাত আইনতঃ বৈধ করা হোক এবং তার সকল উপায়-উপকরণ সহজ ও সুলভ করা হোক; যাতে ব্যভিচার করতে যেন কেউ মান যাওয়া বা অযাচিত সন্তান নেওয়ার ভয় না করে।

ভাই যুবক! আর কত উল্লেখ করব? তুমি জ্ঞানী ছেলে, পৃথিবীর দিকে একবার জ্ঞানচক্ষু খুলে তাকিয়ে দেখ, তোমার পশ্চাতে কত শত্রু লেগে আছে, তা অনায়াসে বুঝতে পারবে। কিন্তু তখনও কি তুমি সচেতন হবে?

আজ যেন মহানবীর মহাবাণী বাস্তব রূপ নিতে চলেছে। তিনি বলেন, "অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির পথ অনুসরণ করবে বিঘত-বিঘত এবং হাত-হাত (সম) পরিমাণ। এমনকি তারা যদি গো-সাপের (সান্ডা)র গর্তে প্রবেশ করে, তাহলে তোমরাও তাদের পিছনে পিছনে যাবে। (এবং তাদের কেউ যদি রাস্তার উপর প্রকাশ্যে সঙ্গম করে, তাহলে তোমরাও তা করবে!)" সাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি ইয়াহুদ ও নাসারার অনুকরণ করার কথা বলছেন?' তিনি বললেন, "তবে আবার কার?" *(বুখারী, মুসলিম ২৬৬৯, হাকেম, আহমাদ, সহীহুল জামে' ৫০৬৭ নং)*

সাহাবী হুযাইফা বিন ইয়ামান বলেন, 'তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির পথ অবলম্বন করবে জুতার মাপের মত (সম্পূর্ণভাবে)। তোমরা তাদের পথে চলতে ভুল করবে না এবং তারাও তোমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে চলতে ভুল করবে না। এমন কি তাদের কেউ যদি শুকনো অথবা নরম পায়খানা খায়, তাহলে তোমরাও (তাদের অনুকরণে) তা খেতে লাগবে!' *(আল-বিদাউ অন্নাহয়্যু আনহা, ইবনে অযযাহ ৭১পৃঃ)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "পূর্ববর্তী জাতির সকল আচরণ এই উম্মত গ্রহণ করে নেবে।" *(সহীহুল জামে' ৭২১৯ নং)* কিন্তু তিনি মুসলিম জাতিকে সতর্ক করে বলেন, "সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদেরকে ছেড়ে অন্য কারো সাদৃশ্য অবলম্বন করে। তোমরা ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না, আর খ্রীষ্টানদেরও সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।" *(তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৫৪৩৪ নং)*

যে ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান তথা পশ্চিমা বিশ্বকে আমরা উন্নত-বিশ্ব বলি, যাদের হাতে আজ বিশ্বের নেতৃত্ব-ডোর রয়েছে, যাদেরকে নিয়ে ও যাদের মত হতে পেরে অনেকে গর্ববোধ করে থাকে, তাদের সেই বিশ্বের মানুষকে চরম যৌন ও জরায়ু-স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, আইন

করে ব্যভিচার, সমকামিতা ও বেশ্যাবৃত্তিকে বৈধ করা হয়েছে। যে বিশ্বে পয়দা হয় লাখো-লাখো জারজ সন্তান, হত্যা করা হয় লাখো-লাখো জ্রূণ। যেখানে লাখো-লাখো রয়েছে কুমারী মাতা। যৌবন আসার পূর্বেই বা প্রারম্ভেই যেখানে নারীর মূলধন সতীত্ব ও পবিত্রতাকে বিলিয়ে দেওয়া হয়। যেখানে পশুর মত পথে-ঘাটে চোখের সামনে মানুষের যৌন-মিলন ঘটতে দেখা যায়। যেখানে অসভ্য যৌন-স্বাধীনতাই হল প্রকৃত সভ্যতা।

যে পাশ্চাত্য ভোগবাদী পরিবেশের অবস্থা এই যে, ডানা বের হলেই বাচ্চা (ছেলে-মেয়ে) উড়ে যায় বাসা ছেড়ে, মা-বাপ ছেড়ে। বুড়ো-বুড়ী একাকীই মরে বাড়িতে। কেউ বা বাস করে কুকুর বা বিড়াল নিয়ে। পরিশেষে অনেকে বাড়ি-ঘর, টাকা-পয়সা উইল করে যায় কুকুর বা বিড়ালের নামে! মালিক হয় কুকুর বা বিড়ালের খাদেমরা। অবিশ্বাস্য মনে হলেও বাস্তব এ কথা।

যে বিশ্বের সংসারে আত্মীয়তার বেহেশ্তী পরিবেশ বিলীন। বংশ-পরিচয়ের সূত্র নিখোঁজ। নেই স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র বন্ধন। নেই পিতা-মাতার সহিত শালীনতাপূর্ণ আচরণ এবং আমরণ সহাবস্থান। হৃদয়ে-হৃদয়ে যৌন ছাড়া পবিত্র প্রেমের যোগসূত্র বিরল। যেখানে পবিত্রতাকামী-দেরকে রক্ষণশীল ও সেকেলে এবং যৌনতাকামী অশ্লীল মানুষদেরকে সংস্কারপন্থী ও প্রগতিশীল বলে আখ্যায়ন করা হয়। যেখানে পর্দা ও সতীত্ব হল উপহসনীয়!

'এই হইল পাশ্চাত্য সমাজের সামান্যতম প্রতিচ্ছবি। এই হইল ধর্মহীন সমাজ ও বিকৃত যৌনাচারের অবাধ মিলামিশার ফসল। নৈতিক মূল্যবোধের এহেন অবস্থায় উগ্র যৌন-স্বাধীনতাকামীদের কাছে Wife হইতেছে Wonderful instrument for enjoyments অর্থাৎ, উপভোগের এক বিস্ময়কর যন্ত্রবিশেষ। ফলে আজ তাহাদের প্রাসাদ আছে, কিন্তু গৃহ নাই। জন্মদাতা আছে, কিন্তু পিতা নাই। পরিধান আছে, কিন্তু আব্রু নাই। বুদ্ধি আছে, কিন্তু বিবেক নাই। মানুষের আকৃতি আছে, কিন্তু মনুষ্যত্ব নাই।' *(গণতন্ত্র কি একটি শির্কী ও কুফরী মতবাদ? মাজহারুল আনোয়ার ২২পৃঃ দ্রঃ)*

এখানেই শেষ নয়, কুমারী মায়ের হারাম সন্তানরা আবার বাপের পরিচয় না থাকার ফলে গর্ববোধও করে থাকে! কারণ, তাদের মত যীশু খ্রীষ্টেরও পিতা পরিচিত ছিল না তাই!!

তবুও ঐ সমাজকে নিয়েই আমরা গর্ব করি। তাদের চরিত্রেই আমরা মুগ্ধ হই। বলা বাহুল্য, ঐ সমাজেরই জীবাণু আমাদের দেশেরও তথাকথিত বহু বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ্ ও কবি-সাহিত্যিকদের মাঝে সংক্রমণ করেছে। বরং বহুলাংশে তা আমদানী করেই আনা হয়েছে। পাশ্চাত্যের শিক্ষা-পদ্ধতি, রেডিও-টিভি, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতিতেও প্রভাবান্বিত হয়ে সকলের ক্ষেত্রে যৌনসুখ ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করে যে যৌন-বিপ্লব এ শ্রেণীর মানুষেরা আনতে চায়, তা তাদের ছেলে-মেয়েদের লেবাসে-পোশাকে, আচার ও আচরণে প্রকাশ পায়। যার চরম সহযোগিতা করে দেশে নির্মিত ও প্রদর্শিত বিভিন্ন ফিল্ম্। যাতে পশ্চিমী অবাধ যৌন-সংসর্গ ও অবৈধ প্রেম ছাড়া অন্য কোন বিষয় স্থান পায় না। আর তাতে উদ্বুদ্ধ করে পশ্চিমের ঐ ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভোগবাদীরা। ওরা এদেরকে 'সংস্কারপন্থী' বলে প্রশংসা করে! কিন্তু আসলে যে ওরা অপসংস্কার ও বিনাশপন্থী তা হয়তো বুঝেও বুঝে না।

যে দেশের সুখ ও সংস্কৃতি দেখে আমরা অবাক হই, তা কি আসলেই সংস্কৃতি? যুগ পাল্টে গেছে, পাল্টে গেছে মানুষের পরিবেশ ও ধ্যান-ধারণা। যুগের চাহিদা অনুযায়ী অপসংস্কৃতি

সংস্কৃতির আকার ধারণ করেছে। কিন্তু যুগ কোন চিড়িয়ার নাম নয়। যুগ সৃষ্টি করে মানুষ। মানুষ যেমন হবে, ঠিক তেমনি হবে যুগ। মানুষ যদি নোংরা অপসংস্কৃতির চাহিদা সৃষ্টি না করে, তাহলে যুগের চাহিদার কোন প্রশ্নই ওঠে না। মানুষের মনে চিত্তজ্বালা সৃষ্টি হয়েছে ভোগের নেশা তীব্র থেকে তীব্র হওয়ার কারণে। যেখানে ভোগের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, সেখানে চিত্তবিনোদনের উপায়-উপকরণের সীমাই বা কি করে থাকে? ভোগের নেশা যত বেড়ে চলে, ততই বেড়ে চলে আরো ভোগের আকাঙ্খা। উদ্ভব হয় নতুন নতুন বিনোদনের কেন্দ্র, উপাদান ও যন্ত্র।

'যারা যত বেশী চিত্তজ্বালায় জ্বলে, তারা তত বেশী চিত্তবিনোদনের প্রয়োজন বোধ করে থাকে। তাই বিনোদনের উপাদান-উপকরণ তালাশ করে এবং বিনোদনের নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। অভাব যেখানে যত তীব্র, প্রাপ্তির হাহাকারও তত বেশী। পশ্চিমা সমাজে সেই চিত্তজ্বালা প্রায় প্রতি জনে, প্রতি ঘরে, প্রতি পরিবারে প্রবেশ করে অগ্নিজ্বালার দাবদাহ সৃষ্টি করেছে। তাই তো এত অস্থিরতা। এই অস্থিরতা দূর করার জন্যই চিত্তবিনোদনের এত বৈচিত্র সৃষ্টি করা হয়। মাজা-ঘষা, পালিশ আর বার্ণিশ করা তাদের সমাজের বহির্দৃশ্য নয়ন জুড়ায়; কিন্তু মাকাল ফলের মত অন্তর বিস্বাদ। যে সমাজে আমাদের মত সামাজিকতা নেই। স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন, চাচা-চাচী, দাদা-দাদী নিয়ে সেই সমাজে কোন পরিবার গড়ে ওঠে না। স্বনির্ভরতার পাখনা উঠলেই কে কোথায় উড়ে যায় কেউ কারো খবর রাখে না। যেখানে দুই বিয়াই-এ কখনো খোশ আলাপ হয় না। যে সমাজের কোন মা পিঠা তৈরী করে মেয়ের বাড়ি পাঠান না। ----- যেখানে লায়েক সন্তানেরা বুড়ো মা-বাবাকে 'ওল্ড্ এজ হোম' নামক 'বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বন্দি খোয়াড়ে' পাঠিয়ে দেয় অথবা নিজ বাড়িতে বুড়া-বুড়ী সরকারী চেরিটি বা লিল্লাহ খেয়ে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ধুকে-ধুকে মরেন। মৃত্যুর সময় স্বজনদের কেউ পাশে থাকে না।

এই যে জীবন-জ্বালা, সামাজিকতা-বিহীন এই যে সমাজ, আর রক্তের মায়া-মমতাশূন্য এই যে যান্ত্রিক জীবন, সেই জীবনকে, সেই শূন্যতাকে, সেই একাকীত্বকে দূর করার জন্য তারা বিনোদন-বৈচিত্র সৃষ্টি করে জীবনকে ভরে তুলতে চায়। ভালো-মন্দ বাছ-বিচার করে দেখার ফুরসৎ তাদের নেই, সেই প্রয়োজন আছে বলেও তারা মনে করে না। ভোগের জন্যই তাদের চিত্তের প্রয়োজন। তাই চিত্ত আর ভোগের পিছনেই তারা ছুটে। এই বিত্ত দিয়ে তারা চিত্তকে সব সময় আনন্দে ডুবিয়ে রাখার চেষ্টা করে থাকে।

ওদের বিত্ত আছে, আর আছে বিত্তকে চিত্তবিনোদনের জন্য ব্যবহারের মনটাও। দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত দৌলত আছে তাদের। দেহের রঙটাও লালচে সফেদ। আমাদের মত কালো আদমীর মুগ্ধ হওয়ার, বিমোহিত হওয়ার, এমন কি সম্মোহিত হওয়ার জন্য যা কিছু তাদের থাকা দরকার, সবই আছে। তারা যা করে তাই আমাদের ভালো লাগে। ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত এই সাদা চামড়ার মানুষদের প্রভু জ্ঞান করে আমরা ধন্য হয়েছি। এ জন্য রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করলেও সাংস্কৃতিক দাসত্ব থেকে মুক্তির কখনো চেষ্টা করিনি। কারণ, জাতে ওঠার জন্য এই বন্ধনকে কখনো ছিন্ন করিনি। বরং আরো বেশী মজবুত করেছি। তাদের জাত-গোষ্ঠী সবাইকে আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক প্রভু বলে স্বীকার করে নিয়েছি।' *(দেখুন, অপসংস্কৃতির বিভীষিকা, জহুরী ১৪-১৬পৃঃ)*

আমরা আমাদের অজান্তেই পশ্চিমের পদলেহী গোলাম হয়ে পড়েছি। আজ তাদের সামান্য অনুগ্রহ লাভ করার জন্য আমরা আমাদের হাব-ভাবে ফুটিয়ে তুলছি যে, আমরা তাদেরকে মন থেকে ভালোবাসি। তাই স্বকীয়তা বিকিয়ে, স্বাতন্ত্র্য বিলীন করে চেষ্টা করি তাদের পদসেবা করার।

'ইসলামে তুমি দিয়ে কবর মুসলিম বলে কর ফখর
মুনাফিক তুমি সেরা বেদ্বীন,
ইসলামে যারা করে যবেহ্ তুমি তাহাদের হও তাবে'
তুমি জুতা-বহা তারও অধীন।'

তবে হ্যাঁ, বেদ্বীন প্রতিবেশী ও জাতির সহিত দেশীয় মিল থাকতে পারে, পার্থিব লেনদেনে যোগাযোগ থাকতে পারে, সদাচার ও সদ্ব্যবহার থাকতে পারে। তা বলে নিজের স্বাতন্ত্র্য বিকিয়ে দিয়ে একাকার হওয়া চলে না।

আমাদের দ্বীন ও শরীয়ত যে সব বিষয়ে বিজাতির অনুকরণ করতে নিষেধ করে, তার মধ্যে একটি বিষয় হল, আকীদা ও বিশ্বাসগত বিষয়। অর্থাৎ, তারা যে শির্কী ও কুফরী বিশ্বাস রাখে, সে বিশ্বাস কোন মুসলিম রাখতে পারে না। যে কুফরী মতবাদে তারা বিশ্বাসী সে মতবাদে কোন মুসলিম বিশ্বাসী হতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ ঈদ ও পাল-পার্বণ উৎসব উদ্‌যাপন ও অনুষ্ঠানগত বিভিন্ন বিষয়। অর্থাৎ, দুই ঈদ ছাড়া কোন মুসলিম ওদের দেখাদেখি আর কোন তৃতীয় ঈদ আবিষ্কার করতে পারে না; চাহে তা কোন দুর্বল বা জাল হাদীস-ভিত্তিক হোক, অথবা নিছক মনগড়া।

বলাবাহুল্য, শবে মি'রাজ, শবে বরাত, মুহর্রম, নবীদিবস বা ঈদে-মীলাদুন্নবী ফাতেহা ইয়াযদহম, ফাতেহা দোয়াযদহম, আখেরী চাহারশোম্বা, পৌষপার্বণ, সিলভার জুবিলি, গোল্ডেন জুবিলি, জাতীয় দিবস, মসজিদ সপ্তাহ, জন্মদিন বা হ্যাপি বার্থ ডে' উৎসব, হানিমুন, বিবাহ-বার্ষিকী, মৃত্যু-বার্ষিকী, উরস-উৎসব, এপ্রিল ফুল, হ্যালোইন উৎসব, নতুন খাতা বা নববর্ষ প্রভৃতি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন ইসলামে ভিত্তিহীন এবং পরের দেখাদেখি আনন্দে স্ফূর্তি করার মাধ্যম মাত্র। এ সব ঈদ বা পরব পালন কোন মুসলিম করতে পারে না। যেমন ঐ শ্রেণীর কোন উৎসবে অথবা বিজাতির কোন পাল-পার্বণে কোন মুসলিম অংশগ্রহণ করে খুশী করতে পারে না। কারণ, বিজাতির সকল ঈদ ও ইবাদত বাতিলকে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। আর তাদের সেই ঈদের খুশীতে শরীক হওয়া বা সে উপলক্ষ্যে তাদেরকে 'মোবারকবাদ' পেশ করার অর্থই হল তাদের বাতিলকে স্বীকৃতি দেওয়া ও সমর্থন করা এবং আসল সত্যের অপলাপ করা।

বর্তমানে বিজাতির অনুকরণে মুসলিমদেরও পরব সংখ্যা এত বেশী হয়েছে যে, তা পালন না করে মনে না রাখলেও অনেক সময় ঠকতে হয়। ধর, পাড়া-গ্রাম থেকে শহরে গেলে কোন অফিসের কাজে অথবা ব্যাংকে লেনদেনের কাজে। হঠাৎ দেখলে, সে অফিসে বা ব্যাংকে তালা ঝুলছে। সুতরাং এত কষ্ট করে এসে তোমাকে ঠকতে হল। এ ছাড়া ঠকানির পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পাবে তখন, যখন পাশের কোন পরব-মানা মুসলিমকে এ বন্ধের কারণ জিজ্ঞাসা করবে এবং সে অবাক হয়ে বিদ্রূপের আল্‌গা জিভে তোমাকে বলবে, 'ওঃ! মুসলিম হয়ে

দাড়ি রেখে নিয়েছ বেশ। আর পবিত্র ও পরবের দিনের খবর রাখ না!' ইত্যাদি।

একদিন এক শহরের বাসস্ট্যান্ডে বাসে বসে ছিলাম। পাশের সিট ছিল খালি। এমন সময় আমার পরিচিত এক হাই-স্কুলের শিক্ষক মহাশয় বাসে উঠলেন। সালাম জানালে আমি উত্তর দিয়ে তাঁকে সাদরে পাশের সিটে বসতে অনুরোধ করলাম। তিনি খুশীর সাথে বসলেন। এরপর হঠাৎ করেই আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করে বসলাম, 'মার্কেট এসেছিলেন, আপনার আজ স্কুল নেই নাকি?' তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'আপনি জানেন না; আজকে ফাতেহা ইয়াযদহম, স্কুলের ছুটি?' আমি খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েই বললাম, 'ও তাই বুঝি? আচ্ছা এই 'ফাতেহা ইয়াযদহম'টা কি?'

তিনি যেন আরো অবাক হলেন। আসল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে বড় আফশোসের সাথে বললেন,'এই তো মুসলমানদের অবস্থা! নিজেদের পালপার্বণেরও খবর রাখে না। আজ তো হযরত বড় পীরের মৃত্যু-দিবস।'

এরপর অবশ্য প্রসঙ্গ পাল্টাতে বলেছিলাম, 'মুসলমানরা যদি নিজেদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সঠিক মতে জানত, তাহলে সত্যই তাদের এ দুরবস্থা হতো না। কিন্তু আজকাল আসল ছেড়ে দিয়ে নকল হীরা নিয়েই টানাটানি বেশী।'

মনে মনে ভাবলাম, কুঁড়ে চাষীই অমাবশ্যা খুঁজে বেশী। আর কাজ-চোরা বউই ভাশুর মানে অধিক। নিজের ফরয আদায় থেকে যারা যত বেশী রেহাই পেতে চায়, তাদেরই এসব নকল পালপার্বণের খোঁজে ছুটি পাওয়াটা অধিক আকাংখিত। তাছাড়া যারা নামাযে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ে না, বরং নামাযই পড়ে না, তাদেরই ফাতেহা বা ফয়তা নিয়ে বেশী খোঁজ-খবর ও বাড়াবাড়ি। বিজাতির অনুকরণের ফসল এই 'বারো মাসে তেরো পরব।' বাপকে জীবনে চোখে না দেখতে পেরে অথবা তার অবাধ্য সন্তান হিসাবে জীবন অতিবাহিত করে অথবা জীবিত অবস্থায় তার বিরোধিতা করে তার মৃত্যুর পর তার নামে ফয়তা দেওয়া হাস্যকর নয় কি?

পরন্তু আসল কথা এই যে, দ্বীনের মূল কর্মকর্তব্য বর্জন করে এই সমস্ত নকল পালপার্বণ সৃষ্টি করে একটু আনন্দ উপভোগ করাই হল এক শ্রেণীর স্বার্থপর মানুষদের উদ্দেশ্য। তাই দেখা যায় উহুদ-যুদ্ধের দিনকে স্মরণ করে অনেকে হালোয়া বানিয়ে খায়। কারণ, ঐ দিনে মহানবী ﷺ এর দাঁত-মুবারক শহীদ হয়েছিল এবং মা-ফাতেমা তাঁকে হালোয়া বানিয়ে খেতে দিয়েছিলেন। অতএব ঐ দিনে হালোয়া খাওয়া সুন্নত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, ঐ শ্রেণীর মানুষরা দাঁত ভাঙ্গা (জিহাদ) কে (ফরয তো দূরের কথা) সুন্নত মনে করে না।। অথচ অক্ষত দাঁতে হালোয়া খাওয়াকে সুন্নত মনে করে! এটা স্বার্থপরতা নয় তো কি?

দুঃখের বিষয় যে, বিজাতির দেখাদেখি এক শ্রেণীর মুসলিম যুবক; যাদের বাপের পকেটে পয়সা নেই, তারা জোর-জুলুম করে অপরের নিকট থেকে চাঁদা তুলে মহর্রমের পরবে ফূর্তি-আমোদ করে থাকে! জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের গাড়ি থামিয়ে এমন চাঁদাবাজি তথা ঐ অর্থ দ্বারা না হলেও ১০ই মহর্রমের দিন কোন প্রকার আনন্দ অথবা শোকপালন করা ইসলামী শরীয়ত-বহির্ভূত কর্ম। যেমন বিজাতীয় সহপাঠীদের চাঁদা তুলে কোন পূজা বা জন্ম-বার্ষিকী পালন করতে দেখে মুসলিম ছাত্রদেরও অনুরূপ নবী-দিবস

পালন করা ইসলামী শরীয়ত-সম্মত নয়। প্রতিবেশীর সাথে পাল্লা দিয়ে এমন কাজ মুসলিমদের জন্য সত্যাই লজ্জাকর।

বলাই বাহুল্য যে, ইসলাম হল খাঁটি একত্ববাদের ধর্ম। এ ধর্মে কোন প্রকার ব্যক্তিপূজা (মূর্তিপূজা, দর্গাপূজা), শক্তিপূজা, অর্থপূজা এবং এক কথায় একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদত ও দাসত্ব ছাড়া অন্য কোন পূজার স্থান নেই। ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানরা আম্বিয়াগণের কবরসমূহকে মসজিদ (সিজদার জায়গা) বানিয়ে নিত। ইসলাম এ ব্যাপারেও তাদের অনুকরণ করতে নিষেধ করল। কবর ও মাজার পূজার বিরুদ্ধে ইসলামের ঘোষণা এল, "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিরা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে। সাবধান! খবরদার তোমরা কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করে নিও না। আমি এ করতে তোমাদেরকে নিষেধ করে যাচ্ছি।" *(মুসলিম ৫৩২ নং)*

"আল্লাহ ইয়াহুদী জাতিকে ধ্বংস করুক; তারা তাদের আম্বিয়াগণের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে।" *(বুখারী ৪৩৭ নং)*

"ওরা হল এমন জাতি; যারা তাদের কোন নেক বান্দার মৃত্যু হলে তাঁর কবরের উপর মসজিদ তৈরী করেছে এবং তাতে তাঁর ছবি বা মূর্তি স্থাপন করেছে। ওরাই হল আল্লাহর নিকট সবচাইতে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।" *(বুখারী ৪২৬, মুসলিম ৫২৮ নং)*

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বর্তমান বিশ্বে অধিকাংশ মুসলিম বিজাতির অনুকরণে ঐ শ্রেণীর পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে এবং তওহীদের ধর্মে ইবাদত ও বন্দেগীতে অন্যকে আল্লাহর শরীক অথবা মাধ্যমরূপে পূজতে শুরু করেছে। যে গায়রুল্লাহর ইবাদত (পূজা) নির্মূল ও উচ্ছেদ করার জন্য এ ধরাধামে ইসলামের আবির্ভাব ছিল, সেই ইবাদত (পূজা)কেই অভীষ্ট লাভের অনন্য উপায় বলে বরণ করে নিল মুসলিম জাতির বহু কুলাঙ্গারদল! আল্লাহ এ জাতিকে সুমতি দিন। আমীন।

ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানরা রোযা রাখে, কিন্তু সেহরী খায় না। ইসলাম তাদের অন্ধ অনুকরণ করে সেহরী খাওয়া ত্যাগ করতে নিষেধ করল। *(মুসলিম ১০৯৬ নং)* রোযা রাখার পর ওরা ইফতার করে, কিন্তু বড্ড দেরী করে। ইসলাম তাদের অনুকরণ বর্জন করতে নির্দেশ দিয়ে সূর্য ডোবার সাথে সাথে সত্বর ইফতার করতে মুসলিম জাতিকে উদ্বুদ্ধ করল। *(আবূ দাঊদ ২৩৫৩, ইবনে মাজাহ ১৬৯৮ নং, হাকেম ১/৪৩১)*

সূর্যপূজকরা সূর্যের উদয় ও অস্তের সময় তার পূজা করে থাকে। তাই ঐ সময়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যেও নামায পড়াকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। *(মুসলিম ৮৩২নং)* যাতে মুশরিকদের সাথে তওহীদবাদী মুসলিমদের কোন প্রকার সাদৃশ্যভাব না ফুটে ওঠে।

বৈরাগ্যবাদ বিজাতীয় আচার। ইসলামে তা নিষিদ্ধ হল। *(আবূ দাঊদ ৪৯০৪ নং)*

'বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ----।'

ইসলামের এ আদর্শ হল মানব-প্রকৃতির জন্য অতুলনীয়। সুতরাং মাছ-গোশ্ত না খাওয়া, জুতো না পরা, গাড়ি না চড়া, ইত্যাদি বিজাতীয় আচরণ, ইসলামী আচরণ নয়।

ইসলামে দলাদলি ও ফির্কাবন্দী নিষিদ্ধ কর্ম। কারণ, এ আচরণ ও নীতি হল মুশরিক ও কাফেরদের। তাদের সমাজেই আছে ভেদাভেদের নানান্ প্রাচীর। উঁচু-নীচু পার্থক্য করার মনগড়া নানান্ দোষগুণ। মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা তাদের মত হবে না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও বিচ্ছিন্ন হয়ে (দলে দলে বিভক্ত হয়ে) পড়েছে এবং নিজেদের মাঝে মতান্তর সৃষ্টি করেছে।" *(সূরা আ-লি ইমরান ১০৫ আয়াত)*

বিজাতীয় মানুষকে ঘৃণা করে নয়, বরং বাতিল থেকে হকের যে একটা পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে তা প্রকাশের জন্য এবং মুসলিম বাতিলের সাথে কোন প্রকার আপোসে সম্মত নয়, তা জানিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই লেবাসে-পোশাকেও সে অন্যান্য জাতি থেকে ভিন্ন। পরিচ্ছদ-পরিধানেও মুসলিমের আছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। যেমন, মুসলিমের লেবাসে প্রকাশ পায় না কোন প্রকার অহংকার-অহমিকা, পাওয়া যায় না কোন বিজাতীয় গন্ধ, থাকে না কোন প্রকার দৃষ্টিকটুতা, অশ্লীলতা ও বেলেল্লাপনার ভাব। আর এ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলা তার একান্ত কর্তব্য।

একদা মহানবী ﷺ আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ কে দু'টি জাফরান রঙের কাপড় পরে থাকতে দেখে বললেন, "এ ধরনের কাপড় হল কাফেরদের। অতএব তুমি তা পরো না।" *(মুসলিম, আহমাদ ২/ ১৬২)*

এ থেকে বুঝা যায় যে, যে ধরনের লেবাস-পোশাক বিজাতির বিশেষ প্রতীক তা কোন মুসলিম নর-নারী ব্যবহার করতে পারে না।

পুরুষের এক প্রকৃতি-সুন্দর রূপ হল তার চেহারায় দাড়ি। কুদরতের দেওয়া এই দাড়ি থাকলে মুসলিমকে দেখতে যেমন সুন্দর লাগে, তেমনি চাঁছা-ছিলার ঝামেলা থেকে রেহাই পায়। তাছাড়া বিশেষ করে গালে টোল পড়ার বয়সে টোলের ত্রুটি দাড়ি দিয়ে গোপন করা যায়। এতে থুড়থুড়ে হলেও চেহারা বেশ শ্রদ্ধাপূর্ণ সুন্দর দেখায়। তবে শর্ত হল দাড়ি ছাড়ার সাথে মোছ ছেঁটে ফেলতে হবে। নচেৎ সুন্দরের উপর অসুন্দর বেখাপ্পা দেখাবে। আর এমন চেহারা হবে মুসলিমের বৈশিষ্ট্য।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমরা মোছ ছেঁটে ফেল এবং দাড়ি ছেড়ে দাও (কমপক্ষে এক মুঠো পরিমাণ)। আর একাজ করে তোমরা মুশরিকদের অন্যথাচরণ কর।" *(বুখারী ৫৮৯৩, মুসলিম ২৫৯ নং)* "মোছ ছেঁটে ও দাড়ি রেখে অগ্নিপূজকদের বৈপরীত্য কর।" *(মুসলিম ২৬০ নং)* "এবং ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে' ১০৬৭ নং)*

আর তা এই জন্য যে, ওরা কেউ আমাদের মত হতে চায় না, আমাদের কাছে আসা সত্যকে গ্রহণ করতে চায় না, তাই আমরা তাদের বাতিল চলনের বিরোধিতা করতে আদিষ্ট হয়েছি।

অনেক যুবকের অবস্থা 'উল্টা বুঝিল রাম।' অর্থাৎ, তারা দাড়ি চেঁছে ফেলে মোছ লম্বা ছেড়ে মোছাল সেজে গোঁপে পাক দেয়। কারো বা টাঙ্গি মোছ! কারো বা হাফ-দাড়ি মোছ বা জুলফি-জোড়া মোছ। কারো বা দাড়ি-মোছ একেবারেই ছিলা! এরা সকলেই মহানবী ﷺ ও তাঁর অনুসারীদের বিরোধী।

অনেকের দাড়ি আছে, তবে তা মহানবীর অনুকরণে নয়; বরং তা হয়তো লেনিন বা কার্লমার্কসের অনুকরণে, নচেৎ কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব বা হিরোর অনুকরণে। যার দরুণ তাদের দাড়ি-মোছ ইসলামী ছাঁচ বা কাটিং মত নয়। ফ্যাশন মনে করে রাখে, এক সপ্তাহে ছাঁটে, পরের সপ্তাহে চাঁছে। কাউকে ছাঁটতে বা চাঁছতে নিষেধ করলে বুকের দিকে ইঙ্গিত করে

বলে, 'ঈমান তো এখানে!' অর্থাৎ, দাড়িতে নয়। কিন্তু তার জানা নেই যে, ঈমানের মূল আছে অন্তরে, আর তার কান্ড ও শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন অঙ্গে ও কর্মে। সুতরাং দাড়ি রাখাও হল ঈমানের এক শাখা এবং তা ওয়াজেব।

পক্ষান্তরে আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা মুসলিমকে ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মেকি দাড়ি রাখে। এরা দুইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

চুল-দাড়ি পেকে সাদা হয়ে গেলে সাদাই রেখে দেওয়া বিজাতীয় আচরণ। তাই ইসলামের আদেশ হল, তা কালো ছাড়া অন্য কোন রঙ্‌ দ্বারা রঙিয়ে ফেল এবং বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করো না। *(বুখারী ৩৪৬২, মুসলিম ২১০৩ নং, আহমাদ, ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ১০৬৭, ৪৮৮৭ নং)*

মহিলাদেরকে বেপর্দায় রাখা হল জাহেলী যুগের মানুষদের অনুকরণ। *(সূরা আহযাব ৩৩ আয়াত)* বরং বর্তমান বিশ্বের সমগ্র জাতির অন্ধ অনুকরণ হল মহিলাদের আব্রু ও পর্দাহীনতায় বেগানা পুরুষের সামনে যাওয়া।

মাথায় পরচুলা ব্যবহার ইয়াহুদী মেয়েদের আচরণ। অতএব তা কোন মুসলিম নারী ব্যবহার করতে পারে না। *(মুসলিম ২১৪২ নং)*

কেউ এলে তার জন্য দাঁড়িয়ে সম্মান জানানো; যেমন, কোর্টে হাকীমদের জন্য, পার্লামেন্টে স্পীকার বা মন্ত্রীদের জন্য, স্কুল-কলেজে শিক্ষকদের জন্য অথবা কোন আলেম-বুযুর্গের জন্য উঠে দাঁড়িয়ে তা'যীম প্রকাশ করা বিজাতীয় আচরণ। কোন মুসলিমের জন্য তা বৈধ নয়। *(মুসলিম ৪১৩, আবু দাউদ ৫২৩০ নং প্রমুখ)*

বৈধ নয় কোন মৃত বা তার আত্মার উদ্দেশ্যে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালনের সাথে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন। কারণ, এ প্রথাও বিজাতির নিকট থেকে ধার করা প্রথা।

গুরুজনদেরকে সালাম দেওয়ার সময় অনেকে প্রণামের অনুকরণ করে তাঁদের পা ছুঁয়ে সে হাত কপালে ও বুকে ঠেকিয়ে সম্মান জানায়। এ ছাড়া এই সালামে অনুপ্রবেশ করেছে আরো অনেক কিছু বিজাতীয় কায়দা।

ইসলামে এক মুসলিম অপর মুসলিমকে সাক্ষাৎ করলে যে অভিবাদন আছে, তা অন্য কোন জাতির নেই। একই সঙ্গে অভিবাদন, দুআ ও কল্যাণ কামনা অন্য কোন শব্দ ও ভাষাতে নেই। সুপ্রভাত, শুভসন্ধা, নমস্কার আর যাই বলুন না কেন 'সালাম'-এর সমতুল কিছুই নয়। তবুও যেন এই অতুল শব্দগুচ্ছের অভিবাদনকে পরিহার করে মুসলিম পরিবেশেও ইংরেজী কায়দায় 'গুড্‌ মর্নিং' 'গুড্‌ এভেনিং' প্রভৃতি বলে পশ্চিমী ধারায় সালাম জানানো হয়, সৈনিক পর্যায়ে সেলুট করা হয় ঐ একই কায়দায়। মৃতব্যক্তিকেও শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা হয় ঐ পশ্চিমী ছাঁচে। 'ইংরেজ কালচারের জয়-জয়কার যেন সর্বত্র। পোশাকেই বলুন, চাল-চলনেই বলুন, আর তাদের বুলি-বচনের কথাই বলুন, আমরা হাতে-কলমে প্রাত্যহিক কাজ-কর্মে এই প্রমাণই রাখছি যে, আমরা তোমাদের ছিলাম, তোমাদেরই আছি এবং তোমাদের হয়েই থাকব।' *(অপসংস্কৃতির বিভীষিকা ২৪পৃঃ)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদেরকে ছেড়ে অন্যের অনুকরণ করে, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়। তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাদৃশ্য অবলম্বন (অনুকরণ) করো না। ইয়াহুদীদের সালাম হল আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা এবং খ্রীষ্টানদের সালাম হল হাত দ্বারা

ইশারা করা।" *(তিরমিযী ২৮৪৮, সিলসিলাহ সহীহাহ ২১৯৪ নং)* (*)

বলা বাহুল্য যে, পোশাকে আমরা যা ব্যবহার করি, তা ওদেরই দেখে শেখা; যাতে বসে পেশাব করা যায় না, ইদ্দত যথার্থরূপে গোপন হয় না, গাঁটের নীচে ঝুলিয়ে না পরলে ফ্যাশন জমে না। আর আমাদের স্ত্রী-কন্যা-বোনদেরকে যা পরিয়েছি তাও ঐ 'ম্যাডাম'দের অনুকরণ। 'আলোকপ্রাপ্তা' করার উদ্দেশ্যে যথা সম্ভব তাদের উন্মুক্ত হাঁটুতে, জাঙ্গে, বুকে, মাথায়, পিঠে ও নাভিতে সূর্যের আলো দিয়ে থাকি!

অনেকে বাড়িতে কুকুর পুষতে শুরু করেছে ওদের দেখাদেখি। বিবাহের পূর্বে কোর্টশীপ বা বর-কনের অবাধ মিলন ও হৃদয়ের আদান প্রদান, পয়গাম বা বাগ্‌দানের সময় পয়গামের আংটি পরাবার প্রথা ইত্যাদিও ওদের নিকট থেকে অনুপ্রবেশ করেছে আমাদের সমাজে।

নাম রাখাতেও অনুকরণ করা হচ্ছে বিদেশী কায়দার। অমুসলিমরা কোনদিন ভুল করেও নিজেদের ছেলে-মেয়েদের মুসলমানী নাম রাখে না। অথচ মুসলিমরা এ কাজ বড় গর্বের সাথে ফ্যাশন মনে করে পালন করে থাকে।

আর এ সবের মূল কারণ হল, আজকের মুসলিম হীনম্মন্যতার শিকার। মানসিক আগ্রাসনের শিকার হওয়ার ফলে বিজাতীয় সব কিছুকে লুফে নিতে প্রগতি ধরে নিয়েছে। সাধারণতঃ যে দুর্বল হয়, সে হয় প্রভাবশীল। আর সবল হয় প্রভাবশালী। মুসলমান মানসিক দুর্বলতার শিকার হয়ে নিজেকে প্রভাবশালী না করে প্রভাবশীল করে ফেলেছে।

ইসলাম আসার পূর্বে জাহেলী যুগ ছিল অন্ধ মূর্খতার যুগ। ভ্রষ্টতার অন্ধকার ছিল ঘন কালো হয়ে মানুষের মনে ও সমাজে। সে যুগের সেই অসভ্যতার কৃষ্ট তমসাচ্ছন্ন বিভাবরী ভেদ করে সভ্যতার সূর্য উদিত করল ইসলাম। দূর হল মূর্খতা ও ভ্রষ্টতার অন্ধকার, অপসৃত হল মনের কালো। নিন্দিত হল জাহেলিয়াতের সকল কর্ম। সুতরাং সে সব কর্ম ও প্রথা কোন মুসলিম যে গ্রহণ করতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য।

জাহেলী প্রথা যেমন, মৃতব্যক্তির জন্য মাতম করে শোক পালন করা, মর্সিয়া গাওয়া, বংশ নিয়ে গর্ব করা, অপরের বংশে খোঁটা দেওয়া, রাশিচক্রে বিশ্বাস রাখা, *(মুসলিম ৯৩৫ নং)* নিজের দেশ, ভাষা, মযহাব, গোত্র, রঙ, বর্ণ প্রভৃতিতে অন্ধ-পক্ষপাতিত্ব করা ইত্যাদি।

সকল মুসলিম ভাই-ভাই। তাদের মাঝে ভেদাভেদের কোন প্রাচীর নেই। বর্ণ-বৈষম্যের অভিশাপ থেকে মুসলিম সমাজ সম্পূর্ণ মুক্ত। এ সমাজের সকলেই সমান অধিকারের দাবিদার। "সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হল সেই ব্যক্তি, যে সব চেয়ে বেশী মুত্তাকী ও পরহেযগার।" *(সূরা হুজুরাত ১৩ আয়াত)*

এমন কিছু আচরণ আছে যা মানুষের নয়, শয়তানের। মুসলিম শয়তানের অনুকরণ করে সে সব আচরণ করতে পারে না। যে শয়তান, তার সকল কর্ম শয়তানীতে ভর্তি। এমন কি আপাতঃদৃষ্টিতে যে কাজ মুসলিমের জন্য ভালো মনে হয় সে কাজ শয়তানের তরফ থেকে হলে জানতে হবে ঐ ভালোর মাঝে কোন কালো ভরে ফেলেছে, অপেক্ষাকৃত কোন বড়

(*) *প্রকাশ থাকে যে, যেখানে শব্দ পৌঁছবে না এমন জায়গার কোন লোককে অথবা দূরের কাউকে সালাম দিলে হাত দ্বারা ইশারা করে তা জানানো দূষনীয় নয়। তবে শর্ত হল, ইশারার সাথে মুখে সালাম উচ্চারণ অবশ্যই করতে হবে।*

ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে। অতএব শয়তানের শয়তানীতে অনুকরণ করা কোন মানুষের জন্য শোভনীয় হতে পারে না।

বাম হাতে খাওয়া-পান করা এক শ্রেণীর মানুষের ফ্যাশন। ডান হাতে চা, বাম হাতে বিস্কুট, অথবা ডান হাতে পেপ্সি বা জুস এবং বাম হাতে কেক ইত্যাদি খেয়ে তারা আধুনিকতা প্রদর্শন করে থাকে। অথচ পাশ্চাত্যের অনুকরণে এ আধুনিকতা ও ফ্যাশন হল আসলে শয়তানের। মহানবী ﷺ বলেন, ‘‘তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তার বাম হাতে পানাহার না করে। কারণ, শয়তান তার বাম হাত দিয়ে পানাহার করে থাকে।’’ *(মুসলিম ২০১৯, তিরমিযী, সহীহুল জামে’ ৭৫৭৯ নং)*

অনেক যুবক অহংকার প্রদর্শন করে ঔদ্ধত্যের সাথে বলে, ‘বাম হাতের দোষ কি? সে হাতে খেলে ক্ষতি কি?’ আর তারা হয়তো এ কথাও বলে, ‘ডান হাত লাট-সাহেব নাকি? সে হাত দিয়ে পায়খানা সাফ করলে ক্ষতি কি?’ কিন্তু ফলকথা হল এই যে, রুচি যখন বিকারগ্রস্ত হয়, তখন স্বাদ পার্থক্য করার মত ক্ষমতাও আর থাকে না এক শ্রেণীর রোগীর কাছে। অবশ্য এমন রোগীর সত্বর চিকিৎসা করা যে জরুরী, তা হয়তো বলা নিষ্প্রয়োজন।

লেবাসে-পোশাকে, চলনে-বলনে, ভাবে-ভঙ্গিতে আচরণে-প্রসাধনে নারী-পুরুষের একে অন্যের অনুকরণ করা এক চারিত্রিক দোষ। দাড়ি-মোছ চেঁছে, চুল লম্বা রেখে, ছাপা লুঙ্গি-জামা পরে, গাঁটের নীচে মাটিতে পরিহিত কাপড় ঝুলিয়ে, পাউডার মেখে, হাতে বালা, গলায় সোনার হার ইত্যাদি পরে মহিলাদের অনুকরণ করে থাকে এক শ্রেণীর ‘লারে-লাপ্পা’ মার্কা যুবক।

পক্ষান্তরে চুল ছেঁটে ছোট করে, পরিহিত কাপড় গাঁটের উপর, বরং হাঁটুর উপর তুলে, প্যান্ট-শার্ট পরে, অঙ্গ-ভঙ্গিতে পুরুষের মত গট্‌গট্ করে চলে এক শ্রেণীর আধুনিকা ‘ম্যাডাম’-এর দল। যাদেরকে পিছন থেকে দেখলে কোন দর্শক সহজে ঠাওর করতে পারে না, সামনে ওটা ছেলে চলল, না মেয়ে? প্রাকৃতিক নিয়মের নিয়ামক নারী-পুরুষের মাঝে বড় পার্থক্য রেখেছেন। যা অস্বীকার করলে এবং নারী-পুরুষকে সকল ময়দানে একাকার করে দিলে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় সমাজে যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনৈতিকতা তথা অশান্তির ঝড় দেখা দেবে, তা বহু সমাজ-বিজ্ঞানী স্বীকার করেছেন।

যুগের ধর্ম এই-
বারুদে-আগুনে একই করিলে জ্বালাইবে তোমাকেই।

শ্রেষ্ঠ সমাজ-বিজ্ঞানী নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেন, ‘‘আল্লাহ সেই পুরুষকে অভিশাপ করেন, যে নারীর পোশাক পরিধান করে এবং সেই নারীকে অভিশাপ করেন, যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে।’’ *(আবূ দাঊদ, হাকেম, সহীহুল জামে’ ৫০৯৫ নং)*

তিনি বলেন, ‘‘পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, মেড়া পুরুষ এবং পুরুষের বেশধারিণী মহিলা জান্নাতে যাবে না।’’ *(নাসাঈ, বাযযার, হাকেম ১/৭২, সহীহুল জামে’ ৩০৬৩ নং)*

তিনি নিজেও পরস্পরের বেশধারী নারী-পুরুষকে অভিশাপ করেছেন। *(বুখারী ৫৮৮৫ নং প্রমুখ)* এবং আরো বলেছেন যে, ‘‘সে পুরুষ আমাদের দলভুক্ত নয়, যে কোন নারীর সাদৃশ্য অবলম্বন করে। অনুরূপ সে নারীও আমাদের দলভুক্ত নয়, যে কোন পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বন করে।’’ *(আহমাদ, সহীহুল জামে’ ৫৪৩৩ নং)*

আমাদের সমাজের যুবকদলের মনকে যে শ্রেণীর মানুষ অধিকরূপে জয় ও আকৃষ্ট করতে পেরেছে, তারা হল ফিল্মী দুনিয়ার তারকা নায়ক-নায়িকারা। কাল্পনিক কাহিনীর অভিনয়ের মাধ্যমে তারা অধিকাংশ তরুণ-তরুণীর হৃদয়-কোণে বাসা বেঁধে নিয়েছে। এরা তাদেরকে এত ভালোবাসে যে, তাদের ছবি দিয়ে নিজেদের ঘর সাজায়, প্রাইভেট এ্যালবামে রাখে, তাদের ছবি ও খবর প্রকাশক পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করে সাগ্রহে পড়ে মনে আমেজ নিয়ে থাকে। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তাদের অনুকরণ করার চেষ্টা করে। যৌন-জীবনে তো বটেই, এছাড়া সামাজিক জীবনেও তারা হয় এদের একমাত্র আদর্শ। তারা চলচ্চিত্র জগতের তারা, এদের মনের আকাশের তারা, এদের চোখেরও তারা। আর সেই তারা দেখেই রাতের আঁধারে পথ নির্ণয় করে। তাদেরই অনুগ্রহ ও অনুকরণে তৈরী হয় মস্তান যুবক-যুবতী।

এক শ্রেণীর যুবক নজরে পড়ে, যাদের শার্ট বা পাঞ্জাবীর বুকের বোতাম খোলা, ফুল-হাতা জামার হাত গুটানো, হাতে বালা বা সূতো বাঁধা, মাথায় এক ঝাঁকা চুল। তাদের পরনের লুঙ্গি, পায়জামা বা প্যান্ট্ রাস্তায় ঝাড়ু মেরে যায়। পিছন থেকে দেখে মনে মনে প্রশ্ন জাগে, ওটা ছেলে, না মেয়ে? সামনে না এলে হয়তো বুঝাও যায় না। এদেরকে নাকি 'মস্তান' বলে। মস্তান হল ফাসী শব্দ; যার অর্থ পাগল। তাহলে এরা কি আসলে পাগল? হ্যাঁ ফিল্মের দেওয়ানা ও হিরো-হিরোইনের প্রেমে পাগল। অথবা তারা অন্যান্যদেরকে পাগল ভাবে। তাদের ঐ হিরো-হিরো ভাবের মন বলে, আমাদের বুকে পাটা আছে, তাই বুক খুলে চলি। আমরা কোন নিয়ম বা আদব-কায়দা মানি না, কাউকে আদৌ ভয় করি না। খোলা বুকই তার প্রমাণ। বাহুতে আছে প্রবল শক্তি, তার প্রমাণ হল হাতে বাঁধা সুতো অথবা লোহার বালা। চিত্র-তারকাদেরকে তারা এত ভালোবাসে যে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাদেরই অনুকরণে গঠিত। তাদের নামে চুলের কাট, শার্টের কাট, প্যান্টের কাট, প্রভৃতি বড়ই প্রচলিত এদের কাছে।

'তাদের প্যান্টের নীচ অংশ হাই হীল জুতার নীচ পর্যন্ত গড়ায়, পথের ময়লা প্যান্টের কাপড়ে সাফ হয়। তারা চক্কর-মক্কর রংগীন কাপড়ে জামা তৈরী করে সার্কাসের রংবাজ সাজে। মহিলাদের ব্লাউজের কাপড় ওরা দখল করেছে বলে মহিলারা এক রংগা কাপড়ে সংক্ষিপ্ত ব্লাউজ তৈরী করে মনের দুঃখে পেট বের করে চলেন। সোনা মানিকরা বুক উদাম করে চলে, আর তাদের সম-মনা মহিলারা পেট বের করে চলেন। তাদের কেউ কেউ স্বদেশী গান পরিবেশনের স্টাইল ছেড়ে দিয়ে পশ্চিমা কায়দায় কোমর দুলিয়ে গান করে বেড়ায়। ওরা পুরুষ হয়ে কোমর দুলিয়ে যখন গান গায়, তখন নাচনেওয়ালীরাও শরমে মুখ লুকায়। আসলে তারা বহুরূপী, তাই বিশেষ কোন এক রূপে তাদের দেখা যায় না। অনুকরণে সোনা-মানিকরা বানরকেও লজ্জা দিয়েছে। এ জন্য স্বদেশী বানরকুলকে আমেরিকা নিতে চাইলেও ওদের নিতে চায় না। মাথার পিছনের দিকে তারা চুল এতই লম্বা রাখতে শুরু করেছে, যে জন্য ওদের সম-মনা মহিলারা সোনা-মানিকদের উপর রাগ করে লম্বা চুল কেটে বব কাটিং চুল রাখতে শুরু করেছে। হাতের নখ লম্বা রেখে ওরা বাঘ-ভাল্লুক সাজতে চাচ্ছে। তাদের এ অবস্থা দেখে আমরা যেমন ভয় করি, তেমনি মানবজাতির একাংশের পশুজীবনে ফিরে যেতে দেখে মনে দুঃখও পাই।' *(অপসংস্কৃতির বিভীষিকা ২৯পৃঃ)*

এদের নাদুস-নুদুস চেহারা ও ভাব-ভঙ্গিমা দেখে মনে হয়, ওরা যেন কোন আমীরজাদা।

অথচ অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয় যে, 'বাহিরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচোর কিত্তন।' যৌবনের উন্মাদনায় এরা ধরাকে সরাজ্ঞান করে। বেপরোয়া হয়ে বুক ফুলিয়ে চলে, বগলে রেডিও বা টেপ, গাড়িতে টেপ অথবা বাড়িতে টেপ, রেডিও বা টিভির শব্দে পার্শ্ববর্তী লোকদের ঘুম ও ইবাদত নষ্ট করে, জ্বালাতনে মন তিক্ত করে। বিড়ি-সিগারেট খায় বড় সাহেবী স্টাইলে। কাউকে কিছু বলতে গেলে মুখের উপরে ধুঁয়ো ছেড়ে লাল চোখে তাকিয়ে শাসিয়ে থাকে! মস্তানীবশে অনেকের উপর অন্যায় স্বেচ্ছাচারিতা চালায়। জোর-যুলুম করে নারীর সতীত্বনাশ, শ্লীলতাহানি, মানী-গুণীর অপমান, কারো জায়গা জবরদখল, চাঁদাবাজি অথবা 'সেলামী' আদায় করে থাকে।

অথচ যুলুম হল কিয়ামতের দিনের অন্ধকার। মযলুমের হৃদয় থেকে বিষ-জ্বালায় যে 'আঃ' বা 'উঃ' শব্দ বের হয়ে আসে, তা যে মস্তানের জন্য সর্বনাশ ডেকে আনে তা হয়তো অনেকেই জানে না। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা মযলুমের বদ্দুআ থেকে সাবধান থেকো- যদিও সে কাফের হয়। কারণ, ঐ দুআ ও আল্লাহর মাঝে কোন অন্তরাল থাকে না।" *(সহীহুল জামে' ২৬৮২ নং)* অর্থাৎ, সেই বদ্দুআ যালেমের হক্কে সত্বর লেগে যায়।

হে মস্তান বন্ধু! যে অহংকার তুমি আজ প্রদর্শন করছ, যে গর্বের সাথে মাটির বুকে চলাফেরা করছ, জানো কি, তা তোমার জন্য পরকালে কত বড় সর্বনাশ ডেকে আনবে? যে হৃদয়ে সরিষা-দানা পরিমাণ অহংকার থাকে, সে হৃদয়ের মানুষ বেহেশ্ত্ যেতে পারবে না। অহংকারবশে যে সত্য প্রত্যাখ্যান এবং মানুষকে ঘৃণা করে, তাকে সাজা ভুগতে হবে দোযখে। *(আহমাদ, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৭৬৭৪ নং)*

যে মানুষ অহংকারবশে পরনের কাপড় গাঁটের নীচে ঝুলিয়ে পরে মাটিতে ছেঁচড়ে নিয়ে বেড়ায়, আল্লাহ তাআলা কাল কিয়ামতের দিন সে মানুষের দিকে তাকিয়েও দেখবেন না, তার সহিত কথাও বলবেন না, তাকে গোনাহমুক্ত বা ক্ষমাও করবেন না। আর তার জন্য হবে কঠিন শাস্তি। *(মুসলিম ১০৬নং, আসহাবে সুনান)*

হে বন্ধু! উপদেশ গ্রহণ কর,"(অহংকারবশে) মানুষের প্রতি বিমুখ হয়ো না, (কাউকে অবজ্ঞা করো না) এবং পৃথিবীতে গর্বভরে চলো না। কেন না, আল্লাহ গর্বিত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।" *(সূরা লুকমান ১৮ আয়াত)*

হ্যাঁ, তোমার মস্তানীর ফলে কিছু লোক হয়তো তোমাকে বাহাদুরী দেবে। কিছু লোক দেবে সম্মান। কিন্তু তা কি তাদের অন্তর থেকে? না কি তোমার অনিষ্টের ভয়ে? 'দুশমনকে উঁচু পিঁড়ে' দেওয়ার মত লোক তোমাকেও সম্মান করে না কি? যদি তাই হয় তাহলে শোন, প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক তারা, যাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য তাদের তোয়ায করা হয়।" *(আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ৭৯২৩ নং)*

আর "আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক কঠোর-হৃদয় দাম্ভিককে ঘৃণা করেন; যে বাজারে হৈ-হাল্লা ও গলাবাজি করে বেড়ায়, যে রাত্রে মড়ার মত ঘুমায় এবং দিনে গাধার মত মেহনত করে, যে পার্থিব জ্ঞান রাখে, কিন্তু পরকাল বিষয়ে অজ্ঞ থাকে।" *(বাইহাকী ১০/১৯৪, সহীহুল জামে' ১৮৭৮ নং)*

"শ্রেষ্ঠ তো সেই ব্যক্তি, যে তার আখলাক-চরিত্রে শ্রেষ্ঠ।" *(ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহুল জামে' ১১২৮ নং)*

"শ্রেষ্ঠ মানুষ হল সেই ব্যক্তি, যে অপরের সাথে মিশতে পারে এবং অপরেও তার সাথে

মিশতে পারে।" *(সহীহুল জামে' ১২৩১ নং)* অতএব তুমি কি চাও না সেইরূপ শ্রেষ্ঠ মানুষ হতে?

এক বন্ধু বলল, 'হুযুর! আমি মনে করি, আমরা অন্যায় করি না। অন্যায়ের প্রতিবাদ করি। জানেন না, লোহা দিয়ে লোহা কাটে? আমরা পড়ে থাকা ঋণ আদায় করে দিই, উপেক্ষিতা নারীকে তার স্বামীর ঘরে বসিয়ে দিয়ে আসি; স্বামী তাকেই নিয়ে সংসার করতে বাধ্য হয়। জোর করে চাঁদা নিই ঠিকই, কিন্তু সেই টাকা দিয়ে অনেক গরীবদের খিদমত করি। বিধবাদের দেখাশোনা করি, গরীব মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিই। ---' ইত্যাদি।

আমি বললাম, 'কিন্তু বন্ধু! পেশাব দিয়ে পায়খানা ধুয়ে লাভ কি? পায়খানার গন্ধ গেলেও পেশাবের দুর্গন্ধ ও নাপাকী তো আর কম নয়। উল্লেখিত ভালো কাজগুলোর জন্য যাকাত ও দান-খয়রাতের অর্থ আদায় করে ফান্ড্ তৈরী কর।'

বলল, হুযুর! লোকে যাকাত দিলে ও দান-খয়রাত করলে কি আর আমাদেরকে মস্তানী করতে হত? সমাজই তো মস্তান তৈরী করে। পরিস্থিতির চাপে পড়েই অনেকে চোর-গুন্ডা-বদমাশ হয়।'

বললাম, 'যা অন্যায় তা অন্যায়। কোনও সৎ উদ্দেশ্যে অন্যায় করা যেতে পারে না। যদিও বহু মস্তান অনুরূপ সৎ উদ্দেশ্য প্রকাশ করে অধিকাংশে নিজেদেরই প্রবৃত্তি-পূজা করে থাকে।'

অতএব হে যৌবনমদে মত্ত মস্তান ভাই আমার! অসংযত চরিত্রকে সংযত করে মস্তানি ছাড়, যাতে পরে পস্তানি না হয়। উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র ও দৈহিক বলের জোরে পাড়ায় পাড়ায় সরদারি করার নামে উপদ্রব ও যুলুম করে বেড়ায়ো না। কারণ, জেনে রেখো যে, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর পাকড়াও বড় শক্ত। যখন ধরা খাবে, তখন জান ছুটানো দায় হয়ে পড়বে। একথা সুনিশ্চিত।

হে 'প্রাণ-চঞ্চল প্রাচী-র তরুণ, কর্মবীর!' পরোপকারে ব্রতী হও, তবে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে। কর্ম-বিমুখ হয়ে 'পরের ধনে পোদ্দারি' বা সর্দারি করে নয়।

হে 'বল্গাহীন শৃঙ্খল-ছেঁড়া প্রিয় তরুণ!' তুমি তোমার জীবনে শৃঙ্খলতা ফিরিয়ে এনে চেষ্টা কর, যাতে সমাজে খুন, ধর্ষণ, দুর্নীতি, অরাজকতা প্রভৃতির যুলুমবাজির সকল দরজা যেন চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়। যেন বন্ধ হয়ে যায় দখলতন্ত্র বা 'লাঠি যার, মাটি তার'-এর নীতি।

হে 'অভয়-চিত্ত ভাবনা-মুক্ত' যুবক বন্ধু আমার! শান্তি ও শৃঙ্খলা কোথায় আছে জানো? শান্তি আছে সত্য বিশ্বাসে। শৃঙ্খলা আছে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণে ও তাঁর আনুগত্যে। শান্তির ধর্ম ইসলামের ছায়াতলে। দ্বীনের আশ্রয় নাও, তোমার সকল সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে যাবে। সমাজের আকাশ থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নেবে পাপ-ঝড়ে বয়ে আনা অশান্তির বজ্রবাহী কালো মেঘ।

অন্ধানুকরণের কথা ছাড়ার পূর্বে নায়িকাদের দেখাদেখি সাজা মস্তান যুবতীদের কথা আর না বলে পারছি না।

এ কথা বিদিত যে, ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা অধিক অনুকরণ-প্রিয়। একটা মডেল বা ফ্যাশন বাজারে নামলে তা ধরার জন্য ধৈর্য হারিয়ে ফেলে মেয়েরা। বিশেষ করে আধুনিকারা অনুকরণ করে তথাকথিত প্রগতিবাদিনীদের; অর্থাৎ, যাদের নৈতিকতার গতি নিয়ন্ত্রণের

বাইরে তাদের। অনুকরণ করে যৌন-স্বাধীনতাকামীদের; অর্থাৎ, যারা উপচীয়মান যৌবনকে কেবল এক জনের অধীন করে রাখে না তাদের। তাই তো এমন যুবতীর কেশবিন্যাস সাধনার মত সাধনা কাটের অথবা বাবরের মত বাবরী কাটের। মালবিকার ন্যায় সিঁথিতে সিন্দুর, বিন্দিয়ার ন্যায় কপালে টিপ, কানে লম্বা বা রথের চাকার মত বড় দুল, কোন অভিনেত্রীর মত কপালের ভ্রূ চিকন করে চাঁছা, এ ছাড়া চোখের জন্য, চোখের পাতার জন্য, গালের জন্য, ঠোঁটের জন্য পৃথক পৃথক 'মেকআপ' তো আছেই। পরনে আছে 'ইউ' বা 'ভি' কাটিং-এর নক্‌শা করা খাটো ব্লাউজ। পাতলা শাড়ির কোঁচার থাক গোঁজা আছে নাভির নীচে। বুকের আঁচল খানাও বেশ থাক করে সুবিন্যস্তরূপে লম্বালম্বি বাম কাঁধে চাপানো আছে; যাতে সাইড থেকে বুকে-পেটে-পিঠে হাওয়া ও আলো পায় এবং ব্লাউজের 'কাম' দেখিয়ে 'চেংড়া'দের মনে কাম সৃষ্টি করা যায়।

অথবা পরিধানে আছে আধুনিক কাটিং-এর শেলোয়ার-কামিস। ওড়না খানা 'ফর শো' বুকে থাকানো আছে।

আর এর চাইতে বেশী আলোকপ্রাপ্তা হলে উপর দিকে থাকে আধুনিক টাইট-ফিট অর্ধ বুক খোলা গেঞ্জি অথবা ব্লাউজ এবং নীচের দিকে চোস্ত্‌ প্যান্ট্‌ অথবা সংকীর্ণ স্কার্ট; যা হাঁটু অবধি খোলা। তার পরেও পিছন দিক হতে ইঞ্চি তিনেক কাটা!

পক্ষান্তরে আরো অত্যাধুনিকা হলে পরে সিন্থিয়ার মত বগল-কাটা ব্লাউজ অথবা গেঞ্জি!

হাতের আঙ্গুলগুলোতে আছে হ্যালেনের মত লম্বা-লম্বা নখ, তার উপর পুরু নখ-পালিশ। পায়ে আছে উঁচু পেনসিল-হিল জুতো।

এরপর চুলে আছে শ্যাম্পুর সুগন্ধ, গালে আছে ক্রিমের সুবাস, গলায় ও বুকে আছে পাওডারের সুঘ্রাণ, আর লেবাসে তো পারফিউম স্প্রে করা আছেই। অতঃপর কাঁধে একটি ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে বাড়ির খাঁচা থেকে যখন বের হয়, তখন কি জানি কোন কাজে যায়, নাকি কারো বাসরে?

পক্ষান্তরে বিভিন্ন বাহারের অঙ্গসজ্জা করে আবেদনময়ী মস্তানা চলন ও অঙ্গভঙ্গি চুম্বকের আকর্ষণে পুরুষের দৃষ্টি ও মন লোহা যে আকৃষ্ট হবে, তা বলাই বাহুল্য। ফুল বর্ষণ হবে যৌন-দৃষ্টি ও কুমন্তব্যের। অবশ্য এমন প্রসাধিকার এটাই তো আকাঙ্খা, এটাই তো লাভ। প্রগতির ঘোড়ায় চড়ে এরা চায় ভাব দেখিয়ে 'লাভ' করতে। যৌন আবেদন থাকে এদের চেহারা ও চরিত্রে, চলনে ও বলনে, আচরণ ও চাহনিতে, পোশাকে ও প্রসাধনে, ভাবে ও ভঙ্গিতে। এখানেই ঘায়েল হয়ে যায় বহু যুবক অথবা ঘায়েল হয় বহু এমন প্রসাধিকা আধুনিকারা। শুরু হয় প্রেম অথবা ঘটে যায় ধর্ষণ ও বলাৎকার।

আলোকপ্রাপ্তা যুবতীদের ছ্যাবলা পোশাক ও চাঞ্চল্য-ভরা আকর্ষণময় চলন নজরে পড়লে প্রিয় নবী ﷺ এর এক নবুয়ত-বাণী মনে পড়ে যায়; তিনি বলেন, "যদি তোমার লজ্জা না থাকে, তাহলে যা মন তাই করতে পার।" *(আহমাদ, বুখারী, আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ২২৩০ নং)* অর্থাৎ, কেবল নির্লজ্জরাই এমন বেহায়ামী প্রদর্শন করতে পারে।

এ ক্ষেত্রে এমন নারীদের জন্য আরো কয়েকটি মহাবাণী উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গের ইতি টানব। মহানবী ﷺ বলেন, 'প্রত্যেক চক্ষুই ব্যভিচার করে থাকে। আর মহিলা যদি (কোন

প্রকার) সুগন্ধ ব্যবহার করে কোন (পুরুষদের) মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, তবে সে বেশ্যা মেয়ে।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ প্রমুখ, সহীহুল জামে' ৪৫৪০ নং)*

তিনি বলেন, "দুই শ্রেণীর মানুষ দোযখবাসী হবে, যাদেরকে এখনো আমি দেখিনি। এদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ হল, সেই মহিলা দল; যারা কাপড় পরা সত্ত্বেও যেন উলঙ্গ থাকবে, এরা (পরপুরুষকে নিজেদের প্রতি) আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও (তাদের প্রতি) আকৃষ্ট হবে। (চুলের খোঁপার কারণে) তাদের মাথা হবে হিলে যাওয়া উটের কুঁজের মত। তারা বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না এবং তার সুগন্ধ পর্যন্তও পাবে না; অথচ তার সুগন্ধ বহু বহু দূরবর্তী স্থান থেকে পাওয়া যাবে।" *(মুসলিম ২১২৮ নং)*

তিনি বলেন, "তোমাদের সবচাইতে জঘন্যতম নারী হল তারা, যারা বেপর্দা, যারা অহংকারের সাথে অন্যের অনুকরণে নিজেদের অঙ্গসজ্জা ও বহুরূপ প্রদর্শন করে থাকে। ওরাই হল কপট নারী। এদের মধ্যে কিঞ্চিৎই কেউ বেহেশ্তে যেতে পারবে।" *(বাইহাকী ৭/৮২, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৮৪৯ নং)*

আর বন্য-সুন্দরী বাঘিনীদের উদ্দেশ্যে বলি যে, লম্বা নখ রাখা মানব-প্রকৃতির বিরোধী কর্ম। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "পাঁচটি কর্ম হল মানব প্রকৃতির স্বভাব-সুলভ কর্ম; খতনা করা, লজ্জাস্থানের লোম চেঁছে ফেলা, মোছ ছেঁটে ফেলা, নখ কেটে ফেলা এবং বগলের লোম দূর করা।" *(বুখারী, মুসলিম, প্রভৃতি, সহীহুল জামে' ৩২৫০ নং)*

"আল্লাহর রসূল ﷺ মোছ ছাঁটা, নখ কাটা, বগলের লোম তুলে ফেলা এবং গুপ্তাঙ্গের লোম চেঁছে ফেলার ব্যাপারে সময় নির্ধারিত করেছেন; যাতে ৪০ দিনের বেশী সময় তা রেখে না দেওয়া হয়।" *(আহমাদ ৩/১২২, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)*

আর পরিবারের মুরব্বী ও বাড়ির গুরুজন তথা অভিভাবকদেরকে মহানবী ﷺ এর এক মহাবাণী স্মরণ করিয়ে দিই। তিনি বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তির নিকট থেকে তার দায়িত্ব বিষয়ে (কিয়ামতে) কৈফিয়ত নেবেন; সে কি তা যথার্থ পালন করেছে, নাকি অবহেলা করে দায়িত্বে দেওয়া জিনিসকে নষ্ট করেছে? এমন কি পুরুষকে তার পরিবারের সকল সদস্যের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।" *(নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ১৭৭৪ নং)*

যুবক ও বন্ধুত্ব

জীবন এক অচিন্ দেশের সফর। আর অজানা পথের সফরে বিভিন্ন নদী-উপত্যকা, মরু-পর্বত, সমুদ্র-জঙ্গল পার হয়ে ফিরে যেতে হবে আপন দেশ বেহেশ্তে। যে সফর এক দিনের নয়, এক মাসের নয়, নয় এক বা কয়েক বছরের। জীবন ভরের এই সফর সহজও নয়। কত সমস্যা, কত বাধা-বিঘ্ন, কত বিপদ-আপদ এসে উপস্থিত হয় এই লম্বা সফরের দ্বারপ্রান্তে। সুতরাং এ সফরের জন্য যেমন গাইড-বুক ও মানচিত্র চাই, তেমনি চাই মনের মত সহায়ক সঙ্গীও।

মুসলিম মুসাফিরের গাইড-বুক হল আল-কুরআন, মানচিত্র হল মহানবীর আদর্শ, তরীকা বা সুন্নাহ। আর সহায়ক সঙ্গী হল আদর্শ স্ত্রী ও বন্ধু।

কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করার জীবন-সন্ধিক্ষণে এবং বিবাহের পূর্বেও সেই সঙ্গী ও বন্ধুর খোঁজ থাকাটা প্রায় মানুষেরই প্রকৃতিগত ব্যাপার। মানুষ যার পাশে বসে, যার সঙ্গে চলা-ফিরা করে মনে আনন্দ পায়। ভারী কথা তার নিকট বলে মনের বোঝ হাল্কা করে। নিঃসঙ্গতার অন্ধকারে ডুবে থাকা হৃদয়ে সঙ্গতার আলো জ্বালিয়ে জীবনের বিভিন্ন সুখ ও সঙ্কট মুহূর্তে সহায়ক সাথী ও হিতাকাঙ্খী পরামর্শদাতার উৎসাহদান ও অনুপ্রেরণা পায়।

আর বলাই বাহুল্য যে, মনের মত সঙ্গীর সাথে কথা বলে যে আনন্দ পাওয়া যায়, সে আনন্দ আর অন্য কিছুতে পাওয়া যায় না। অন্য দিকে যার প্রকৃত বন্ধু আছে, তার সকল ত্রুটি দেখার জন্য আর দর্পণের প্রয়োজন হয় না।

অবশ্য এমন লোকও বহু আছে, যাদের 'চুন খেয়ে গাল তেঁতেছে, ফলে দই দেখেও ভয় পায়।' অর্থাৎ, বন্ধুত্বের বাজারে ঠকে বা কাউকে ঠকতে দেখে একাকী থাকতে পছন্দ করে এবং মোটেই কোন মানুষের সঙ্গে মিশতে চায় না। ফলে মাথা ব্যথা করলে তা সারার চেষ্টা না করে, মাথাটাই কেটে ফেলার ফায়সালা করে নেয়। অথচ মহানবী ﷺ বলেন, "যে মু'মিন মানুষের মাঝে মিশে তাদের কষ্টদানে ধৈর্যধারণ করে সেই মু'মিন ঐ মু'মিন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে লোকেদের সাথে মিশে না এবং তাদের কষ্টদানে ধৈর্যধারণ করে না।" *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৬৬৫১ নং)*

অন্য দিকে আর এক শ্রেণীর তরুণ ও যুবক আছে, যারা বন্ধুত্বে অতিরঞ্জন করে। ফলে ধোকা খেতে হয় তাকে। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, 'লোকেদের সাথে না মিশলে শত্রুতার উদ্ভব হয়। পক্ষান্তরে অধিকভাবে (অনেকের সঙ্গে) মিশলে অসৎ সঙ্গীও প্রশ্রয় পায়। অতএব তুমি এ দুয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন কর।'

বন্ধুত্ব করা উচিত। তবে তা কোন পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে নয়। বন্ধুত্ব হতে হবে আল্লাহর ওয়াস্তে। অর্থাৎ, একজনকে ভালোবাসবে শুধু এই জন্য যে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন, অথবা তাকে ভালোবাসলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ সম্ভব হবে, অথবা তার সহিত বন্ধুত্ব রাখলে আল্লাহ ও তাঁর দ্বীন বিষয়ে বহু কিছু জানা যাবে, অথবা তার সংসর্গে আল্লাহর ইবাদত সঠিক ও সহজ হবে, অথবা তার পরিবেশে মিশে ইসলামী পরিবেশ গড়া

সহজ হবে। এই উদ্দেশ্যই হল বন্ধুত্ব করার মহান উদ্দেশ্য। এমন সৎ উদ্দেশ্যের রয়েছে বিশাল মর্যাদা।

আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব কায়েম করার মাঝে ঈমানের পরিপূর্ণতা, মিষ্টতা ও প্রকৃত স্বাদ রয়েছে। মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ভালোবাসে, আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ঘৃণাবাসে, আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু দান করে এবং আল্লাহর ওয়াস্তেই কিছু দান করা হতে বিরত থাকে, সে ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অধিকারী।" *(সহীহ আবু দাউদ ৩৯১০ নং)*

"তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে, সে ঈমানের মিষ্টতা লাভ করেছে; সকল বিষয়, বস্তু ও ব্যক্তির চাইতে আল্লাহ ও তদীয় রসূলকে অধিক ভালোবাসা, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই কাউকে ভালোবাসা এবং আল্লাহ কুফরী থেকে রক্ষা করার পর পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ করা, যেমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করা হয়।" *(বুখারী ১৬, মুসলিম ৪৩ নং)*

"যে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেতে পছন্দ করে, সে ব্যক্তি কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যেই অপরকে ভালোবাসুক।" *(আহমাদ, বাযযার, সহীহুল জামে' ৫৯৫৮ নং)*

"সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ সেদিন তাঁর আরশের ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর ঐ ছায়া ছাড়া আর অন্য কোন ছায়া থাকবে না; তন্মধ্যে সেই দুই ব্যক্তি, যারা আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং এই বন্ধুত্বের উপরেই তারা মিলিত হয় ও তারই উপর চিরবিচ্ছিন্ন (পরলোকগত) হয়।" *(বুখারী ৬৬০, মুসলিম ১০৩১ নং)*

"আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমার উদ্দেশ্যে আপোসে বন্ধুত্ব স্থাপনকারীদের জন্য আমার ভালোবাসা সুনিশ্চিত। আমার উদ্দেশ্যে আপোসে উপবেশনকারীদের জন্য আমার ভালোবাসা সুনিশ্চিত। আমার উদ্দেশ্যে আপোসে যিয়ারতকারীদের জন্য আমার ভালোবাসা সুনিশ্চিত এবং আমার উদ্দেশ্যে আপোসে খরচকারীদের জন্যও আমার ভালোবাসা সুনিশ্চিত।" *(আহমাদ ৫/২৩৩, মুঅত্তা ১৭৭৯, ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহুল জামে' ৪৩৩১ নং)*

"কিছু লোক আছে যারা নবী নয়, শহীদও নয়। অথচ নবী ও শহীদগণ আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা দেখে ঈর্ষা করবেন। আর ঐ লোক হল তারা, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আপোসে বন্ধুত্ব কায়েম করে; যাদের মাঝে কোন আত্মীয়তার বন্ধন থাকে না এবং থাকে না কোন অর্থের লেনদেন। আল্লাহর কসম! তাদের মুখমন্ডল হবে জ্যোতির্ময়। তারা নূরের মাঝে অবস্থান করবে। লোকেরা যখন ভীত-সন্ত্রস্ত হবে তখন তারা কোন ভয় পাবে না এবং লোকেরা যখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে তখন তাদের কোন দুশ্চিন্তা থাকবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সতর্ক হও! নিশ্চয় যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের কোন ভয় নেই। তারা দুঃখিতও হবে না। যারা মুমিন এবং পরহেযগার। তাদের জন্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে রয়েছে সুসংবাদ। আল্লাহর বাক্যাবলীর কোন পরিবর্তন নেই। এটাই হল মহাসাফল্য।" *(সূরা ইউনুস ৬২-৬৪ আয়াত, সহীহ আবু দাউদ ৩০১২ নং)*

"আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমার মর্যাদার ওয়াস্তে যারা আপোসে ভালোবাসা স্থাপন করবে, তাদের জন্য হবে নূরের মেম্বর; যা দেখে নবী ও শহীদগণ ঈর্ষা করবে।" *(সহীহ তিরমিযী ১৯৪৮, আহমাদ ২১৫৭৫ নং)*

"ঈমানের সবচাইতে মজবুত হাতল হল, আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব স্থাপন করা, আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা স্থাপন করা, আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসা রাখা এবং আল্লাহরই ওয়াস্তে ঘৃণা পোষণ করা।" *(ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৭২৮ নং)*

"এক ব্যক্তি অন্য এক বস্তিতে তার এক (দ্বীনী) ভায়ের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হল। আল্লাহ তাআলা তার গমন-পথে একজন অপেক্ষমাণ ফিরিশ্তা বসিয়ে দিলেন। (লোকটি সেখানে পৌঁছলে) ফিরিশ্তা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা রাখ?' সে বলল, 'ঐ গ্রামে আমার এক ভাই আছে, তার সাক্ষাতে যাওয়ার ইচ্ছা রাখি।' ফিরিশ্তা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তার কাছে তোমার কোন সম্পদ আছে কি, যার দেখাশোনা করার জন্য তুমি যাচ্ছ?' সে বলল, 'না, আমি তাকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ভালোবাসি, তাই যাচ্ছি।' ফিরিশ্তা বললেন, 'আমি আল্লাহর নিকট হতে তোমার কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি যে, আল্লাহ তোমাকে অনুরূপ ভালোবাসেন, যেরূপ তুমি তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাকে ভালোবাস।" *(মুসলিম, মিশকাত ৫০০৭ নং)*

"যখন দুই ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে আপোসে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, তখন তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয় সেই ব্যক্তি, যে অপরকে অধিক গাঢ়ভাবে ভালোবাসে।" *(সহীহুল জামে' ৫৫৯৪ নং)*

হে যুবক বন্ধু! ভেবে দেখ, তোমার বন্ধুর সাথে যে বন্ধুত্ব রয়েছে, তা কোন স্বার্থলাভ, অর্থ লাভের জন্য তো নয়? তুমি যাকে ভালোবাস, সে ভালোবাসা তার রূপ ও সৌন্দর্যের জন্য তো নয়? তার খেলা, অভিনয় বা গান ভালো লাগে তাই তাকে ভালোবাস- এমন তো নয়? কোন রাজনৈতিক দল বা মতের ভিত্তিতে তো নয় তোমার প্রেম? তেমন কিছু হলে সে বন্ধুত্ব, সে ভালোবাসা ও প্রেম, সে মহব্বত ও প্রীতির কোন মূল্য নেই।

আল্লাহর ওয়াস্তে ও দ্বীনের স্বার্থে যে প্রেম, সে প্রেম অনির্বাণ, চিরকালীন। এমন প্রেমেরই দুই প্রেমিক ছায়াহীন কিয়ামতের দিনে আল্লাহর বিশেষ ছায়া লাভ করবে। এমন মহব্বত ও দোস্তী সেই ভীষণ কিয়ামতের দিনেও অক্ষত থাকবে, "যেদিন কোন বন্ধু কোন বন্ধুকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেনা।" *(সূরা মাআরিজ ১০ আয়াত)* সেদিন বন্ধুরা এক অপরের শত্রু হয়ে পড়বে। তবে পরহেযগাররা নয়।" *(সূরা যুখরুফ ৬৭ আয়াত)* তাদের বন্ধুত্বের বন্ধন বিচ্ছিন্ন হবে না।

কে তোমার বন্ধু? কাকে তুমি বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নিজের হৃদয়ের কোণে আসন দিয়েছ? কার নিকট তুমি তোমার জীবনের সকল রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছ? -তা ভেবে দেখেছ কি?

এ বিষয়ে আমাদের প্রিয় নবী ﷺ আমাদেরকে সতর্ক করে বলেছেন যে, "মানুষ তার বন্ধুর আদর্শে গড়ে ওঠে। অতএব তোমাদের প্রত্যেকের বিবেচনা করে দেখা উচিত যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব কায়েম করছে।" *(তিরমিযী ২৩৭৮ নং)*

বন্ধু বন্ধুর কথা মত চলে, তার চরিত্র মত গড়ে ওঠে। দু'টি মনের অপূর্ব মিল হলে তবেই বন্ধুত্বের খাতির সহজে জমে ওঠে। এমন না হলে উভয়ের মধ্যে একজন প্রভাবশালী হয় এবং অপর জন হয় প্রভাবান্বিত। অতএব এ ক্ষেত্রে এমন সাথী নির্বাচন করা উচিত, যাতে বন্ধুত্বের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ না হয়।

তাছাড়া আর একটা কথা এই যে, "আত্মাসমূহ সমবেত সৈন্যদলের মত। সুতরাং

আপোসে যে আত্মাদল পরিচিত ও অভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মাদলের মাঝে মিলন ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে থাকে এবং যে আত্মাদল আপোসে অপরিচিত ও ভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মাদলের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য প্রকট হয়ে ওঠে।" *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, মিশকাত ৫০০৩)*

মক্কায় এক কৌতুকপ্রিয়া মহিলা ছিল। সে যখন মদীনায় এল, তখন এমন এক মহিলার নিকট স্থান নিল, যে ছিল তারই মত কৌতুকপ্রিয়া। এ কথা শুনে মা আয়েশা (রা) উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছিলেন।

এ কথা বাস্তব যে, শুধু মানুষের মাঝেই নয়, পশু-পক্ষীর মাঝেও এমন 'জাতীয়তাবাদ' লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ, যে যে জাতের পাখী, সে সেই জাতের পাখীর দলেই গিয়ে মিশে থাকে, অন্যথা নয়। মালেক বিন দীনার বলেন, একদিন একটি কাককে একটি পায়রার সঙ্গে বসে থাকতে দেখে আমি অবাক হলাম। ভাবলাম, এমন তো হওয়ার কথা নয়, কিন্তু হল কেন? পরক্ষণে দেখা গেল যে, উভয় পাখীই ছিল খোঁড়া। তাই খোঁড়ায়-খোঁড়ায় এক ধরনের মিল থাকার পরিপ্রেক্ষিতেই ঐ দুই জাতের পাখী ভাবের সাথে একত্রে বসেছিল।

মানুষের মাঝেও তাই। সাধারণতঃ যে মানুষ যে গুণ, চরিত্র ও আকৃতির, সে মানুষ ঠিক তারই মত একজন মানুষকে বেছে নিয়ে তার সহিত উঠা-বসা ও বন্ধুত্ব করে। অধিকাংশ মানুষের মাঝেই 'জ্যায়সন কা ত্যায়সন, শুট্‌কী কা ব্যায়গন' এর মত এক আজব মিল ও চমৎকার সুসাদৃশ্য বর্তমান থাকে।

ভাই সঙ্গী-সন্ধানী যুবক! ভালো লোকদের ও দ্বীনদার যুবকদের প্রতি তোমার মন যদি বীতশ্রদ্ধ হয়, তাহলে জেনে রেখো যে, তোমার মাঝে কোন রোগ আছে; হয় ঈমানী রক্ত-স্বল্পতা, নচেৎ সন্দেহের যক্ষ্মা, নতুবা প্রবৃত্তিপূজার রক্তচাপ। সুতরাং বন্ধুত্ব করার পূর্বে এসব রোগ সারিয়ে নিও।

যদি দেখ যে, তোমার মন আকৃষ্ট হচ্ছে এমন সব যুবকদলের প্রতি, যারা আকৃতি ও প্রকৃতিতে প্রায় 'নম্বর ওয়ান হিরো' এবং স্বভাব-চরিত্রে ডবল জিরো, যাদের মাঝে আছে মস্তানী বা নোংরামি, তাহলে জেনে রেখো, তোমার মাঝেও তাদের ঐ রোগ সংক্রমণ করেছে। অতএব তাদের কাউকে বন্ধু করার আগে নিজের পজিশন পরখ করে নিও। আর মনে রেখো যে, দলদলে একবার পা পড়ে গেলে, সেখান থেকে উদ্ধার হয়ে ফিরে আসা মোটেই সহজ নয়।

যদি তুমি মনে মনে গর্বিত হও এই ভেবে যে, তুমিই বড় চরিত্রবান যুবক, তোমার মত সভ্য মানুষ আর কেউ নেই; অতএব তোমার মানের যোগ্য বন্ধু আর কেউ হতে পারে না। তাহলে এ ধারণাকে তুমি মিথ্যা জেনো। তোমার মনের মণিকোঠায় সন্ধান করে দেখো, সেখানে শয়তানের বাসা রয়েছে। সুতরাং সে সময় তুমি 'আঊযু বিল্লাহ' পড়ো।

আর যদি তুমি দেখো যে, তোমার নিজের মাঝে ত্রুটি আছে, কিন্তু ভালো লোককে ভালোবাস, তাদের প্রতি মন আকৃষ্ট হয়, তাদের সহিত উঠতে-বসতে ভালো লাগে, তাহলে ভেবো যে, তোমার মধ্যে কিছু মঙ্গল রয়েছে। সুতরাং সে সময় ঐ মঙ্গলকে যথাযথভাবে প্রতিপালিত কর এবং চেষ্টা কর, যাতে তাদের দলে শামিল হতে পার। বন্ধুত্ব কায়েম কর তাদের সাথে।

বন্ধুত্ব স্থাপন কর বন্ধুর তিনটি জিনিস পরীক্ষা করে। সে পরীক্ষায় পাশ করলে তবেই তাকে বন্ধু বলে নির্বাচন কর, নচেৎ না।

১- প্রথমতঃ বন্ধুর জ্ঞান কত, তা বিচার কর। কারণ, জ্ঞানী বন্ধু এক নেয়ামত। যে নেয়ামত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার। যার নিকট সংকট মুহূর্তে বহু সুপরামর্শ পাওয়া যায়। যে স্পর্শকাতর সময়ে সঠিক পথনির্দেশ করে দুশ্চিন্তা দূর করে দেয়। পড়াশোনার ক্ষেত্রে অধিক ফল লাভ করা সম্ভব হয়। এমন বন্ধুর বন্ধুত্বে ধোকাবাজির ভয় থাকে না, ভয় থাকে না কোথাও অপমানিত হওয়ার। কারণ, জ্ঞান হল আলো; চোখের আলো এবং মনেরও আলো। আর অলোর পথই ভালো। চাহে রাত্রি আসুক অথবা কাঁটা থাকুক পথে, নিশ্চিন্তে গন্তব্য স্থলের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। আর এ জন্যই একজন বিজ্ঞ বন্ধু হল সবচেয়ে বড় নেয়ামত।

জ্ঞানীর সংস্পর্শে থাকলে হৃদয় আবাদ থাকে। জ্ঞানীর পরশে নিজেকেও জ্ঞানী করে তোলা যায়। তা না গেলেও জ্ঞানীর সাথে সম্পর্ক কায়েমে মানুষের সুনাম লাভ হয় -যদিও সে সুনামের যথার্থ অধিকারী নয়। আব্দুল্লাহ বিন ত্বাউস বলেন, একদা আমাকে আমার আব্বা বললেন, 'বেটা! জ্ঞানীদের সাহচর্য গ্রহণ কর। তাদের প্রতি তোমাকে সম্পৃক্ত করা হবে - যদিও প্রকৃতপক্ষে তুমি তাদের দলভুক্ত নও (এবং নিজে তাদের মত জ্ঞানী না হও)। আর মূর্খদের সাহচর্য গ্রহণ করো না। কারণ, তাদের প্রতি তোমাকে সম্পৃক্ত করা হবে, যদিচও আসলে তুমি তাদের দলভুক্ত নও (এবং তুমি নিজে মূর্খ না হও)। আর জেনে রেখো, প্রত্যেক জিনিসের একটা শেষ সীমা আছে। মানুষের বাসনার শেষ সীমা হল সুজ্ঞান লাভ।' *(অফিয়াতুল আ'ইয়ান ২/৫১১)*

২- বন্ধু দ্বীনদার কি না, তা দেখ। কারণ, দ্বীন হল মানুষের এমন সম্পদ, যা মানুষকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর করে গড়ে তোলে। দ্বীন দেয় জ্ঞান, মন ও দেহের খোরাক। দ্বীন হল সেই প্রতিষেধক মহৌষধ, যার ব্যবহার অন্তরের ব্যাধি দূর করে, দূর করে মনের কালিমা, প্রতিহত করে সকল অন্যায় ও অসৎ-আচরণকে। দ্বীন রক্ষা করে আল্লাহর গযব ও দোযখের আযাব থেকে।

যে ব্যক্তির দ্বীন নেই সে মৃত। বেদ্বীন মানুষের জীবনে কোন সুপরিকল্পিত আশা নেই। উদ্দেশ্যহীন জীবন-পথে কোন নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল নেই। তাই তার উপর কোন আস্থা নেই, নেই কোন ভরসা। বেদ্বীন মানুষ নিজেরই দুশমন। সুতরাং সে কিরূপে -বিশেষ করে দ্বীনদারের- দোস্ত্ হতে পারে? যে তার প্রতিপালককে ভালোবাসে না, সে কি তোমাকে ভালোবাসবে? তার ভালোবাসায় কি কোন ভরসা আছে? যে মহাপরাক্রমশালী বাদশা আল্লাহর ফরয আদায়ে গরয দেখায়, সে তোমার ভালোবাসার কর্জ কিভাবে আদায় করবে?

অতএব জেনে রেখো যে, 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, আর অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।' দ্বীনদার, পরহেযগার বন্ধুই তোমার বেহেশ্তী পথের সঙ্গী। সেই তোমাকে সহায়তা করতে পারে মহাসাফল্যের জন্য। তাই তুমি দ্বীনদার বন্ধুই গ্রহণ কর। গরীব হলেও তাকেই তুমি অন্তরঙ্গ সাথী হিসাবে নির্বাচন কর। মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ কে সম্বোধন করে এই আদেশ করেন যে, "তুমি নিজেকে তাদের সংসর্গে রাখবে, যারা সকাল-সন্ধ্যায় নিজেদের প্রতিপালককে আহ্বান করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য, আর পার্থিব জীবনের সুখ-সৌন্দর্য কামনা করে তাদের

হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিও না। পক্ষান্তরে তার অনুসরণ করো না, যার হৃদয়কে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করেছি, যে তার আপন খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে যায়।” *(সূরা কাহফ ২৮ আয়াত)*

আর প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “তুমি মু'মিন ব্যতীত আর কারো সাহচর্য গ্রহণ করো না এবং পরহেযগার মানুষ ছাড়া তোমার খাবার যেন অন্য কেউ না খায়।” *(আহমাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহুল জামে' ৭৩৪১ নং)*

৩- কারো সহিত বন্ধুত্ব গড়ার পূর্বে তার চরিত্র বিচার করে দেখো। কারণ, মানুষের জন্য সৎচরিত্রতা এক অমূল্য ধন। যার চরিত্র নেই, যে চরিত্রহীন, সে নিঃস্ব। সে মানুষ বাহ্যিকভাবে যতই সুন্দর ও সভ্য হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে সে অন্তঃসারশূন্য।

চরিত্রবান্ মানুষের এক প্রভাব আছে; যার মাধ্যমে সে অপরকে চরিত্রবান্ করতে পারে। তদনুরূপ দুশ্চরিত্রেরও প্রভাব কম নয়। সেও অপরকে চরিত্রহীন করতে অবশ্যই দ্বিধা করে না। সুতরাং ওঠা-বসা করার সময় এ খেয়াল অবশ্যই রাখতে হবে, যাতে যুবকের চরিত্র নষ্ট না হয়ে যায়।

মহান চরিত্রের উচ্চতম স্তরে অধিষ্ঠিত নবী ﷺ সৎ ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ পেশ করে বলেন, “সৎ ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হল আতর-ওয়ালা ও কামারের মত। আতর-ওয়ালা তোমাকে তার আতর উপহার দেবে, নতুবা তুমি তার নিকট থেকে আতর ক্রয় করবে, নচেৎ এমনিতেই তার নিকট থেকে সুবাস পাবে। আর কামার, হয় তোমার কাপড় পুড়িয়ে ফেলবে, না হয় তুমি তার নিকট থেকে পাবে দুর্গন্ধ।” *(বুখারী ২১০১, মুসলিম ২৬২৮ নং)*

আতর-ওয়ালার পাশে বসে মন ও মগজকে যেমন আতরের সুবাসে তাজা করা যায়, তেমনি সৎ সঙ্গীর এমন সদ্‌গুণাবলী আছে যে, তার মাধ্যমে নিজের জীবনকে সুন্দর ও আনন্দময় করা যায়। সৎ সঙ্গী তোমাকে এমন শিক্ষা দেবে, যা তোমার দ্বীন অথবা দুনিয়া অথবা উভয় ক্ষেত্রে যথার্থ কাজে আসবে। এমন উপদেশ ও পরামর্শ দেবে, যার মাধ্যমে তুমি তোমার জীবনে এবং মরণের পরেও উপকৃত হবে। এমন কাজের আদেশ করবে, যা করলে তোমার লাভ আছে এবং এমন কাজ হতে তোমাকে বিরত রাখবে, যে কাজে তোমার ক্ষতি ও নোকসান আছে। এমন বন্ধুর সাথে বন্ধুত্ব করার লাভ সুনিশ্চিত। যে বন্ধু তোমাকে গড়ে নেবে, তোমার ত্রুটি গোপন ও সংশোধন করবে, আল্লাহর আনুগত্যে সর্বদা উদ্বুদ্ধ করবে, পাপ কাজে বাধা দান করবে, তোমার ও তোমার ইজ্জত রক্ষা করবে এবং তার নেক দুআয় তুমি তোমার দুনিয়া ও আখেরাতে লাভবান হবে।

পক্ষান্তরে কামারের পাশে বসলে যেমন তার ধুঁয়া, কয়লা বা পুরনো লোহা পোড়ার দুর্গন্ধ, হাতুড়ী পেটার শব্দ এবং আগুনের ফিন্‌কি ও আঙ্গার ইত্যাদি দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তেমনি অসৎ সঙ্গী ও দুরাচার বন্ধুর সংসর্গে থাকে বহুমুখী ক্ষতির আশঙ্কা ও নানাবিধ অমঙ্গল ঘটার সংশয়। কারণ, এমন বন্ধু অসৎ কর্মে উদ্বুদ্ধ করবে, সৎ কাজে বাধা দান করবে, তওবার কাজে অন্তরাল সৃষ্টি করবে, অর্থ ও স্বাস্থ্যের হানি ঘটাবে। বাড়ির ইজ্জত নষ্ট করবে, এমন কি বন্ধুর সর্বস্ব লুটে যাওয়ার প্রয়াস চালাতে কুণ্ঠিত হবে না।

অতএব হে যুবক বন্ধু! হুশিয়ার ও সচেতন থেকো এমন বন্ধুত্ব গড়া থেকে। আর হ্যাঁ,

খেয়াল রেখো তোমার মান ও পজিশনের কথা। অর্থাৎ, বন্ধুর মানে তুমি খাপ খাবে কি না তাও দেখে নিও। ইঁদুর-ওয়ালা হয়ে হাতি-ওয়ালার সাথে তোমার বন্ধুত্ব সাজে না। হাতি রাখার ঘর দিতে না পারলে তুমি তোমার বন্ধুর মন যোগাতে পারবে না, বিধায় তোমার সে বন্ধুত্ব টিকবে না। এমন উচ্চ মানের বন্ধুর বন্ধুত্ব গ্রহণের প্রয়াস চালায়ো না, যার গর্ব ও অহংকারে তুমি কষ্ট পাবে। তদনুরূপ এমন নিম্ন মানের বন্ধুর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করো না, যার মূর্খতায় তোমার মন ব্যথিত হয় অথবা মান-ইজ্জত হারিয়ে যায়। বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ার পূর্বে ঠিক তেমনি করে ভেবে নিও, যেমন ভাব বিবাহ করার পূর্বে। বন্ধু ও স্ত্রীর অনেকটা দিক প্রায় একই। অবশ্য বন্ধু পাল্টানো যায়, কিন্তু স্ত্রী পাল্টানো গেলেও, তা মোটেই সহজ নয়। একবার জোড়া লেগে গেলে চিরদিন উপভোগ করতে হয় তার চরিত্র ও ব্যবহারের মধুরতা, নচেৎ বিষময় তিক্ততা।

অতএব ধোকা খাওয়ার পূর্বে বন্ধুকে পরখ করে নিও এবং তার বাহ্যিক আড়ম্বর ও সুশোভিত ব্যবহার তথা নতুন পরিচয়ের আচমকা-সুন্দর স্বভাব দেখে তাকে বন্ধু বলে লুফে নিও না। এক ব্যক্তি হযরত উমার ﵁ কে কথা প্রসঙ্গে বলল, 'অমুক লোকটা বড় খাঁটি লোক।' তিনি বললেন, '(তা তুমি কি করে জানলে?) ওর সাথে কি কোন সময় সফর করেছ?' লোকটি বলল, 'জী না।' তিনি বললেন, 'তোমার ও তার মাঝে কি কোন দিন তর্ক বা মতবিরোধ হয়েছিল?' লোকটি বলল, 'জী না।' তিনি বললেন, 'ওর কাছে কি কোন দিন কিছু আমানত রেখেছিলে?' লোকটি বলল, 'জী না।' পরিশেষে তিনি বললেন, 'তাহলে ওর সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না। আমার মনে হয় তুমি ওকে কেবল মসজিদে বসে মাথা হিলাতে দেখেছ।' *(উয়ূনুল আখবার ৩/ ১৫৮)*

হ্যাঁ মানুষের সাথে ব্যবহার না করলে মানুষের আসল রূপ ধরা যায় না। আর্থিক লেনদেন, ব্যবসা, ঋণ, প্রতিবেশ, বৈবাহিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের আসল পরিচয় পাওয়া যায়। আর তখনই হয় আসল বন্ধুর অগ্নিপরীক্ষা।

অবশ্য এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, কোন বন্ধু 'কামেল' নয়। কোন না কোন ত্রুটি থাকতেই পারে। তাছাড়া মন সকলের সমান নয়। প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকাটাও অস্বাভাবিক নয়। দু'টি মন যে সম্পূর্ণরূপে একমত হবে, তা প্রায় অসম্ভব। আর তার জন্যই লোকে বলে, 'মনের মত মানুষ পাওয়া দায়।' অতএব ঠিক 'মনের মত' বন্ধু পাওয়া ততটা সহজ নয়।

জনৈক দার্শনিককে জিজ্ঞাসা করা হল যে, 'কোন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী লম্বা সফর করেছে?' দার্শনিক বললেন, 'যে ব্যক্তি একটি বন্ধুর খোঁজে সফর করেছে।'

আর প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমরা কর্তব্যনিষ্ঠ রহ; আর তাতে কখনই পূর্ণরূপে সক্ষম হবে না।" *(ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব ১৯০ নং)*

উক্ত মহাবাণী থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, সম্পূর্ণরূপে নিখুঁতভাবে দ্বীন ও চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং বন্ধুর মাঝে ছোটখাট কিছু ত্রুটি থেকে যাওয়াটা স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক নয়।

প্রিয় নবী ﷺ আরো বলেন যে, "মনুষ্য-সমাজ হল শত উটের মত; যার মধ্যে একটা ভালো সওয়ার-যোগ্য উট খুঁজে পাওয়া মুশকিল।" *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ২৩৩২ নং)*

সুতরাং তুমিও যে একটা মনের সম্পূর্ণ পছন্দমত মানুষ সহজে খুঁজে পাবে না, তা বলাই বাহুল্য। অতএব তারই মধ্যে ভালো যুবক দেখে তুমি তোমার বন্ধুত্বের জীবন গড়ে তোল এবং একেবারে নিখুঁত খোঁজার চেষ্টা করো না, নচেৎ জীবনে কোন বন্ধুই পাবে না। বন্ধুর ছোট-ছোট ভুল চোখ বুজে সয়ে নিও, যথাসম্ভব সংশোধন করে চলো, যথারীতি তার দোষের জন্য ওজর খুঁজে নিও। নচেৎ বন্ধুত্বের বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

পক্ষান্তরে যার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে, সে যদি অসংশোধনীয় ত্রুটিপূর্ণ হয়, তাহলে তার থেকে দূরে থেকো এবং তার গায়ে পড়া বন্ধুত্ব গ্রহণ করো না। কোন ওজুহাতে তার জীবন থেকে সরে পড়। বিশেষ করে মূর্খ ও আহমক বন্ধু মোটেই পছন্দ করো না। কারণ, এমন বন্ধু হল আগুনের মত; তোমাকে জ্বালিয়ে ছাই করে ফেলবে। মূর্খের মূর্খামি যখন মাথায় চড়ে, তখন তা আর কোন আত্মীয়তা, কোন ভালোবাসা অথবা প্রতিবেশ ইত্যাদির হকের খেয়াল রাখে না। সব কিছুকে ভুলে গিয়ে নিজের স্বভাব মত মূর্খামি করেই তৃপ্তি পায় মূর্খ মানুষ। তাতে তার বন্ধুর অপমান হলে সে কি করতে পারে? তার তো স্বাভাবিক আচরণ এটা।

অতএব দুশমন হলেও জ্ঞানীর সাহচর্য গ্রহণ করো, তবুও কোন আহমককে বন্ধু করে তোমার সংসর্গ দিও না। নচেৎ দেখবে, তুমি পস্তাবে।

মহান আল্লাহ তাঁর খাস বান্দাদের বিভিন্ন গুণ বর্ণনার সময় তাদের একটি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, "যখন অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে সম্বোধন করে, তখন তারা বলে, 'সালাম।" *(সূরা ফুরকান ৬৩ আয়াত)* অর্থাৎ, তারা তাদের মূর্খামির সাথে জড়িয়ে না পড়ে তাদেরকে উপেক্ষা করে ও এড়িয়ে চলে।

আহমক বন্ধু অনেক সময় মনের আবেগবশে বন্ধুর উপকার করার নিয়তে এমন কাজ করে বসে, যাতে প্রকৃতপ্রস্তাবে বন্ধুর অপকারই সাধিত হয়। আবার সেই উপকারের কোন প্রশংসা বা বদলা না পেলে সে কথা অপরের কাছে গেয়েও বেড়ায়। ফলে এমন বন্ধুর বন্ধুত্বে ক্ষতি হয় দ্বিগুণ। এমন বন্ধু কখনো 'বাত ভালো করতে গিয়ে কুষ্ঠরোগ সৃষ্টি করে ফেলে। আবার কখনো বা 'সাপ মারতে ছিপ ভেঙ্গে বসে থাকে।' এমন বন্ধু অকারণে রাগ করে, খামাখা আড়ি পাতে ও অভিমান করে, অপ্রয়োজনে কথা বলে, অযথা খরচ করে, প্রত্যেকের উপর আস্থা রাখে এবং অপকারী ও উপকারীর মাঝে পার্থক্য নির্বাচন করতে পারে না। সুতরাং এমন মিত্রের মিত্রতায় যে ঠকতে হবে, তা বলা নিষ্প্রয়োজন। আর এ জন্যই বলা হয় যে, 'তিনটি জিনিস যদিও ঘটে, তবুও সত্বর অপসৃত হয়; মেঘের ছায়া, মিথ্যা সুনাম ও জ্ঞানী-অজ্ঞানীর বন্ধুত্ব।'

খবরদার! কোন অসদাচারীকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। করে ফেললে তাকে সৎপথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কর। সে চেষ্টা ব্যর্থ হলে তার দুনিয়া থেকে দূরে সরে যাও। বেনামাযী, মদ্যপায়ী, ধূমপায়ী, বিদআতী, ব্যভিচারী ও চোরা প্রকৃতির বন্ধুর বন্ধুত্ব গ্রহণ করো না। এমন বন্ধুর সঙ্গ পরিত্যাগ কর, যে দ্বীনদার লোক দেখে নাক সিঁটকায়, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে, কুমন্তব্য করে। আর জেনে রেখো যে, খল বন্ধুর চেয়ে শত্রু অনেক গুণ ভালো।

এমন বন্ধুর বন্ধুত্বের বন্ধন ছিন্ন-ভিন্ন করে দাও, যে পাপ করে তোমার কাছে অথবা কোন বন্ধুমহলে প্রচার করে গর্ব প্রকাশ করে অথবা নির্লজ্জ ধৃষ্টের মত প্রকাশ্যে পাপ করে। 'লারে-

লাপ্পা' করে পাড়া মাতায়, টেপ-রেডিও-টিভির অশ্লীল গান-বাজনা-ছবি প্রকাশ্যে ফুল সাউন্ডে শোনে ও শোনায়, দেখে ও দেখায়। গুপ্ত পাপীর বাঁচার পথ আছে, কিন্তু প্রকাশ্য পাপীর বাঁচার পথ দুর্গম। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "পাপ প্রকাশকারী ছাড়া আমার প্রত্যেক উম্মত ক্ষমার্হ।" *(বুখারী ৬০৬৯, মুসলিম ২৯৯০ নং)*

এমন পাপাচার ও দুরাচার থেকে দূর না হতে পারলে জেনে রেখো, 'সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে।' 'সঙ্গ দোষে কি না হয়? ছুঁচো ছুঁলে গন্ধ হয়।' শারাব খানায় বসলে বা আসা-যাওয়া করলে লোকে তোমাকে শারাবী বলবে; যদিও তুমি শারাব না খাও। তাছাড়া আজ নয় তো কাল শারাবের উগ্র গন্ধ তোমাকেও পাগল করে ফেলবে। অবশেষে তুমিও হয়তো শারাবীতে পরিণত হয়ে যাবে।

অতএব 'দুর্জনেরে পরিহারি, দূরে থেকে সালাম করি' এমন বন্ধুর বন্ধুত্বকে কবর দিয়ে দাও। এমন বন্ধু থেকে শতবার আল্লাহর নিকট পানাহ চাও এবং সে জন্য অর্থ সহ 'কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস' বার বার পাঠ কর।

অসৎ বন্ধুর বন্ধুত্ব গ্রহণ করে কাল কিয়ামতে পস্তাতে হবে। "সেদিন অত্যাচারী নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, 'হায়! আমি যদি রসূলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম! হায়! দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! আমার নিকট উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল। আর শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোকা দেয়।" *(সূরা ফুরকান ২৭-২৯ আয়াত)*

হে মুসলিম যুবক! মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রেখে তাঁকে তুমি ভয় করে থাক। অতএব তোমার প্রিয়তম বন্ধু তিনিই এবং তাঁর বন্ধু তুমি। সুতরাং সে বন্ধুর কোন শত্রু তোমার বন্ধু হতে পারে না। কারণ, প্রকৃতপক্ষে সে তোমারও শত্রু। মহান আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না----।" *(সূরা মুমতাহিনাহ ১ আয়াত)*

তোমার প্রিয়তম সুমহান বন্ধুকে যে বিশ্বাসই করে না, সে তোমার বন্ধু কিরূপে হতে পারে? "হে বিশ্বাসিগণ! বিশ্বাসিগণের পরিবর্তে অবিশ্বাসিগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।" *(সূরা নিসা ১৪৪ আয়াত)*

তোমার শ্বাশত ধর্ম ও অম্লান নৈতিকতাকে যে মানতে চায় না এবং উল্টে তা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে, তাকে তুমি কিরূপে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু করতে পার? "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী সেই গ্রন্থপ্রাপ্ত (ইয়াহুদ ও নাসারা)গণ, যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলার বস্তুরূপে গ্রহণ করেছে, তাদেরকে ও কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। যদি তোমরা ঈমানদার হও, তাহলে আল্লাহকে ভয় কর।" *(সূরা মাইদাহ ৫৭ আয়াত)*

বস্তুতঃ "তুমি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না, যারা আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধাচারীগণকে ভালোবাসে, যদিও সে (বিশ্বাসী) তাদের পিতা অথবা পুত্র, ভ্রাতা অথবা একান্ত আপনজন কেউ হয়----।" *(সূরা মুজাদালাহ ২২ আয়াত)* সুতরাং যে তোমার নিজের কেউ নয়, সে বিরুদ্ধাচারী তোমার ভালোবাসার কোন্ পাত্র?

হ্যাঁ, আর নৈতিকতার খাতিরেই তুমি কোন যুবতীর সহিত বিবাহের পূর্বে কোন প্রকারের

বন্ধুত্ব করতে পার না। বিবাহের পরই সে তোমার পরমা বান্ধবী। আমল এক হলে সে ইহকাল ও পরকালে চিরকাল তোমার চিরসঙ্গিনী হয়ে থাকবে।

জেনে রেখো বন্ধু! আজ যাকে তুমি ভালোবাসবে কাল কিয়ামতের বিভীষিকাময় দিনে তারই সঙ্গে অবস্থান করতে হবে। যদি কোন খেলোয়াড়কে ভালোবাস, তাহলে সেই খেলোয়াড়ের সাথে, যদি কোন শিল্পী বা হিরোকে ভালোবাস, তাহলে সেই শিল্পী বা হিরোর সাথে, যদি কোন দ্বীনদার লোককে ভালোবাস, তাহলে সেই দ্বীনদার লোকের সাথে এবং কোন কাফেরকে ভালোবেসে থাকলে, সেই কাফেরের সাথে তোমার হাশর হবে। আর সেখানে তাদের যে অবস্থা হবে, তোমারও অবস্থা হবে অনুরূপ। সুতরাং বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা গড়ার সময় সে কথাও মনে রেখো। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "মানুষ যাকে ভালোবাসবে (কিয়ামতের দিন) সে তারই সাথে অবস্থান করবে।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৫০০৮ নং)*

যুবক বন্ধু! এবারে তোমাকে সেই কথাই বলি, যে কথায় বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়। যাতে তুমি সহজে একজন বন্ধু লাভ করতে পার এবং তুমিও অপরের বন্ধুতে পরিণত হতে পার।

বন্ধুত্বের প্রথম সোপান সাক্ষাতে সালাম দেওয়া। সালাম দেওয়ার মাধ্যমে কায়েম হয় সম্প্রীতি, হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে উভয়ের প্রতি উভয়ের ভালোবাসা। *(মুসলিম ৫৪নং)* এরপর গাঢ় পরিচয়, সুন্দর ব্যবহার, সাক্ষাতে সুমিষ্ট হাসি, উপঢৌকন, উপহার ও দুআ বিনিময় ইত্যাদি।

এক ব্যক্তি মহানবী ﷺ এর নিকট এসে আরজ করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন একটা কাজ বলে দিন, যা করলে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন এবং মানুষেও আমাকে ভালোবাসবে।' প্রিয় নবী ﷺ বললেন, "দুনিয়ার মায়া ত্যাগ কর, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। আর মানুষের হাতে যা কিছু আছে (অর্থ-সম্পদ ইত্যাদি) তার প্রতি বিরাগ প্রকাশ কর, মানুষ তোমাকে ভালোবাসবে।" *(ইবনে মাজাহ ৪১০২, সহীহুল জামে' ৯২২ নং)*

মানুষ চায় না যে, তার কাছে কেউ কিছু চাক। অতএব তুমি কোন মানুষের কাছে চাইলে তার মন সঙ্কুচিত হবে এবং তুমি তার নিকট থেকে তা না পেলে তোমার মনও ছোট হবে। এর ফলে ভালোবাসার বীজ অঙ্কুরিত হতে পারবে না। অন্যথা ঋণ, সাহায্য ইত্যাদি না চাইলে অনায়াসে তুমি তার ভালোবাসার পাত্র হতে পারবে।

পক্ষান্তরে চারটি জিনিস ভালোবাসা সৃষ্টি করে; স্মিতমুখে সাক্ষাৎ, উপকার সাধন, সহমত অবলম্বন এবং কপটতা বর্জন। আর যার মুখ মিষ্টি তারই বন্ধু বেশী।

খেয়াল রেখো যে, বন্ধুত্বের খাতিরে যা কিছু করছ, তার বিনিময়ে প্রতিদানের আশা করো না। কারণ, ভালোবাসার একটি মহৎ উপায় হল, প্রতিদানে কিছু পাওয়ার আশা না করে নিঃস্বার্থভাবে কেবল ভালোবেসে যাওয়া।

আর এ কথাও মনে রেখো, 'অতি প্রেম যেখানে, নিত্য যেও না সেখানে। যাবে যদি নিত্যি, ঘটবে একটা কিত্যি।' বরং অতিরঞ্জনের পথ বর্জন করে মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন কর। এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেন, "(প্রত্যেক দিন সাক্ষাৎ না করে) একদিন বাদ পর দিন সাক্ষাত কর। তাতে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে।" *(বাযযার, ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহুল জামে' ৩৫৬৮ নং)*

প্রেমের বেদনার প্রকৃতিই এমন যে, প্রেমে বিরহের আঘাত যত বেশী পড়ে, প্রেমের ফোঁড়া

ততই টলটলে হয়ে বেড়ে ওঠে। প্রেমাস্পদের প্রতি হৃদয়ের টান তত বেশী মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়ে মনকে ব্যাকুল করে তোলে। আর সেখান থেকে সৃষ্টি হয় প্রকৃষ্ট বন্ধুত্বের সুদৃঢ় বন্ধন।

হে যুবক বন্ধু! বন্ধুত্বের পথ বড় বন্ধুর। এ পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। নয় ঝড়ঝঞ্ঝাহীন ও বিপদমুক্ত। কারণ, দোস্তী কুরবানী চায়। কুরবানী পেশ করতে না পারলে দোস্তীতে স্বস্তি পাওয়া যায় না। আর এখানেই হয় প্রকৃত বন্ধুর মহা অগ্নিপরীক্ষা। তাছাড়া 'সুসময়ে বন্ধু বটে অনেকেই হয়, অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়' এই বাস্তব উদাহরণের নাম বন্ধুত্ব নয়। প্রকৃত বন্ধু হল সেই, যে বন্ধুর বিপদের সময় হাত বাড়িয়ে দেয়। প্রকৃত বন্ধু সে নয়, যে আমার দুর্নাম রটার সময় বলে, 'ও আমাদের গ্রামের একটা ছেলে।' আর সুনাম প্রচারের সময় বলে, 'ও আমার প্রাণপ্রিয় অথবা খাস বন্ধু!' আসল বন্ধু সে নয়, যে আমার অভাবের সময় খোঁজ রাখে না। আর আমার ধনলাভের সময় এসে বলে, 'আই লাভ ইউ।' এমন কপট ও স্বার্থপর বন্ধু থেকে তোমাকে আল্লাহর পানাহ রইল।

প্রকৃত বন্ধু সে নয়, যে সামান্য মতবিরোধের ফলে বন্ধুত্বের মূলে কুঠারাঘাত হানে। উড়ো খবর ও কান-ভাঙ্গানিতে বিশ্বাস ও আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং বন্ধুত্বের বন্ধন-সূত্রকে ছিন্নভিন্ন করে। অথচ ঈমানের এক দাবী এই যে, বন্ধুত্বের অঙ্গীকার বন্ধু যথারীতি পালন করতে বদ্ধপরিকর থাকবে। *(হাকেম ১/১৬, সহীহুল জামে' ২০৫৬ নং)*

প্রকৃত বন্ধু সে নয়, যে মুখের কথায় 'একশ ছড়ি গুনে খায়, অথচ আসলে সে ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায়।' এমন বাক্সর্বস্ব, ধৈর্যহীন, অদূরদর্শী বন্ধু থেকে আল্লাহ আমাকে ও তোমাকে আশ্রয় দান করুন।

প্রকৃত বন্ধু তো সেই ব্যক্তি, যে পীড়িত হলে তার পীড়া দেখে তুমিও পীড়িত হও এবং তুমি পীড়িত হলে তার দর্শনলাভে ও সান্ত্বনাদানে সুস্থ হয়ে ওঠ। যে বন্ধু তোমাকে এসে বলে, 'ইন্নী উহিব্বুকা ফিল্লাহ' এবং তার প্রত্যুত্তরে তুমি তাকে বল, 'আহাব্বাকাল্লাযী আহবাবতানী ফীহ।'

ভাই যুবক! জীবনে চলার পথে বহু বন্ধুই আসে-যায় এবং মনের প্রেম-কোঠায় প্রবেশের জন্য তার সুদৃঢ় দ্বারে করাঘাত করে যায়। কিন্তু যে বন্ধু ঐ দ্বারে প্রবেশ করে মনের নিভৃত কোণে স্থায়ী আসন পেতে নিতে পারে, সেই হয় প্রকৃত বন্ধু। এমন বন্ধুই তুমি লাভ কর, এই কামনা করি।

অবশ্য আর একটি প্রকৃষ্ট বন্ধুর কথাও তোমাকে জানিয়ে রাখি, আর তা হল একটি মনের মত উপকারী বই। কোন বন্ধু না পেলে এ বন্ধু পাওয়া সাক্ষর মানুষের জন্য মোটেই কঠিন নয়। অতএব ভেবে ও খুঁজে দেখো, দেখবে এ বন্ধুর সাথে কোন দিন মনোমালিন্য ঘটবে না। ঘটবে না কোন স্বার্থপরতার মন কষাকষি।

দুঃখের বিষয়, 'কড়ি ফটকা চিঁড়ে দই, কড়ি বিনে বন্ধু কই?' কোন স্বার্থ ছাড়া কেবল আল্লাহ ও দ্বীনের উদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব আর কে করে? খেয়াল করে দেখবে, যারাই তোমাকে বন্ধু বলে গলায় লাগাতে আসছে, তাদের অধিকাংশই তোমাকে সম্মান প্রদর্শন করলেও আসলে 'তোমার কি মান? তোমার শাঁখা-সোনার মান।' অধিকাংশ বন্ধুই হল 'দুধের মাছি।' এরা কোন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আসে, স্বার্থ উদ্ধার হলে অথবা স্বার্থে আঘাত লাগলে সরে পড়ে। যে জিনিসের জন্য সে বন্ধুরা তোমাকে ভালোবাসছিল তা তোমার কাছে

না পেলে পরক্ষণে তোমাকে বিদায় জানাবে। আজ ধনবান আছ, এখন তোমার বন্ধু অনেক। কিন্তু কাল গরীব হয়ে গেলে সবাই তোমার নিকট থেকে কেটে পড়বে। আজ তোমার একটা পদ আছে বলে তোমার বন্ধুর অভাব নেই। কিন্তু কাল পদ চলে গেলে তোমার বন্ধুরাও তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে। পার্থিব স্বার্থে বন্ধুত্বের ধারা এই, রীতি এই। আর দুনিয়ার এ রীতি বড় পুরাতন, নূতন নয়।

কিন্তু তুমি তোমার বন্ধুর জন্য খাঁটি বন্ধু হও। সকল স্বার্থ ত্যাগ করে কেবল আল্লাহর ওয়াস্তে নিঃস্বার্থ বন্ধুরূপে পরিচয় ও প্রমাণ দাও। স্বার্থে আঘাত লাগলে ধৈর্য ধরে নাও। আর তার জন্য বন্ধুত্বের বুনিয়াদে আঘাত হেনো না। মনে রেখো, "কোন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণ) মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার ভায়ের জন্য তাই পছন্দ করেছে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" *(বুখারী ৭, মুসলিম ৪৫ নং)*

সাবধান! তোমার বন্ধু যে চিরদিন বন্ধু থাকবে, সে ধারণা সঠিক না-ও হতে পারে। আজ যে বন্ধু আছে কাল সে শত্রুতে পরিণত হতে পারে। সুতরাং তোমার রহস্য ও দুর্বলতার ব্যাপারে তোমাকে সতর্ক থাকা উচিত। আর এ জন্যই দূরদর্শী সমাজ-বিজ্ঞানী নবী ﷺ বলেন, "তোমার বন্ধুকে মধ্যমভাবে ভালোবাস (অর্থাৎ, তার ভালোবাসাতে তুমি অতিরঞ্জন করো না)। কারণ, একদিন সে তোমার শত্রুতে পরিণত হতে পারে। আর তোমার শত্রুকে তুমি মধ্যমভাবে শত্রু ভেবো। (অর্থাৎ, তাকে শত্রু ভাবাতে বাড়াবাড়ি করো না।) কারণ, একদিন সে তোমার বন্ধুতে পরিণত হতে পারে।" (সুতরাং তখন তোমাকে লজ্জায় পড়তে হবে।) *(তিরমিযী ১৯৯৭, সহীহুল জামে' ১৭৮ নং)*

শেখ সা'দী বলেন, 'যা তোমার গোপন, তা নিজের বন্ধুকেও বলো না; যদিও সে তোমার বন্ধুত্বে খাঁটি। কারণ, বলা যায় না, কালচক্রে সে তোমার শত্রুতেও পরিণত হতে পারে। আর অতি কদর্য অসদ্ব্যবহার বা পারতপক্ষের কোন কঠিন শাস্তি কোন শত্রুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করো না। কারণ, কোনদিন সে তোমার ঘনিষ্ট বন্ধুতেও বদলে যেতে পারে।' সুতরাং পূর্ব হতেই সতর্ক থেকো; যাতে ভবিষ্যতে পস্তাতে না হয় এবং লজ্জিত হতেও না হয়।

তিনি আরো বলেন, 'যে গোপনীয় কথা তুমি গোপন রাখতে চাও, তা তোমার বন্ধুকেও বলো না। কারণ, তোমার বন্ধুরও অনেক বন্ধু আছে। সেও তাদের নিকট তা প্রকাশ করতে পারে।'

হ্যাঁ, আর এমনি করেই সৃষ্টি হয় মনোমালিন্য, তারপর বিচ্ছিন্নতা ও শত্রুতা। আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব হলেও কোন এক পক্ষের পাপের কারণেই উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে। মহানবী ﷺ বলেন, "যখন কোন দুই ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, তখন তাদের কারো একজনের কোন পাপ সংঘটন ছাড়া আল্লাহ তাদের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করেন না।" *(সহীহুল জামে' ৫৬০৩ নং)*

যুবক বন্ধু! অতএব খেয়াল রেখো, যাতে বন্ধুত্বের পর বিশেষ করে ঐ বন্ধুত্বের কারণে তোমাদের কারো দ্বারা যেন কোন পাপ সংঘটিত না হয়। সুতরাং সতর্ক দৃষ্টি রেখো, যাতে তোমার বন্ধুর কুদৃষ্টি তোমার বোন, স্ত্রী অথবা কন্যার উপর না পড়ে। মানুষ তো। আর তার মন তো মন্দপ্রবণ এবং শয়তান বড় শত্রু। বন্ধুর সহিত তোমার বন্ধুত্ব যতই গাঢ় ও নিবিড়

হোক না কেন, সে গাঢ়তা ও নিবিড়তা তোমার বোন-স্ত্রী-কন্যার মনে প্লাবিত হবে কেন? জানের বন্ধু হলেও, ফিরিশ্তাতুল্য চরিত্র হলেও পর্দার আয়াত তো আর মনসূখ হচ্ছে না। আর যদি তাই মনে করে পর্দার কুরআনী বিধানকে অবজ্ঞা কর, তাহলে জেনে রেখো, তোমার জানতে অথবা অজান্তে এমন কীর্তি ঘটতে পারে, যার জন্য তোমার ইহকালও বরবাদ হতে পারে এবং পরকাল ধ্বংস তো করলেই। বন্ধু তখন বিষফোঁড়া হবে এবং তার গুপ্ত যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করবে। যখন না পাবে মরণের কোন পথ, আর না-ই পাবে শান্তির কোন প্রলেপ। তাছাড়া তোমার ও তোমার বংশের দুর্নাম রটতে থাকবে এবং তখন তুমি শাক দিয়ে মাছ ঢাকতেও পারবে না। পরন্তু তোমার তো জানা আছে যে, 'দাইয়ুস বেহেশ্তে যাবে না।'

পক্ষান্তরে এ কথা দুনিয়া জানে যে, একজন দুশমন যা ক্ষতি করতে পারে, তার চাইতে অনেক গুণ বেশী করতে পারে একজন বন্ধু। শত্রুর ক্ষতির হাত থেকে সতর্ক থাকা যায়, কিন্তু বন্ধুর ব্যাপারে তা হয় না। শত্রু পাহারা দেওয়া যায়, কিন্তু বন্ধু পাহারা দেওয়া যায় না। ফলে অসতর্ক থাকা অবস্থাতেই কাছে থেকেই বন্ধুর বন্দুক বুক ঝাঁঝরা করে দেয়। আবার শত্রু প্রকাশ্য হলে তার দ্বারা যত ক্ষতি হয়, বন্ধু শত্রু হয়ে গেলে তার দ্বারা ক্ষতি হয় আরো মারাত্মক, অধিক ভয়ানক।

আপন যখন পর হয় এবং বন্ধু যখন শত্রুতে পরিণত হয়ে যায়, তখনকার মর্মব্যথা যে কত নিদারুণ, কত গভীর হয়ে বন্ধুকে নিষ্পেষিত করে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আবার আন্তরিকতা ও গাঢ়তা অনুযায়ী সেই বেদনার পরিমাণ কম ও বেশী হয়ে থাকে। বন্ধুত্বের গাঢ়তা বেশী থাকলে বেদনা ও আক্ষেপের পরিমাণ বেশী হয়ে থাকে। 'এত ভালোবেসে শেষে এত অবহেলা'র স্মৃতি ও আঘাতে হৃদয় দগ্ধীভূত হয়ে মানুষ অনেক সময় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু এমন দু'টি জিনিস আছে, যা হারিয়ে গেলে তার জন্য কেঁদে চক্ষুদ্বয় হতে রক্তধারা প্রবাহিত করলেও তার এক দশমাংশ হকও আদায় হয় না। সে দু'টির একটি হল, যৌবন এবং অপরটি হল, বন্ধু।

আপনজন ও বন্ধুর কথায় মনে দাগ কাটে বড়। তবুও ভুলে যেতে হয়। বন্ধুর বন্ধুত্ব ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করতে হয়। কিন্তু বাস্তব এই যে,

'হাড় ভাঙ্গলে জোড়া লাগে কলে আর বলে,
মন ভাঙ্গলে জোড়া লাগে না ইহ-পরকালে।'

কাটা চামড়ায় জোড়া লাগে ঠিকই, কিন্তু দাগ থেকে যায়। দুশমনির সব কথাই ভুলে যেতে হয়, কিন্তু কিছু কথা আছে, যা মনে রাখতে হয়; ভুললে চলে না। আর তা হয় ভবিষ্যতের জন্য বড় শিক্ষা ও উপদেশ।

যে সব কারণে বন্ধুত্ব নষ্ট হয় তার মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন অন্যতম। অনেক মানুষ আছে, যাদেরকে বাইরে ও দূরে থেকেই ভালো লাগে, ভিতরে ও কাছে এলে লাগে তার বিপরীত। আর ভাই-বোন বা ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিয়ে দূরের বন্ধু কাছে হয়, গোপন বিষয়ে খবর নেওয়ার পথ অধিক ও সূক্ষ্ম হয়, ভুল বুঝাবুঝির মত ক্ষেত্র তৈরী হয়। ফলে সৃষ্টি হয় বিতৃষ্ণা, কলহ ও বিচ্ছেদ।

বিচ্ছেদের আর এক কারণ হল টাকা। তাই বন্ধুত্ব রাখতে হলে টাকা-পয়সা লেনদেনের

ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। নচেৎ টাকা এমন জিনিস যে, সে ভালোবাসা সৃষ্টি করতে পারে, আবার বিচ্ছেদও। কথায় বলে, 'টাকা তুমি যাচ্ছ কোথা? পিরীত যথা। আসবে কবে? বিচ্ছেদ যবে।'

এ সব ছাড়া অনেক মানুষ আছে, যারা 'কতটা পেলাম' কেবল সেই হিসাব রাখে। পক্ষান্তরে 'কতটা দিলাম' সে হিসাব রাখে না। অর্থাৎ, না পেলে হৈচৈ করে, অথচ দেওয়ার মন-মানসিকতা রাখে না। এই মানুষরাই সব সময় অপর পক্ষের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে থাকে এবং নিজের ঘাড়ে দোষ নিতেই চায় না। এরা চায় 'আঘাত দোব, কিন্তু আঃ শুনব না। বারুদে আগুন দোব, কিন্তু বিস্ফোরণ দেখব না।' এরা চায় 'আগুন ধরাব, আর ধূপের সুগন্ধ নেব।' এই শ্রেণীর স্বার্থপর, বিবেক ও ইনসাফহীন মানুষের সাথে যে বন্ধুত্ব রাখা বড় দায়, তা বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রের জানা।

তুমি মনের মত বন্ধু পাও, বন্ধু-মহলে সুখী হও, সংসার ও দ্বীন-ধর্মে উপকৃত হও এবং কিয়ামতের ছায়াহীন প্রখর রৌদ্রময় দিনে আল্লাহর ছায়া লাভ কর, মনে-প্রাণে এই কামনা করি।

যুবক ও খেলাধূলা

কবির ভাষায় যুবকের যৌবন হল, 'বারিদের বারিধারা, মহাগিরির প্রস্রবণ।' সুতরাং এই টলটলায়মান বারিধি এবং উপচীয়মান স্রোতস্বিনীকে সঠিক গতিপথে নিয়ন্ত্রিত ও প্রবাহিত করার জন্য দুই ধারে উঁচু ও মজবুত বাঁধ চাই। চাই সর্বনাশা বন্যার কবল থেকে রক্ষার জন্য উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। যৌবনের প্রারম্ভে মনের আঁধার কোণে কত রকম কুচিন্তা আসে। আসে কত অশুভ পরিকল্পনা। আর তা দূর করার জন্য চাই এমন সুব্যবস্থা, যাতে যুব-সমাজ বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার দিকে অগ্রসর ও ধাবিত না হয়। বলা বাহুল্য, উক্ত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা ও সুব্যবস্থা বলতে আমরা যা বুঝি তা-ই হল ইসলামের জীবন-ব্যবস্থা। যে সর্বাঙ্গ-সুন্দর ও শ্বাশত ব্যবস্থা মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। রক্ষা করে উচ্ছৃঙ্খলতা ও ভ্রষ্টতার কবল থেকে।

কিন্তু মানুষ তো আর সকলে সমান নয়। তাই কিছু সমাজ-সেবী বেছে নিয়েছেন খেলাধূলার পথ। কিন্তু লুফে নিয়েছেন তাদের পথ, যারা আসলে ভোগবাদী, পরকালে অবিশ্বাসী। যাদের শ্লোগান হল, 'দুনিয়াটা মস্তবড়, খাও-দাও স্ফূর্তি কর।' যাদের বিশ্বাসই হল 'নো লাইফ আফটার দি ডেথ।' যাদের পরম লক্ষ্য হল, মানুষকে ধর্মের নৈতিকতা থেকে বের করে এনে মুক্ত স্বেচ্ছাচারিতার জীবনে শুধু ভোগ-বিলাস ও চিত্তবিনোদনে ব্যাপৃত রাখা। আর তার জন্যই পৃথিবীর একটা বিরাট সংখ্যক মানুষ মাঠে-ময়দানে ও খেলাধূলার আনন্দ মেলায় নিজেদের অবসর-বিনোদন ছাড়াও নিজেদের অমূল্য সময় নষ্ট করেও চিত্তবিনোদন করে থাকে।

অবশ্য এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কিছু খেলাধূলা আছে, যাতে সত্যই মানুষ উপকৃত হয়ে থাকে। সুস্থ শরীর গঠনে ও মানসিকভাবে মনে স্ফূর্তি আনতে তথা পড়াশোনায় মনোযোগিতা বাড়াতে খেলাধূলার একটা বড় ভূমিকা আছে। কিন্তু মুসলিম যুব-সমাজের জন্য তা নিয়ম-ছাড়া, বাঁধন-হারা ও সীমাহীন নয়। জীবনের একটি মাত্র লক্ষ্য ঠিক রেখে (বৈধ)

উপলক্ষ্য যদি যথানিয়মে ব্যবহার করা হয়, তবেই আমাদের মঙ্গল। নচেৎ উপলক্ষ্য যদি লক্ষ্যে পরিণত হয়, তাহলেই আমাদের সর্বনাশ।

নিয়মতান্ত্রিকভাবে কিছু খেলার মধ্যে উপকার থাকলেও তার অপকারিতার দিকটা ভুলে গেলে চলে না। ভুললে হয়তো এমনও হতে পারে যে, জীবনের জমা-খরচের হিসাবে কেবল 'নাকের বদলে নরুন' পেয়ে সন্তুষ্ট থেকে যাব।

সাধারণভাবে প্রায় সকল খেলাতে যেমন খেলোয়াড় ও তাদের সমর্থক ও দর্শকদের মাঝে সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়, তেমনি সৃষ্টি হয় বিদ্বেষ ও শত্রুতা। কখনো কখনো হিংসা থেকে শুরু করে মারামারি ও দাঙ্গাতে গিয়ে পৌঁছে।

এই খেলার টানে মুসলিম যুবকের কত নামায নষ্ট হয়। নামাযের জামাআত চলে যায়। অনেকে সময় পার করে কাযা পড়ে নেয়। কিন্তু মহান আল্লাহ বলেন, "দুর্ভোগ (বা ওয়াইল দোযখ) সেই নামাযীদের জন্য, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন।" *(সূরা মাঊন ৫-৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, "অতঃপর তাদের পর এল অপদার্থ পরবর্তীরা; যারা নামায নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হল। যার ফলে তারা অচিরেই 'গাই' (নামক দোযখের এক উপত্যকা) প্রত্যক্ষ করবে।" *(সূরা মারয়্যাম ৫৯ আয়াত)*

এই খেলাধূলা ও বিভিন্ন শরীর-চর্চায় মুসলিম তার লজ্জাস্থানকে নির্লজ্জভাবে উন্মুক্ত করে মহানবীর প্রকাশ্য বিরোধিতা করে থাকে।

মহিলার সর্বশরীর হল লজ্জাস্থান। কেবল গুপ্তাঙ্গ ও বক্ষঃস্থলই নয়; বরং তার দেহের অন্যান্য অঙ্গও লজ্জাস্থান; যা স্বামী বা একান্ত এগানা পুরুষ ছাড়া অন্যের সামনে প্রকাশ করতে লজ্জা হওয়া উচিত। অনুরূপ পুরুষের কেবল প্রস্রাব ও পায়খানা-দ্বারই লজ্জাস্থান নয়; বরং তার পার্শ্ববর্তী উপর দিকে নাভি পর্যন্ত এবং নিচের দিকে হাঁটু পর্যন্ত দেহ লজ্জাস্থান, যা বের করতে পুরুষকে লজ্জা করা উচিত। কিন্তু খেলোয়াড় যুবক-যুবতীরা লজ্জার মাথা খেয়ে কেবল নাম কেনার উদ্দেশ্যে নিজেদের লজ্জাস্থান খুলে দেখাতে এতটুকু সংকোচও করে না। কারণ, তাদের গোড়ার শিক্ষাই হল, 'সংকোচেরি বিহ্বলতায় হয়ো না ম্রীয়মানা।' অথচ দ্বীনের নবী ﷺ বলেন, "লজ্জা হল ঈমানের অন্যতম শাখা।" *(বুখারী ৯, মুসলিম ৩৫নং)*

মহানবী ﷺ আরো বলেন, "নারী হল সবটাই লজ্জার জিনিস।" *(তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৬৬৯০নং)* "(পুরুষের) নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত স্থান হল লজ্জাস্থান।" *(হাকেম, সহীহুল জামে' ৫৫৮৩ নং)*

তিনি আরো বলেন, "তুমি তোমার উরু খুলে রেখো না এবং কোন জীবিত অথবা মৃতের উরুর দিকে তাকিয়ে দেখো না।" *(আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ৭৪৪০ নং)*

অন্যত্র বলেন, "তুমি তোমার জাং ঢেকে নাও। কারণ, জাং হল লজ্জাস্থান।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাকেম, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৭৯০৬ নং)*

কয়েক প্রকার খেলার মাঝে রয়েছে যৌনচারিতা, চোখ ও হাতের ব্যভিচার। যে খেলায় সুপ্ত যৌন অনুভূতিকে সুড়সুড়ি দিয়ে জাগ্রত করা হয়। আর এটা তখন হয়, যখন প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কোন কিশোরী বা যুবতী দল! যখন শুধুমাত্র নাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে নারী প্রগতিবাদের দোহাই দিয়ে নারীবাদী স্বার্থপর পুরুষ উদ্যোক্তা ও দর্শকদের সামনে কতক

যুবককে উষ্ণ ছোঁয়া দিয়ে থাকে এবং গরম পরশ খেয়ে থাকে!

যুবক বন্ধু! এ কথা বলো না যে, ঐ সময় খেলোয়াড়রা ঐ দিকে মন দেয় না। তুমি তোমার মনে ভালো করে চিন্তা করে দেখো। নচেৎ তার কোন এমন বন্ধুর মুখ হতে শুনো, যে 'হাডুডু' খেলায় কোন মহিলা টিমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। আর খেলা চলা কালে দর্শকদের টিপ্পনী ও শিস্ কাটার কথা তো অবশ্যই শুনে থাকবে।

বন্ধু আমার! যুবক হয়ে তুমি নিশ্চয় জান যে, ঘর্ষণ ছাড়া শুধুমাত্র দর্শনেই কত বড় আকর্ষণ আছে। বাধা সত্ত্বেও ঐ নারী-সৌন্দর্যের দর্শনই কেবল মিলন ঘটাতে বাধ্য করে। পূর্ণিমার চাঁদের ঝলমলে রূপ দেখে সমুদ্রে জোয়ার আসে। যুবতীর যৌবনভরা রূপ-লাবণ্য দেখেই যুবকের তরঙ্গায়িত যৌবনের জোয়ার উত্তাল হয়ে ছুটে আসে।

বন্ধু একটি অভিজ্ঞতার কথা শোন, এক ব্যক্তি নিজের উপরে স্ত্রী হারাম (যিহার) করেছিল। যিহার করলে কাফ্ফারা লাগে। একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে তাকে একটি দাস মুক্ত করতে হবে। ক্রীতদাস পাওয়া না গেলে বা তা ক্রয় করে স্বাধীন করার ক্ষমতা না থাকলে স্পর্শ করার পূর্বে একটানা দুই মাস রোযা রাখতে হবে। এতেও অসমর্থ হলে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাতে হবে। *(সূরা মুজাদালাহ ৩-৪ আয়াত দ্রঃ)* কিন্তু এ ব্যক্তি কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বেই স্ত্রী-মিলন করে ফেলে মহানবীর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজের অবস্থার কথা খুলে বললে তিনি তাকে এ কাজের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। লোকটি বলল, 'জ্যোৎস্নার আলোতে আমি তার পায়ের মল বা নূপুর দেখে ধৈর্য রাখতে পারিনি!' *(আবূ দাউদ ২২২৩, সহীহ তিরমিযী ৯৫৮, নাসাঈ ৩৪৫৭, ইবনে মাজাহ ২০৬৫ নং)*

হ্যাঁ বন্ধু! এটাই অক্লীব মানুষের প্রকৃতি। যুবকের যৌবনের উপচীয়মান জোয়ারের বেসামাল আক্রমণ। অতএব এবার বল তো, পায়ের অলঙ্কার দেখে অথবা পায়ের রলার নিম্নাংশ চাঁদের আলোতে দেখে যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে পায়ের রলার উপরের অংশ, বরং তারও উপরের অংশ জাং সূর্যের আলোতে দেখলে যুবকের মনের অবস্থা কি হতে পারে? আবার দর্শনের সাথে সাথে যদি তা স্পর্শ করে, বরং শক্তভাবে জড়িয়ে ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করে, তাহলে অবস্থা কোন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে তার অনুমান অবশ্যই করতে পারবে।

পক্ষান্তরে প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে মহিলা স্পর্শ করা হালাল নয় তাকে স্পর্শ করার চেয়ে তোমাদের কারো মাথায় লোহার ছুঁচ গেঁথে যাওয়া অনেক ভালো!" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ৫০৪৫ নং)*

আর মহান আল্লাহর মহাঘোষণা শোন, "যারা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা অপদস্থ হবে; যেমন অপদস্থ হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীরা।" *(সূরা মুজাদালাহ ৫ আয়াত)*

এই খেলায় হয় অর্থের অপচয়। জুয়া ও জুয়া-জাতীয় খেলায় 'কারো পৌষমাস, কারো সর্বনাশ' হয়। একটি 'টুর্নামেন্ট' চালাতে, বাইরের টিম আনতে, খেলার বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম ও পুরস্কারাদি সহ আরো অন্যান্য খাতে অপব্যয় হয় লক্ষ-লক্ষ ডলারের। এক দিকে দেশের এক শ্রেণীর মানুষ দারিদ্রের কারণে না খেয়ে মরে, আর অন্য দিকে অন্য এক শ্রেণীর বিলাসী মানুষ ৫ টাকার টিকিট ৫০০ টাকায় কিনে খেলা দেখতে দূর-দূরান্তে সফর করে। একদিকে সরকারের বিশেষ খাতে ঘাট্‌তি পূরণের জন্য জনগণের উপর ট্যাক্স্ ইত্যাদি বাড়ানো হয়, কোন কোন জিনিসের দামও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। আর অপরদিকে খেলার পেছনে ব্যয় করা

হয় তার চেয়ে আরো অনেকগুণ বেশী বেশী টাকা। ভাবতে আরো অবাক লাগে যে, একটা কাঠের ব্যাট বিক্রয় হয় কয়েক লক্ষ টাকায়! আর তা এ জন্য যে, ঐ ব্যাট বিশ্বকাপ জিতে জাতির মান রক্ষা করেছে এবং এই ক্রয়ের ফলে ক্রেতার নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যাবে।

খেলার পাগল বন্ধু আমার! মহান প্রতিপালক আল্লাহ বলেন, "আর তোমরা কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।" *(সূরা ইসরা ২৬-২৭ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "পাঁচটি বিষয়ে কৈফিয়ত না দেওয়ার পূর্বে কিয়ামতের দিন কোন মানুষের পা সরবে না--- (তন্মধ্যে একটি বিষয় হল এই যে,) সে তার ধন-সম্পদ কোন্ উপায়ে অর্জন করেছে এবং কোন্ পথে তা ব্যয় করেছে?" *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ১২১ নং)*

খেলা তার খেলোয়াড় ও দর্শকদেরকে মানসিক বিকারগ্রস্ত করে ছাড়ে। খেলার নেশা খেলা-প্রিয়দেরকে হার-জিতের সময় এক প্রকার মাতাল করে তোলে। জিতার খবর শোনা মাত্র কেউ কেউ খুশীতে কেঁদে ফেলে! বিজয়-উল্লাসে যুবক-যুবতীর দল কাপ মাথায় নাচতে শুরু করে। যেন মাথায় তাদের ব্রঞ্জ্ বা স্টেইনলেশ স্টিলের কাপ নয়, বরং 'সাত রাজার ধন মানিক' পেয়ে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে 'ডিস্কো ড্যান্স্' প্রদর্শন করে! অনেকে অনেকের মুখ-মিষ্টিও করায়।

পক্ষান্তরে হারার খবর শোনা মাত্র কেউ কেউ মূর্ছা যায়! কেউ বা ক্ষোভ ও দুঃখে ফেটে পড়ে নিজের রেডিও-টিভি ভেঙ্গে ফেলে! কেউ কেউ খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয়। মনের বিষন্নতায় অনেকের ঘুম আসে না কয়েক রাত! কেউ বা আত্মহত্যা করে 'খেলার মস্তান' বা 'খেলার শহীদ' হয়ে খেলাধূলার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নজীর সৃষ্টি করে!!

আর এইভাবে খেলা যেন আমাদের জীবনের একটি লক্ষ্য-বস্তুতে পরিণত হয়ে পড়েছে। যার দরুন তার উন্নতি-অবনতিও আমাদের জীবনে বিরাট আন্দোলন ও পরিবর্তনের তুফান ডেকে আনে। অথচ দ্বীন বা ইসলাম মুসলিমের প্রাণ হওয়া সত্ত্বেও তার পরাজয়ে বিষন্ন হতে এবং বিজয়ে আনন্দিত হতে খুব কম সংখ্যক লোকই পরিদৃষ্ট হয়। সাহায্য-সহানুভূতিতে যে জাতির উপমা হল একটি দেহের মত; যার একটি অঙ্গ ব্যথিত হলে বাকী সকল অঙ্গ সমানভাবে ব্যথিত হয়। কিন্তু সেই জাতির দেহাঙ্গের বহু স্থান ব্যথিত হওয়া সত্ত্বেও সে ব্যাপারে বহু কম সংখ্যক মুসলিমেরই মাথা-ব্যথা দেখা যায়।

বহু খেলা এমন আছে, যাতে খেলোয়াড় বা দর্শকের প্রাণহানি বা অঙ্গহানি ঘটে। কেবলমাত্র নাম কেনার জন্য উঁচু উঁচু পর্বতমালায় চড়তে গিয়ে, দুরন্ত ষাঁড়ের সঙ্গে লড়তে গিয়ে, মোটর সাইকেল বা কার রেসে প্রথম স্থান অধিকার করতে অথবা বিশ্বরেকর্ড ভাঙ্গতে গিয়ে কত 'বীর-বাহাদুর'দের জীবন ক্ষয় হয়ে যায়। কত দর্শক খেলা দেখতে গিয়ে ভিঁড়ের চাপেও জান কুরবানী দেয়!

খেলা এমন জিনিস, যা অনর্থক সময় নষ্ট করে। অথচ মুসলিম যুবকের উচিত, সময়ের যথোচিত কদর করা, সময়ের যথার্থ মূল্যায়ন করা। কারণ, সময়ই হল জীবন। অতএব যে ব্যক্তি নিজের জীবনকে ভালোবাসে, সে ব্যক্তির উচিত, সময়ের অপচয় না করা।

হাসান বাসরী (রঃ) বলেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি আসলে কতকগুলি দিনের সমষ্টি।

সুতরাং যখনই তোমার একটি দিন চলে যায়, তখনই তোমার (জীবনের) একটা অংশ ধ্বংস হয়ে যায়।'

সময়ের গুরুত্ব বর্ণনা করে মহানবী ﷺ বলেন, "পাঁচটি জিনিসের পূর্বে পাঁচটি জিনিসের যথার্থ সদ্ব্যবহার করো; তোমার মরণের পূর্বে তোমার জীবনকে, তোমার অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে, ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসর সময়কে, বার্ধক্যের পূর্বে তোমার যৌবনকালকে এবং দরিদ্রতার পূর্বে তোমার ধনবত্তাকে।" *(হাকেম, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ১০৭৭ নং)*

বহু মানুষ আছে, যারা সময়ের কদর বোঝে। আমরা ট্রেনে, বাসে, লঞ্চে, প্লেনে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে লম্বা সফর করলে সে সময়ে রাজনৈতিক ভুয়ো গল্প বা খেলাধূলা নিয়ে বিভিন্ন আস্ফালনমূলক কথাবার্তা আলোচনা করে থাকি। কেউ বা তাস ইত্যাদি খেলে সময় কাটিয়ে থাকে। কিন্তু ওরা সে সময় কিছু না কিছু পড়ে থাকে। এমন কি ২০/৩০ মিনিটের সফর হলেও সঙ্গে রাখা বই অথবা ম্যাগাজিন খুলে পড়তে শুরু করে। পৃথিবীতে এমন মানুষরাই হল উন্নত ও কাজের মানুষ। আর তারাই হল শিক্ষিত জাতির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

মুসলিম যুবককেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত হওয়া উচিত। জাতির হারিয়ে যাওয়া গৌরব ফিরিয়ে আনতে শিক্ষিত যুব-সমাজকেই আগুয়ান হতে হবে। জীবন্ত সময়কে হত্যা করে নয়, বরং সে সময়কে আরো তরোতাজারূপে প্রাণবন্ত রাখতে তার উচিত হল, তা যথা কাজে, কাজের মত কাজে, যথারীতি ব্যয় করা।

পরন্তু বাস্তব কথা হল এই যে, ইসলামী অভিধানে 'অবসর' বা 'অবকাশ' বলে কোন শব্দ নেই। কারণ, মুসলিমের জীবন হল কাজে-কাজে পরিপূর্ণ। দুনিয়ার কাজ না থাকলে দ্বীনের কাজে, সংসারের ব্যস্ততা না থাকলে পরকালের চিন্তায় সে সব সময় ব্যস্ত থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, "অতএব যখন তুমি অবসর পাও তখন পরিশ্রম কর এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ কর।" *(সূরা ইনশিরাহ ৭-৮)* আর মহানবী ﷺ বলেন, "মানুষ মারা গেলে তার (সকল) আমল বন্ধ হয়ে যায়।------।" *(মুসলিম ১৬৩১ নং)* অর্থাৎ, মরণের পূর্ব পর্যন্ত তার কর্ম বন্ধ হয় না। অতএব যে জাতির কোন অবসর নেই, তার আবার 'অবসর-বিনোদন' কি?

মুসলিমের জীবনের মূল্য আছে, লক্ষ্য আছে। যাদের জীবনের কোন লক্ষ্য নেই, কেবল তাদের কাছেই সময়ের কোন কদর নেই। সুতরাং মুসলিম খেল-তামাশায় তার জীবন ও সময় অপচয় করতে পারে না।

মুসলিম স্রষ্টায় বিশ্বাসী। অতএব তাকে এ কথা বিশ্বাস করতেই হবে যে, তাকে বেকার সৃষ্টি করা হয়নি। তাকে সৃষ্টি করার পশ্চাতে এক মহৎ উদ্দেশ্য ও গুরুত্বপূর্ণ রহস্য আছে।

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ বলেন, "তোমরা কি মনে কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না?" *(সূরা মু'মিনূন ১১৫ আয়াত)*

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং ওদের মধ্যে যা কিছু আছে তার কোনটাই আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি; আমি এ দু'টিকে বৃথা সৃষ্টি করিনি। কিন্তু ওদের অধিকাংশই তা জানে না। সকলের জন্য নির্ধারিত আছে ওদের বিচার দিবস।" *(সূরা দুখান ৩৮-৪০ আয়াত)*

"আসমান ও জমিন এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি যদি চিত্তবিনোদনের উপকরণ সৃষ্টি করতে চাইতাম, তবে আমি আমার নিকট যা আছে তা নিয়েই করতাম; যদি আমাকে করতেই হত তাহলে।" *(সূরা আম্বিয়া ১৬-১৭ আয়াত)*

তাঁর অগণিত সৃষ্টির মাঝে রয়েছে হাজারো রহস্য। তাঁর তওহীদ ও একত্ববাদের নিদর্শন। পক্ষান্তরে সৃষ্টির পশ্চাতে তাঁর উদ্দেশ্যের কথা ঘোষণা করে তিনি বলেন, "আমি জিন ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।" *(সূরা যারিয়াত ৫৬ আয়াত)*

সুতরাং যে জীবন ও সময় আল্লাহর ইবাদতের জন্য এবং তাঁর ইবাদতের সহায়ক দুনিয়াদারী করার জন্য সৃষ্ট, তা মুসলিম খেলায় ও হেলায় নষ্ট করতে পারে না।

যে দেহ ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর সৃষ্টি এবং আমাদের নিকট যা আমানত, সে দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কাজে কিরূপে ব্যয় করতে সাহস করতে পারি? তিনি আমাদেরকে, আমাদের হায়াত ও মওতকে খেলার জন্য নয়; বরং কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহর ঘোষণা হল, "যিনি তোমাদেরকে এই পরীক্ষা করার জন্য জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন যে, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে সবচেয়ে উত্তম।" *(সূরা মুল্ক ২আয়াত)*

যুবক ভাই আমার! তোমার এ শক্তিমত্তার জীবন খেলার জন্য নয়। এ জীবন তোমাকে দেওয়া হয়েছে, যাতে তুমি পৃথিবীতে আল্লাহর দেওয়া খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে পার। যাতে তুমি জীবনদাতার জন্য জীবন ও সময় কুরবানী দিতে পার। আর মনে রেখো যে, তোমার জীবনের সাথে ওদের জীবনের কোন তুলনাই হয় না, যারা জানে না যে, তারা কেন সৃষ্ট হয়েছে। যাদের জীবনের লক্ষ্য-বস্তু কোন কিছু নেই। যাদের জীবন হল, পার্থিব জীবন ও বাস্। অতএব তাদের খেলাধূলার বিরাট উন্নতি ও অগ্রগতি (?) দেখে তোমার ঈর্ষা হবে কেন? জীবন সফরে তুমি আছ ঘোড়ার পিঠে। সুতরাং ওরা মরা গাধা নিয়ে বিশাল উন্নত বলে প্রচার-যন্ত্রে প্রচার চালালে তোমার তাতে ঈর্ষার কি আছে? ঘোড়া থাকতে মৃত গাধার জন্য হিংসা কিসের? যে উন্নতির মাঝে আল্লাহর সম্মতি ও সন্তুষ্টি নেই, তা তো আসলে উন্নতি নয়; বরং সেটাই হল অবনতি। যে প্রগতির সম্মুখে উজ্জ্বল লক্ষ্যপথ নেই, তা আসলে অধোগতি। অতএব এমন দুর্গতিকে প্রগতি মনে করার কোন কারণ নেই বন্ধু!

খেলাধূলায় 'কাপ' জিতে জাতির নাম ও মান রক্ষা হয় না ভাই! জাতির নাম ও মান রক্ষা হয়, জাতির জন্য কাজ করলে। আর খেলা কোনদিন কাজ নয়। কাজ না করে খেলা করলে বকুনি বা মার খেতে হয়েছে শিশুবেলায় অভিভাবকদের কাছে। অতএব সে খেলায় নাম কেন হবে? জাতির হেদায়াত-উজ্জ্বল জীবন গড়তে, আদর্শ-ভিত্তিক পরিবেশ গড়তে, জাতির জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করতে যে সাধনার দরকার, সে সাধনার মাঝেই আছে জাতির নাম ও মান।

খেলোয়াড় বন্ধু আমার! সে শরীরের গঠন-আকৃতি সুঠাম ও মজবুত করে কি লাভ, যে শরীরের হৃদয় হল মৃত? সে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে লৌহসদৃশ কঠিন করে কি ফল, যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোন নৈতিকতা নেই, সত্য পথে জিহাদের কোন প্রস্তুতি নেই?

শরীরচর্চাকারী খেলোয়ার বন্ধু! তুমি হয়তো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তোমার কাঁধে ওঠা শক্ত পেশী দেখেছ, বুক ও বাহুর মজবুত মাশুল দেখেছ, কিন্তু এ সুঠাম দেহ ও সুডৌল শরীরকে সেই দোযখের লেলিহান আগুন থেকে রক্ষা করার উপায় দেখেছ কি, যে দোযখের ইন্ধন হল মানুষ ও পাথর; যার নিয়ন্ত্রণভার অর্পিত আছে এমন কঠোর-হৃদয় ফিরিশ্তাদের উপর, যাঁরা আল্লাহর আদেশের অন্যথাচরণ করেন না এবং তাই করেন, যা করতে

তাঁদেরকে আদেশ দেওয়া হয়? আল্লাহর পানাহ, যাতে তোমার এ সৌষ্ঠবসম্পন্ন লোহার দেহ দোযখের ইন্ধন না হয়।

এক শ্রেণীর খেল-তামাশায় উন্মত্ত মানুষদের জন্য আল্লাহ বলেন, "(হে নবী!) তুমি তাদের সঙ্গ ত্যাগ কর, যারা তাদের দ্বীনকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করে। আর এর দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দাও, যাতে কেউ নিজ কৃতকার্যের জন্য ধ্বংস না হয়। যখন আল্লাহ ব্যতীত তার কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না এবং বিনিময়ে সবকিছু দিলেও গৃহীত হবে না। এরাই স্বীয় কৃতকার্যের জন্য ধ্বংস হবে। তাদের অবিশ্বাস হেতু পানীয়ের জন্য উত্তপ্ত পানি ও যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি আছে।" *(সূরা আনআম ৭০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, "জনপদসমূহের অধিবাসীরা কি ভয় করে না যে, আমার শাস্তি তাদের উপর আসবে চাশতের সময়, যখন তারা ক্রীড়ারত থাকবে?" *(সূরা আ'রাফ ৯৮ আয়াত)*

সমাজবিজ্ঞানী নবী ﷺ বলেন, "আমার উম্মতের মধ্যে কিছু সম্প্রদায় এমন হবে, যারা পান-ভোজন ও খেল-তামাশার মাধ্যমে রাত্রিযাপন করবে। অতঃপর সকাল হলে তারা বানর ও শূকরদলে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ৫৩৫৪ নং)*

যে সব খেলায় একতরফাভাবে আর্থিক ক্ষতি বিদ্যমান, ইসলামে সে সব খেলাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন মদ ও মূর্তিপূজার পাশাপাশি জুয়া খেলাকে করা হয়েছে অবৈধ। মহান আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য-নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা থেকে দূরে থাক, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখতে চায়। অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না?" *(সূরা মাইদাহ ৯০-৯১ আয়াত)*

আর এই আইনের আওতায় পড়ে সেই সকল খেলা, যাতে আছে অনুরূপ একতরফা আর্থিক ক্ষতি এবং একপক্ষের বিনা মেহনতে অসঙ্গতভাবে অর্থলাভ। যেমন লটারী, ডাইস, বিমা, বাজি রেখে তাস খেলা ইত্যাদি।

যে সব খেলায় আছে বৈষয়িক, সাংসারিক, ও দৈহিক ক্ষতি এবং যা অনর্থক সময় নষ্ট করে, সে সব খেলাও ইসলামে বৈধ নয়। যেমন দাবা ও পাশা জাতীয় সকল খেলা মুসলিমের জন্য হারাম। আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি পাশা-জাতীয় খেলা খেলল, সে যেন নিজ হাতকে শুয়োরের রক্তে রঞ্জিত করল।" *(আহমাদ, মুসলিম ২২৬০, আবূ দাঊদ ৪৯৩৯, ইবনে মাজাহ ৩৭৬৩ নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি পাশা-জাতীয় খেলা খেলল, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করল।" *(মালেক, আবূ দাঊদ ৪৯৩৮, ইবনে মাজাহ ৩৭৬২, হাকেম ১/৫০, সহীহুল জামে' ৬৫২৯ নং)*

আর এ পর্যায়ের খেলা হল, তাস, লুডু, কেরামবোর্ড ও গুটি খেলা, পায়রা উড়িয়ে খেলা ইত্যাদি। এ সব খেলায় অযথা সময় নষ্ট হয় এবং তাতে শারীরিক কোন উপকার লাভ তো হয়ই না, বরং অপকার হয়ে থাকে। এ সবে মানুষকে কুঁড়ে, অলস ও অকর্মণ্য করে তোলে। পক্ষান্তরে এ সবে কিছু বাজি থাকলে জুয়াতে পরিণত হয়ে থাকে।

পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগবে যে, তাহলে ইসলামে কি খেলার নাম-গন্ধই নেই? জবাবে বলা

যায় যে, হ্যাঁ, ইসলামে কোন খেলার গন্ধই নেই। কারণ মুসলিমদের খেলা খেলার কোন সময়ই নেই। খেলা হল প্রত্যেক লক্ষ্যহীন কাজের নাম; যে কাজের পিছনে শুদ্ধ বা অশুদ্ধ কোন লক্ষ্যই থাকে না, নিছক সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে করা হয়। আর মু'মিনের প্রত্যেক কাজের পিছনে লক্ষ্য আছে। তার এমন কোন সময় নেই, যা কাটাতে হয়। তার প্রতিটি মুহূর্ত হয় ইবাদতে কাটে, নচেৎ ইবাদতে সহায়ক কোন পার্থিব কাজে। অতএব তার সময় কাটে না নয়, বরং সে সময়ই পায় না।

সুতরাং মুসলিম যদি কোন নির্দিষ্ট কাজ থেকে কিছু ফুরসৎ পায় এবং তাকে সে অবকাশ বলে মনে করে, তবে সেই অবকাশকেও কাজে লাগিয়ে 'অবসর-বিনোদন'-এর কাজ নিতে পারে। এতে কাজের একঘেয়েমি কেটে যাবে এবং নতুনভাবে ঐ কাজে মনের উদ্যম ফিরে পাবে। এর জন্য ঐ অবসর সময়ে গঠনমূলক সবান্ধব বৈঠক করে এবং যুবশিবির স্থাপন করে দ্বীনী ও সাধারণ জ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে তার মাধ্যমে সময় কাটাতে পারে।

পক্ষান্তরে যে খেলায় মুসলিমের উপকার আছে, যা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, যাতে আছে দ্বীন, প্রাণ ও স্বাস্থ্য রক্ষার অনুশীলন, সংসার ও স্বামী-স্ত্রীর প্রেম-বন্ধন দৃঢ় করার উপায়, যে খেলায় অর্থের অপচয় নেই, সময়ের অপব্যয় নেই, যাতে কোন প্রকার শরীয়ত-বিরোধী কর্ম করতে হয় না, এমন খেলা মুসলিমের জন্য অবশ্যই বৈধ। শরীয়তে এ বিষয়ে সংকীর্ণতা নেই। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১৮২৯ নং দ্রঃ)*

যেমন দৌড়-প্রতিযোগিতা, বিশেষ করে নিরালায় স্ত্রীর সাথে দৌড়-প্রতিযোগিতা করা ইসলামের এক সাংসারিক আদব। মহানবী ﷺ স্বয়ং নিজ স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) এর সহিত এমন প্রতিযোগিতা করে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রেম ও আনন্দ প্রকাশের এক সুন্দর নজীর রেখে গেছেন। *(আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ত্বাবারানী, ইবনে মাজাহ, ইরওয়াউল গালীল ১৪৯৭ নং দ্রঃ)*

স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের প্রেমকেলি করা, মিলনের পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ বিভিন্ন আচার ও শৃঙ্গার ইসলামে বৈধ। এতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক মধুর থেকে মধুরতম হয় এবং উভয়ে ব্যভিচার থেকে বাঁচতে পারে।

ঘোড়-দৌড় প্রতিযোগিতা বৈধ। যেমন বৈধ তীরন্দাজি খেলা। কারণ, এতে মুসলিমের ঈমান, জান, ধন ও মান রক্ষার উদ্দেশ্যে জিহাদী অনুশীলন হয়। আর জান রক্ষার তাকীদেই সাঁতার খেলাও ইসলামে বৈধ। *(নাসাঈ, ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩১৫নং দ্রঃ)*

আধুনিক বিশ্বের ফুটবল, হাডুডু ইত্যাদি স্বাস্থ্যরক্ষামূলক খেলাধূলাও কিছু শর্তের সাথে বৈধ। যেমন এই খেলা খেলতে গিয়ে যেন জাং বের না হয়। কারণ, জাং হল লজ্জাস্থানের অংশ। এ খেলা যেন যথাসময়ে জামাআতে নামায বা অন্যান্য ইবাদত থেকে উদাসীন ও গাফেল করে না রাখে এবং এতে যেন শরীয়ত-বিরোধী কোন বিষয় বা বস্তু শামিল না থাকে।

বলা বাহুল্য, ইসলাম যে খুশী ও আনন্দ প্রকাশকে হারাম করেছে তা নয়। তবে ইসলামের প্রত্যেক কাজ হল সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত। লাগাম-ছাড়া ও বাঁধনহারা নয়। যে খুশীতে আল্লাহ খুশী, সে খুশী ইসলামের কাম্য। যে আনন্দে আল্লাহ সন্তুষ্ট, সে আনন্দ মুসলিমের কর্ম ও ধর্ম। শুধু নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধি ও প্রবৃত্তিপূজার জন্য নয়; বরং যে আনন্দে সৃষ্টির মনে আনন্দের ঢেউ আনা যায়, সেই আনন্দই মুসলিমের পরম আনন্দ। তাই তো সে পোলাও নিজে খেয়ে যে

আনন্দ পায়, তার চেয়ে বেশী আনন্দ পায় তা অপরকে খাইয়ে। নিজে ভালো পরে যে খুশী অনুভব করে, অপরকে তা পরিয়ে অনুভব করে তার চাইতে বেশী খুশী। যে আনন্দের মাঝে বেদনা লুকিয়ে থাকে, তা মুসলিমের কাম্য নয়। কাম্য হল নির্মল আনন্দ। বরং যে বেদনার মাঝে আনন্দ লুকিয়ে আছে, তাও তার কাম্য।

সুতরাং যুবক বন্ধু! খেল, খুশী কর। কিন্তু তাতে তোমার মহান প্রভুকে নাখোশ করো না।

এতো গেল খেলোয়াড়দের কথা। এবার দর্শকদের কথায় আসা যাক। যে খেলার পাগলরা খেলা দর্শন করে, তারাও আসলে তাদের মনের মাঠে হাত-পা নেড়ে খেলে থাকে। মনে-মগজে খেলার বিভিন্ন দিক বিচার করে, ভুল ধরে, কখনো খেলোয়াড়কে আবার কখনো বা রেফারীকে ভর্ৎসনা ও গালিমন্দ করে থাকে। অথচ তারা জানে যে, কল্পনা করা ও মুখে বলা যত সহজ, কাজে পরিণত করা তত সহজ নয়।

কিন্তু এতে লাভ কি হয়? মনে মনে এক প্রকার তৃপ্তিকর আনন্দ অনুভব ও সময় কাটানো ছাড়া আর কিছু হয় কি? এতে শারীরিক কোন উপকার হয় কি? বিধায় তা বৈধ কি?

বৈধ কি দূর-দূরান্তে সফর করে টিকিট কিনে, কখনো ৫ টাকার টিকিট ৫০০ টাকায় কিনে ঘন্টার পর ঘন্টা রৌদ্রতাপে অথবা বৃষ্টির নিচে অথবা কন্‌কনে শীতে বসে থেকে হাততালি দেওয়া অথবা দাঁড়িয়ে ড্যান্স্ করতে করতে মুখে নানান্ মন্তব্য করা?

অনুরূপ বৈধ কি ঐ খেলা টিভির পর্দায় ঘন্টার পর ঘন্টা দেখে যাওয়া? তদ্রূপ কানের গোড়ায় রেডিও লাগিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে কেবল খেলার হৈচৈ ও ফলাফল শুনে যাওয়া?! সংসারের কাজ, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা ইত্যাদি কর্তব্য ছেড়ে সময় নষ্ট করে চিত্ত-বিনোদনে কি ইসলাম অনুমতি দেয়?

যদি কেউ বলেন, বৈধ খেলা দেখা বৈধ। কারণ স্বয়ং আল্লাহর নবী ﷺ এবং তাঁর অল্প বয়স্কা পত্নী হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর পশ্চাতে পর্দায় থেকে মসজিদে হাবশীদের যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে খেলা দেখেছেন। তাহলেও এ শর্ত স্বীকার করতেই হবে যে, তা যেন অধিক সময় নষ্ট না করে, নামায ও তার জামাআত নষ্ট না করে। কারো ঊরুর দিকে যেন তাকানো না হয়। (পুরুষ দেখলে) সে খেলা যেন কোন মহিলার না হয়। তাতে যেন কোন প্রকার অর্থের অপচয় না ঘটে। ইত্যাদি।

আমাদের দেশে মেলা হল নানা খেলার আখড়া। কোন কোন মেলা আবার শির্কের (মূর্তি বা কবরপূজা ও উরসের) উৎসব-কেন্দ্র। এ সব উৎসবে কোন মুসলিমের অংশগ্রহণ করা নিশ্চয়ই বৈধ নয়। তাছাড়া মেলা হল প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন-ক্ষেত্র, 'চুম্মা কা ওয়াদা' পূরণের স্থান। রঙ্-তামাশার রঙ্গমঞ্চ। সাধারণতঃ জুয়ারী, শারাবী, লম্পট ও অসদাচারীদের সমাবেশ-স্থল। এখানে কোন চরিত্রবান যুবক-যুবতীর যাওয়ার অর্থই হল অসৎচরিত্রতাকে পছন্দ করা এবং নিজের সচ্চরিত্রতাকে বিনষ্ট করা।

খেলার নেশায় অনেকে আবার খেলার খবর রাখতেও এত অতিরঞ্জন করে যে, শুধু খেলার খবর নেওয়ার জন্যই রেডিও-টিভি বা পত্রিকা ক্রয় করে। যেমন এই শ্রেণীর যুবকদের মন যোগাতে ঐ সব প্রচার-মাধ্যমে খবরের একটা বড় অংশ খেলার জন্য নির্ধারিত করা হয়; বরং শুধু খেলাধূলা নিয়েই বিশেষ পত্রিকা বাজারে প্রকাশিত হয়ে থাকে! আর খেলার পাগল

যুবকরা কেবল মাত্র খেলার খবরটি শোনার জন্য উদ্বিগ্ন থাকে এবং পত্র-পত্রিকার পাতা উল্টে খেলার খবরই আগে পড়ে থাকে! কত যুবক-যুবতী তো তার দেশে বিশ্বকাপ হবে অথবা তার দেশ তাতে খেলতে সুযোগ পাবে শুনে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে কয়েক দিন ধরে এ নিয়ে খুশী ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রোড জাম করে, সাধারণ মানুষকে কষ্ট দিয়ে নেচে-গেয়ে বেড়ায়!! কি জানি এতে তারা কি লাভ বা তৃপ্তি পায়? শুধু যুব-সমাজই নয় বরং দেশের বৃদ্ধ নেতা-নেত্রীরাও তাতে গর্ববোধ করে থাকে। কারণ, খেলাধূলার উন্নয়নে নাকি জাতির মর্যাদা ও অম্লান গৌরব আছে!!!

একদা আমার এক বন্ধু এক মজলিসে খেলার কথা চলতে চলতে বিশ্বকাপের সেমি-ফাইন্যালে কোন্ কোন্ দেশ উঠল তা বলতে না পারলে আমাকে বলে ফেলল, 'তুমি দেখছি কিছুরই খবর রাখ না!' আমি অন্য কিছু না বলে তাকে শুধু বললাম যে, 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন ইল্‌মিল লা য়্যানফা।' (অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি সেই জ্ঞান থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা কোন উপকার সাধন করে না।)

পরিশেষে যুবক বন্ধুদেরকে এই অনুরোধ করি যে, ক্লাবগুলোকে শুধুমাত্র হৈচৈ ও খেলার জন্য 'কিলাব'-ঘর করে রেখো না। বরং ঐ ক্লাবকে জাতির 'ক্বলব' ও প্রাণকেন্দ্র করে গড়ে তোল। যুবশক্তি 'মেন-পাওয়ার'-এ পরিণত হোক ইসলামের স্বার্থে, মুসলিম জাতির স্বার্থে।

উপসংহারে যুবক বন্ধুর জন্য এক আধ্যাত্মিক ব্যায়ামের কথা বলি, যাতে তার ঈমান ও দ্বীন মজবুত হতে পারে।

পূর্ণ মু'মিন যুবকের নিজ মন ও প্রবৃত্তির সহিত সাত পর্যায়ের নিয়মিত ব্যায়াম ও অনুশীলন হওয়া উচিতঃ-

প্রথমতঃ নিজের আত্মার সহিত এই পরামর্শ হওয়া উচিত যে, সে আগামীতে কোন্ ধরনের নেক কাজ করবে? যে কাজ তার ভবিষ্যতে কাজে দেবে সে কাজের পরিকল্পনা করবে, ক্ষয়শীল আয়ু ও লয়শীল জীবনের কয়টা দিনে আল্লাহর কোন অবাধ্যতা করবে না। হেলায় সুযোগ না হারিয়ে পরবর্তীতে লাঞ্ছিত হওয়ার কাজ কখনই করবে না।

দ্বিতীয়তঃ খুব সতর্কতার সহিত লক্ষ্য ও খেয়াল রাখবে, যাতে কোন প্রকার পাপ ও ত্রুটি না ঘটে বসে। প্রবৃত্তি যেন কোন প্রকার 'কু'-এর দিকে ঝুঁকে না বসে। সর্বদা মনের মাঝে এই অনুভূতি রাখবে যে, আল্লাহ তাআলা সূক্ষ্মদর্শী, সর্বদ্রষ্টা। তিনি তার সকল কাজ সূক্ষ্মভাবে দর্শন করছেন। তাঁর ফিরিশ্তা সকল ভালোমন্দ নোট করে রাখছেন। যার আলোকে তাঁর সামনে একদিন জবাবদিহি করতে হবে।

তৃতীয়তঃ আত্মার কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করবে। মানুষের মন অধিকাংশ মন্দ-প্রবণ, মনের প্রকৃতি হল দেহের আরাম-প্রিয়তা, আলস্য ও স্বেচ্ছাচারিতা। কারো বাধ্য হয়ে থাকা মনের প্রকৃতি নয়, কোন শক্ত কাজ করা মনের স্বভাব নয়। অতএব মনের এই স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। কারণ, এমনও হতে পারে যে, প্রবৃত্তিবশে "তোমরা যা পছন্দ কর না, তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা যা পছন্দ কর, তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর (কোন্‌টা তোমাদের জন্য কল্যাণকর তা) আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।" *(সূরা বাক্বারাহ ২১৬ আয়াত)*

এ জিহাদে বিজয় লাভ করলে মানুষ প্রকৃত 'মানুষ' ও 'মানব' হতে পারে। নচেৎ মনের কাছে পরাজিত হলে সে পশুত্বে অবতরণ করে। আল্লাহর ওয়াদা হল, "যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে তাদেরকে আমি আমার পথে পরিচালিত করে থাকি। আর নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে থাকেন।" *(সূরা আনকাবূত ৬৯ আয়াত)*

চতুর্থতঃ আত্মসমালোচনা করবে। সারা দিনের কৃত আমলের উপর নিজ আত্মার হিসাব নেবে। ভালো কাজ করে থাকলে আল্লাহর শুক্র করবে এবং মন্দ কাজ করে থাকলে লজ্জিত হয়ে অনুতাপের সাথে তাঁর নিকট তওবা করবে। আর আগামীতে যেন সে ত্রুটি না হয় তার জন্য যথার্থ খেয়াল রাখবে।

পঞ্চমতঃ ত্রুটি হলে নিজের মন ও আত্মাকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করবে। ঔদাস্য ও অবজ্ঞার জন্য নিজেকে ধিক্কার জানাবে। কৃত ভুলের জন্য মনকে আক্ষেপ-জ্বালায় দগ্ধীভূত করবে।

ষষ্ঠতঃ কৃত পাপের জন্য নিজের মনকে শাস্তি প্রদান করবে। মনের পছন্দনীয় কিছু জিনিস ত্যাগ করে শাস্তির কথা নিজের মনের মণিকোঠায় আন্দোলিত করে রাখবে।

আর **সপ্তমতঃ** ভালো কাজ করে থাকলে তার জন্য মনকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করবে। ভালো কাজ করলে এমনিতেই মু'মিনের হৃদয় হর্ষোৎফুল্ল হয়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও বৈধ কোন উপায়ে মনকে আরো চাঙ্গা করা, মনের মাঝে একঘেয়েমি দূরীভূত করা এবং পুনঃপুনঃ মনের উদ্যম ফিরিয়ে আনা কর্তব্য। যাতে ইহকালের বৈধ খুশী ব্যবহার করে পরকালের পরম খুশী লাভের অধিক সুযোগ লাভ হয়।

আল্লাহর আনুগত্য ও ছাত্র-জীবনে এমন আত্মসমীক্ষা বড় ফলপ্রসূ।

যুবক ও গান-বাজনা

ঢেউ খেলানো যৌবনের সাথে সাথে যে মন-মাতানো গান-বাজনায় যুবকের মন তালে-তালে গেয়ে ও নেচে উঠবে সেটাই স্বাভাবিক। তাই বহু যুবককে দেখা যায় যে, সুর-ঝংকার ও বাজনার তালে-তালে গা ও মাথা হিলিয়ে থাকে; যদিও বা সে গানের ভাষা বা অর্থ না বোঝে। কখনো বা বেসামাল হয়ে হাততালি সহ 'ড্যান্স' শুরু করে থাকে।

কিন্তু এমন কাজ অস্বাভাবিক হল একজন মুসলিমের জন্য। কারণ, মুসলিমের প্রকৃতি হল ইসলামের প্রকৃতি। আর সে প্রকৃতিতে এ শ্রেণীর প্রবৃত্তি পূজা তথা 'ধেই-ধেইনি' একজন আত্মমর্যাদাবোধ-সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য রুচিবিরুদ্ধ কর্ম।

পক্ষান্তরে যে সকল পথ দিয়ে শয়তান মানুষের মনের কোণে আসন পেতে নিতে পারে, তার মধ্যে তিনটি প্রধান পথ হল, মানুষের ঔদাস্য, ক্রোধ ও কাম। একটু উদাসীন অথবা ক্রোধান্বিত হলে শয়তান যেমন সত্বর মনের সিংহাসনে আরোহণ করে মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করে বিপদে ফেলে থাকে, ঠিক তেমনি কাম ও কামনার ছিদ্রপথে প্রবেশ করে শয়তান প্রবৃত্তি-পূজায় লিপ্ত করে মানুষকে। তার মনে নতুন নতুন বাসনা সৃষ্টি করে এবং

সেই বাসনা চরিতার্থ করার বিভিন্ন উপায়-উপকরণও বাতলে দেয়। গান-বাজনা এমনই এক শয়তানী উপকরণ, যার মাধ্যমে মানুষ তার কামনা-বাসনায় পরিপূর্ণ জ্বালাময় হৃদয়ে অপূর্ব শান্তির দিশা পায়। নিরানন্দ চিত্তে আনন্দের তুফান আনতে সক্ষম হয়। আর এরই মাঝে শয়তান ঐ মানুষের মনে গাফলতি ও ঔদাস্য সৃষ্টি করতে আরো সহজ রাস্তা পায়। এর ফলে ধীরে-ধীরে সে মানুষকে তার আসল প্রভুর স্মরণ ও দাসত্ব থেকে দূরে সরিয়ে এনে নিজের দাস বানিয়ে নিতে কৃতার্থ হয়।

কিছু যুবক আছে; যাদেরকে দ্বীনের কাজে আসতে বললে তারা বলে, 'কি করি? সময় পাই না।' অথচ যখন তাকে তাস, কেরাম বা দাবা খেলাতে অথবা গান-বাজনা শুনতে দেখে যদি বলা হয় যে, 'এ কাজ কেন করছ? এ তো হারাম!' তখন চট্ করে সে বলে, 'কি করি বলুন? সময় তো কাটাতে হবে!' এমন মানুষ দ্বীনের কথা শোনার জন্য সময় পায় না, আবার তার হাতে এত জ্বালাময় সময় আছে যে, তা কোন মন-মাতানো, হৃদয়-ভুলানো উদাসকারী বিষয় ছাড়া কাটতেই চায় না। এমন মানুষের মনে শয়তানের বড় প্রভাব থাকে। এ ধরনের পরস্পর-বিরোধী জবাব দিয়ে সে শুধুমাত্র পিছল কেটে নিজ দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষতি সাধন করে থাকে। কখনো বা গান-বাজনার নেশায় সংসারের কাজ ও কর্তব্য ভুলে বা ছেড়ে বসে। অবহেলা প্রদর্শন করে সামাজিক কাজেও।

এস, এবারে দেখা যাক্ 'কোন্ কিতাবে আছে রে ভাই হারাম বাজনা-গান?'

কুরআন শরীফের সূরা লুকমানের ৬নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, "এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে অন্ধভাবে অসার বাক্য ক্রয় করে (বেছে নেয়) এবং আল্লাহর প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।"

প্রায় সকল তফসীর-কিতাবে এই আয়াতের তফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসঊদ (রাঃ) তিন তিনবার কসম খেয়ে খেয়ে বলেছেন, 'উক্ত আয়াতে 'অসার বাক্য' বলতে 'গান'কে বুঝানো হয়েছে। অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এবং জাবের (রাঃ) ও ইকরামা (রঃ) হতে।

গান হল অসার, অবান্তর, অশ্লীল ও যৌন-উত্তেজনামূলক অথবা শির্কী ও বিদআতী কথামালাকে কবিতাছন্দে সুললিত ও সুরেলি কণ্ঠে গাওয়া শব্দধ্বনির নাম। যা ইসলামে হারাম। হারাম তা গাওয়া এবং হারাম তা শোনাও। গানে হৃদয় উদাস হয়, রোগাক্রান্ত ও কঠোর হয়। গান হল 'ব্যভিচারের মন্ত্র', অবৈধ ভালোবাসার আজব আকর্ষণ সৃষ্টিকারী যন্ত্র। তাই তো "মহানবী ﷺ নগ্নতা ও পর্দাহীনতা এবং গানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে' ৬৯১৪ নং)*

মিউজিক বা বাজনা শোনাও মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। কারণ, বাজনা-ঝংকারও মানুষের মন মাতিয়ে তোলে, বিভোরে উদাস করে ফেলে এবং উন্মত্ততায় আন্দোলিত করে। সবচেয়ে শুদ্ধ হাদীসের কিতাব বুখারী শরীফে, মহানবী ﷺ বলেন, "অবশ্যই আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় হবে; যারা ব্যভিচার, (পুরুষের জন্য) রেশমবস্ত্র, মদ এবং বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার (হারাম হওয়া সত্ত্বেও) হালাল মনে করবে।" *(বুখারী ৫৫৯০, আবূ দাউদ, তিরমিযী,*

দারেমী, সহীহুল জামে' ৫৪৬৬ নং)

তিনি বলেন, "অবশ্যই আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে, তাদের মাথার উপরে বাদ্যযন্ত্র বাজানো হবে এবং নর্তকী নাচবে। আল্লাহ তাদেরকে মাটিতে ধসিয়ে দেবেন এবং বানর ও শূকরে পরিণত করবেন!" *(ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, ত্বাবারানী, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে' ৫৪৫৪ নং)*

তিনি আরো বলেন, "অবশ্যই আমার উম্মতের মাঝে (কিছু লোককে) মাটি ধসিয়ে, পাথর বর্ষণ করে এবং আকার বিকৃত করে (ধ্বংস করা) হবে। আর এ শাস্তি তখন আসবে, যখন তারা মদ পান করবে, নর্তকী রাখবে এবং বাদ্যযন্ত্র বাজাবে।" *(সহীহুল জামে' ৩৬৬৫, ৫৪৬৭ নং)*

প্রিয় নবী ﷺ আরো বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ আমার উম্মতের জন্য মদ, জুয়া, ঢোল-তবলা এবং বীণা-জাতীয় বাদ্যযন্ত্রকে হারাম করেছেন।" *(আহমাদ, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৭০৮ নং)*

অন্য এক হাদীসে মহানবী ﷺ বলেন, "ফিরিশ্তা সেই কাফেলার সঙ্গী হন না; যে কাফেলায় ঘন্টার শব্দ থাকে।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে' ৭৩৪২ নং)*

আর এক বর্ণনায় তিনি বলেন, "ঘন্টা বা ঘুঙুর হল শয়তানের বাঁশি।" *(মুসলিম২১১৪, আবূ দাউদ ২৫৫৬ নং)*

সুতরাং বলাই বাহুল্য যে, যে কাফেলা, অনুষ্ঠান, মিছিল, মিটিং, বিয়ে বা দাওয়াতে মিউজিক থাকে অথবা কোন বাদ্যযন্ত্র বা রেকর্ডের গান-বাজনা থাকে, সেখানে অবশ্যই ফিরিশ্তার স্থানে শয়তান আশ্রয় নেয়। তাই এমন শয়তানী অনুষ্ঠানে যোগদান করাও মুসলিমের জন্য অবৈধ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'ঢোলক হারাম, বাদ্যযন্ত্র হারাম, তবলা হারাম এবং বাঁশীও হারাম।' *(বাইহাকী)*

হযরত হাসান বাসরী (রঃ) বলেন, 'ঢোলক মুসলিমদের ব্যবহার্য নয়। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসউদের সহচরগণ ঢোলক দেখলে ভেঙ্গে ফেলতেন।' *(দেখুন, তাহরীমু আলাতুত ত্বার্ব, আলবানী)*

উল্লেখ্য যে, বহু জাহেল মনে করে থাকে যে, হযরত দাউদ নবী (আঃ) বাঁশীর সুরে জগতের মানুষকে মোহিত করতেন! অতএব বাঁশীর সুর বা মিউজিক হারাম হওয়ার কথা নয়।

এ কথা মনে রাখা দরকার যে, একজন নবীর উপর কলঙ্ক ও অপবাদ দেওয়া সাধারণ গোনাহর কাজ নয়। আর কেবলমাত্র ধারণা করে কথা বলাও মহাপাপ। বলা বাহুল্য, হযরত দাউদ (আঃ) বংশীবাদক ছিলেন না। তবে যবূর পাঠের সময় তাঁর কণ্ঠ বড় মিষ্ট ছিল। আর তার সুরেই লোকে মোহিত হত।

তাছাড়া মহানবীর শরীয়তে যা হারাম ঘোষিত হয়েছে, তা পূর্ববর্তী কোন নবীর আমলে হালাল থাকলেও শেষ নবীর উম্মতীর জন্য তা হারাম।

পক্ষান্তরে সুর করে আযান দেওয়া, কুরআন পাঠ করা বা ইসলামী গজল আবৃত্তি করা বিধেয় ও বৈধ হলেই সুর করে অসার-অশ্লীল কথা গাওয়া বৈধ হতে পারে না। এ শ্রেণীর বক্তারা বলতে চায় যে, 'মদ যদি হারাম হল, তাহলে তোমরা কেন দুধ খাও বল?' অর্থাৎ, দুধ পান হালাল হলে, মদ পানও হালাল। কারণ, উভয়ই তো পানীয়। কিন্তু জ্ঞানী সুধীজন ঐ শ্রেণীর প্রবৃত্তিপূজারীদের এমন হাস্যকর যুক্তি ভ্রান্ত বলেই আদৌ ভ্রূক্ষেপ ও গ্রাহ্য করেন না।

তাঁরা অবশ্যই দুধ ও মদের মাঝে অতি সহজে পার্থক্য নির্বাচন করতে পারেন।

এক হাদীসে সর্বশেষ নবী ﷺ বলেন, "ইহ-পরকালে দুটি শব্দ-ধ্বনি অভিশপ্ত; সুখ ও খুশীর সময় বাঁশীর শব্দ এবং মসীবত, শোক ও কষ্টের সময় হা-হুতাশ ধ্বনি।" *(সহীহুল জামে' ৩৮০১, সিলসিলাহ সহীহাহ ৪২৭ নং)*

'গানে জ্ঞান বাড়ে' কথাটিও নিছক প্রবৃত্তিপূজকের তরফদারিমূলক যুক্তিহীন উক্তি। কারণ, জ্ঞানের উৎস গান নয়। জ্ঞানের উৎস হল কুরআন। অবশ্য অবৈধ প্রণয় ও ভালো-বাসার জ্ঞান লাভ করার এক উপযুক্ত মাধ্যম ও প্রধান উৎস বটে।

অনেকের ধারণা যে, 'গান হল রূহের খোরাক।' দুশ্চিন্তা ও কষ্টের সময় জ্বালাময় হৃদয়ের পোড়া-ঘায়ের মলম!

অথচ প্রকৃতপ্রস্তাবে গান হল, 'প্রেম-পীড়িত' রূহের খোরাক। কারণ, প্রেমে থাকে মাদকতা। বনের ময়ুর নাচার মত হৃদয়ের মঞ্চে প্রেমের রুনুঝুনু নাচ আছে। আর সে নাচের সাথে তাল মিলায় ঐ গান-বাজনা। তাছাড়া অবৈধ প্রেম ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে শয়তান। তাই শয়তানের বাণীর মাঝেই পিরীতের জ্বালাময় অন্তরে মিঠা-পানির আস্বাদ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে কুরআন হল রহমানের বাণী। আর তা হল মুসলিম রূহের একমাত্র খোরাক।

বিরহ বেদনাহত বহু যুবক, যাদের স্ত্রী (কাছে) নেই, অনুরূপ বহু যুবতী, যাদের স্বামী (কাছে) নেই, তারা গান-বাজনা শুনে (অনেকে বা গেয়ে-বাজিয়ে) মনকে 'ফ্রি', স্থির ও সান্ত্বনিত করতে চায়। এরা কিন্তু আসলে মনের তাপকে গানের আগুন দিয়ে ঠান্ডা করতে চায়। যার ফলে সেই তাপ আরো বৃদ্ধি পায়। কারণ, অধিকাংশ গান হল প্রেমমূলক; প্রেমকাহিনী, প্রেম-মিলন, বিরহ-বেদনা, মিলন-আবেদন, নারী-সৌন্দর্য প্রভৃতি যৌন-জীবনের গাঁথা কথাই গানে গাওয়া হয়ে থাকে। যা শুনে যৌনক্ষুধা আরো বেড়ে যায়। ছাই-চাপা প্রেমের আগুন গানের বাতাসে গন্‌গন্ করে জ্বলে উঠে ফিন্‌কি উড়াতে শুরু করে। আর তখনই মন চুরি করে গোপনে স্বামী বা স্ত্রীর খেয়ানত করে বসে অথবা করতে চায়! মনের জ্বালা মিটাবার জন্য দূরের বন্ধুর প্রতীক্ষা করতে আর ধৈর্য থাকে না।

বলা বাহুল্য, এ জন্যই সুবিজ্ঞ সাহাবী বলেন, 'গান হল ব্যভিচারের মন্ত্র।' অতএব গানে কক্ষনই মন সান্ত্বনিত হয় না; বরং আরো বিক্ষিপ্ত, চিন্তিত ও উত্তেজিত হয়। দগ্ধ, অস্থির ও ব্যাকুল মনকে শান্ত ও স্থির করতে হলে মনের সৃষ্টিকর্তার 'প্রেস্‌কিপ্‌শন' নিতে হবে। তিনি বলেন, "যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিক্‌রে (স্মরণে) প্রশান্ত থাকে। আর জেনে রাখ, আল্লাহর যিক্‌রেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।" *(সূরা রা'দ ২৮ আয়াত)*

পক্ষান্তরে যারা এর বিপরীত কাজ করে, তাদের ফলও হয় উল্ট। মহান আল্লাহ সে কথাও বলেন যে, "যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর যিক্‌র (স্মরণে) বিমুখ হয়, তিনি তার জন্য নিয়োজিত করেন এক শয়তানকে। অতঃপর সেই হয় তার সহচর। শয়তানরাই মানুষকে সৎপথ হতে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে তারা সৎপথে পরিচালিত হচ্ছে। যখন সে আমার নিকট উপস্থিত হবে, তখন সে শয়তানকে বলবে, 'হায়! আমার ও তোমার মাঝে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান হত!' কত নিকৃষ্ট সে সহচর।" *(সূরা যুখরুফ ৩৬-৩৮ আয়াত)*

যুবক ও যৌবন

'এই যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবি কি দিয়া বালির বাঁধ?
কে রোধিবি এই জোয়ারের টান গগনে যখন উঠেছে চাঁদ?'

যৌবনে পদার্পণ করার সাথে সাথে যৌনানুভূতি ও যৌন-চিন্তা সহ যৌন-উন্মাদনার মানসিক আন্দোলন প্রাণী-জগতের এক প্রকৃতিগত ব্যাপার। মনের ভিতর বেড়ে ওঠে যৌন-ক্ষুধা, কেমন এক প্রকার অস্থিরতা, ক্ষিপ্ততা ও অস্বস্তিকর চাঞ্চল্য। মন চায় কিছু ভাবতে, কাউকে কাছে পেতে এবং তার কাছে মনের কথা খুলে বলতে, মন চায় আকাশ-কুসুম কল্পনা করতে। হৃদয় যেন উচ্ছৃঙ্খল হতে চায়, চায় সকল প্রকার বাধা ও লাগাম অমান্য করতে।

কিন্তু না। ইসলাম এ সময়ের জন্য নিয়ন্ত্রণ-রেখা এঁকে দিয়েছে। এনেছে নৈতিকতা এবং শৃংখলতার বিভিন্ন বিধি-নিয়ম। তাই মুসলিম যুবক লাগামহীন উচ্ছৃঙ্খল নয়। নয় নিয়ন্ত্রণহারা খেয়াল-খুশীর পূজারী। আর "আল্লাহ তাআলা সেই যুবককেই পছন্দ করেন ও ভালোবাসেন, যার যৌবনে কোন কুপ্রবৃত্তি ও ভ্রষ্টতা নেই।" *(আহমাদ)*

কিন্তু যুবকের বর্তমান পরিবেশ এমন যে, সেখানে তার যৌন-চেতনা বৃদ্ধি করা হয়। সময় হওয়ার পূর্বেই যুবকের যৌবন বেসামাল গতিতে এসে উপস্থিত হয় তার দেহ-মনে। যৌনানুভূতিতে সুড়সুড়ি দেওয়া হয়। প্রলুব্ধ ও উত্তেজিত করা হয় তার কামনাময় হৃদয়কে। বাড়ির বাইরে, রাস্তা-ঘাটে, হাটে-বাজারে, ট্রেনে-বাসে যুবতীর সৌন্দর্য অনায়াসে চোখে পড়ে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুরভিতার দেহের সাথে দেহ স্পর্শ হয়। নগ্নতা ও পর্দাহীনতার ফলে মহিলার রূপ যুবকের হৃদয়-মনে ছোঁয়া দেয়, দোলা দেয়।

বাড়িতে টিভির পর্দায় যা প্রদর্শিত হয় তাও নগ্নতা ও অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ। কেউ কেউ সানুগ্রহে দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখে অভিনেত্রীদের অর্ধনগ্ন ছবি। প্রায় প্রত্যেক পণ্যদ্রব্যের প্যাকেটে ও প্রচারে ব্যবহার করা হয় অর্ধনগ্না সুদর্শনা নারীর ছবি। পত্র-পত্রিকার প্রচ্ছদ তথা পাতায় পাতায় নজরে পড়ে ঐ একই দৃশ্য। তা পড়তে গিয়েও পাওয়া যায় বিভিন্ন শ্রেণীর যৌন-উত্তেজনামূলক কাল্পনিক গল্প, কাহিনী ও ঘটনা। স্কুল-কলেজে যুবক-যুবতীর অবাধ সংসর্গ ও মিলামেশা। অফিসে গেলেও ঐ একই অবস্থা। ফলে যুবকের জন্য সুচিন্তায় মনকে ধরে রাখা এত কঠিন হয়েছে যে, তার চাইতে হাতে আগুনের আঙ্গার রাখা অতি সহজ ব্যাপার! কুচিন্তা করবে না বলে মনকে সুদৃঢ় করলেও তার উপায়-উপকরণ এত সহজলব্ধ যে, তার গতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সত্যই সুকঠিন।

যুবক বন্ধু! যদি তোমার জীবনে এমন কঠিন পরীক্ষা এসেই থাকে, তবে ঐ কুচিন্তাকে যেন মনের মণিকোঠায় স্থান দিয়ে বসো না। পাথরের উপর থেকে যেমন বৃষ্টির পানি অতি সহজে গড়িয়ে যায়, ঠিক তেমনি ঐ নারী বা যৌন-চিন্তাও যেন তোমার মনের পাথরে স্থান না পায়। চলার পথে কোন নারী যদি তোমার মনে কুচিন্তার সূত্রপাত করেই যায়, তবুও তুমি সেই সুতো নিয়ে

যেন নির্জনে থেকে কোন কামনার জাল বুনতে শুরু করে দিও না। তোমার মনকে ধরার জন্য যদি কেউ জাল বিছিয়ে অপেক্ষাও করতে থাকে, তবুও তুমি 'ফাঁদ-ছাড়া বক'এর মত অবশ্যই নিজেকে বাঁচিয়ে নিও। খবরদার! ঐ কুচিন্তার কাছে আত্মসমর্পণ করো না। নচেৎ ঐ চিন্তার পথে মনের লাগাম ছেড়ে দিলে, সে লাগাম শয়তানের হস্তগত হয়ে তোমাকে এমন স্থানে যেতে বাধ্য করবে, যেখানে তোমার ধ্বংস অনিবার্য।

মনের জল্পনা-কল্পনা তোমার সম্মুখে উড়ন্ত একটি পাখির মত। পাখিটিকে উড়তে দিলে সে তার উড়ার পথ অবশ্যই অতিক্রম করবে। আর যদি তাকে উড়তে না দিয়ে শিকার করে অথবা পিঞ্জরাবদ্ধ করে ফেল, তাহলে সে তোমার আয়ত্তাধীন হয়ে যাবে।

অতএব তোমার মনের ভিতরে কোন মন্দ কল্পনা এলে তা সত্বর দূর করে ফেল, যদি তা না কর তাহলে জেনে রেখো, তা চিন্তায় পরিণত হবে। চিন্তাকেও মনে বিচরণ করার সুযোগ দিও না, নচেৎ তা বাসনা ও কামনায় পর্যবসিত হয়ে যাবে। যদি তা হয়েই থাকে, তাহলে সে কামনাকেও নিবৃত্ত কর, নচেৎ তা দৃঢ়-সংকল্পে পরিণত হবে। এই পরিকল্পনাকেও পরাভূত কর, নচেৎ তা কর্মে পরিণত হয়ে যাবে। আবার কর্মকেও প্রতিহত না করতে পারলে তা অভ্যাসে পরিণত হবে। আর কোন কর্ম অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে কখনো তুমি তার কবল থেকে রেহাই পেতে পারবে না। *(আল-ফাওয়াইদ, ইবনুল কাইয়েম)*

হ্যাঁ, সত্যই তো। কল্পনার চারাগাছ, যা এইমাত্র বেড়ে উঠেছে, তাকে সহজেই হাত দিয়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে পার। কিন্তু সেই বটবৃক্ষ বড় হওয়ার পর তাকে ক্রেন লাগিয়েও তুলতে পারবে না। মনের মাটি থেকেও এমন অভ্যাসের বনস্পতি তোলা কম দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়।

হে কল্পনাবিহারী যুবক বন্ধু! ফিরিশ্তার জ্ঞান আছে, কিন্তু প্রবৃত্তি নেই। পশুর জ্ঞান নেই, কিন্তু প্রবৃত্তি আছে। আর মানুষের জ্ঞান ও প্রবৃত্তি দু'ই আছে। সুতরাং যার প্রবৃত্তি সংযত ও নিয়ন্ত্রিত এবং জ্ঞান আলোকিত, সে হল ফিরিশ্তার মত মানুষ। পক্ষান্তরে যার জ্ঞান অনুজ্জ্বল এবং প্রবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল, সে হল পশুর মত জীব। অতএব তুমি চেষ্টা কর, যাতে ফিরিশ্তার গুণের কাছাকাছি মানুষ হতে পার।

যখনই তোমার মন তোমার খেয়ানত করতে চায় এবং কোন পাপ করার পরিকল্পনা করে, তখনই মনকে আল্লাহর স্মরণ দিয়ে ক্ষান্ত কর। কিন্তু তাতে যদি তোমার মন ক্ষান্ত না হতে চায়, তাহলে সৎচরিত্রবাণ্ মানুষদের চরিত্র স্মরণ করিয়ে নিবৃত্ত কর। তাতেও যদি নিবৃত্ত না হতে চায়, তাহলে এই ভেবে তাকে পরাস্ত কর যে, তোমার এই পাপ-পরিকল্পনার কথা লোক-সমাজে প্রকাশ পেলে তুমি লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। তোমার ও তোমার বংশের দুর্নাম রটবে। এখনো যদি তুমি তোমার মনকে ক্ষান্ত না করতে সক্ষম হও এবং পার্থিব অপমানেরও যদি ভয় তোমার মনে না আসে, তাহলে জেনে নিও যে, তোমার মনোবৃত্তি এবারে পশুবৃত্তিতে পরিণত হয়ে গেছে। *(হাকাযা আল্লামাতনিল হায়াহ ২৭পৃঃ)*

সুতরাং মন্দ চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনা থেকে দূরে থাক। যখনই কোন প্রকার যৌন-চিন্তা তোমার হৃদয় মাঝে প্রবেশ করতে চায়, তখনই তুমি তোমার হৃদয়দ্বার বন্ধ করে দাও। আর সেই চিন্তা শুরু করে দাও, যা তোমার দুনিয়া ও আখেরাতে কাজে দেবে। চিন্তা কর, আল্লাহর বড় বড় সৃষ্টি নিয়ে; বিশাল সমুদ্র, সুউচ্চ পর্বতমালা, দিগন্ত-প্রসারী মেঘমালা, ভয়াবহ বজ্র-বিদ্যুত ও আগ্নেয়গিরী, নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য ও জলপ্রপাত, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্ররাজি ইত্যাদি নিয়ে। আল্লাহর বড়ত্ব ও শক্তিমত্তা নিয়ে, আখেরাত ও কবর নিয়ে এবং মুসলিম জাতির বর্তমান দুঃখজনক পরিস্থিতি নিয়ে।

নজরবাজি

পার্থিব জগৎ তথা আমাদের পরিবেশের অবস্থা এই যে,

'ফুলে-ফুলে সেথা ভুলের বেদনা, নয়নে-অধরে শাপ,
চন্দনে সেথা কামনার জ্বালা, চাঁদে চুম্বন-তাপ!
সেথা কামিনীর নয়নে কাজল, শ্রোণীতে চন্দহার,
চরণে লাক্ষা, ঠোঁটে তাম্বুল, দেখে মরে আছে মার!
প্রহরী সেখানে চোখা চোখ নিয়ে সুন্দর শয়তান,
বুকে-বুকে সেথা বাঁকা ফুল-ধনু, চোখে চোখে ফুল-বাণ।'

এমন মনোহর পরিবেশ বিশেষ করে যুবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং মনকে মুগ্ধ করবে - সেটাই স্বাভাবিক। চোখে-চোখে চোখাচোখি হয়ে প্রেমের ঝিলিক মারবে, দৃষ্টির কুহকে পড়ে মন চুরি হবে, নজর-বাণ মেরে একে অপরকে ঘায়েল করবে, নয়নের যাদু অপরকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখবে -এটাই আমাদের পরিবেশের প্রকৃতি।

কিন্তু হে সুনয়ন নবীন বন্ধু আমার! এই নজরবাজি হল তোমার জন্য বড় ফিতনার বিষয়। এই নজর কত ব্যভিচার ও অশ্লীলতায় নামিয়েছে, কত আবেদের ইবাদত নষ্ট করেছে, কত হাকীমের হিকমত দিয়েছে হারিয়ে।

'নয়না এখানে যাদু জানে সখা, এক আঁখি-ইশারায়,
লক্ষ যুগের মহা-তপস্যা কোথায় উবিয়া যায়!'

দৃষ্টি হল হৃদয়ের আয়না। হৃদয়ে কামনার ছবি চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে। বান্দা দৃষ্টি অবনত করলে তার মন ও ইচ্ছা শান্ত ও সংযত থাকে। চোখের লাগাম ছেড়ে দিলে হৃদয়ের ডোরও লম্বা হয়ে ছাড়া যায়। বেগানা মহিলার উপর দৃষ্টি পড়া স্বাভাবিক ব্যাপার। মুসলিম যুবকের জন্য যা অস্বাভাবিক তা হল, দৃষ্টি ফিরিয়ে না নেওয়া অথবা বারবার দৃষ্টিপাত করা।

নারীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ হল একটি বীজ বপনের মত। মাটিতে ফেলার পর যদি তার প্রতি আর ভ্রূক্ষেপ না করা হয়, তাহলে অচিরেই তা শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ফেলার পর তার উপর পানি-সিঞ্চন দেওয়া হলে সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়, আকার নেয় বড় গাছের। অনুরূপ কোন সুবদনার উপর নজর পড়লে তা ফিরিয়ে নিয়ে মনের কোণে সে ছবিকে স্থান না দিলে তাতে কোন ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু যদি দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার সেই মুখশ্রীর প্রতি নজর দৌড়ানো হয়, তাহলে মনের জমিতে সেই নজর-বীজ থেকে অঙ্কুরিত হয় অবৈধ প্রেমের চারাগাছ। এরপর আরো বারবার নজরের সেচ, ইশারা ও চোখ মারার খোঁড়, মুচকি হাসির সার ইত্যাদি দিয়ে যত্ন নিলে ধীরে-ধীরে বেড়ে ওঠে সেই গাছ। তখন তার শিকড় মোটা ও শক্তিশালী হলে মনের পলস্তরা করা মেঝে ও দেওয়াল ফাটিয়ে তোলে।

এ জন্যই সমাজ-বিজ্ঞানী নবী ﷺ বলেন, "একবার নজর পড়ে গেলে আর দ্বিতীয়বার তাকিয়ে দেখো না। প্রথমবারের (অনিচ্ছাকৃত) নজর তোমার জন্য বৈধ। কিন্তু দ্বিতীয়বারের

নজর বৈধ নয়। *(আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাকেম, সহীহুল জামে' ৭৯৫৩ নং)*

হযরত জারীর (রাঃ) আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'কোন মহিলার উপর আমার আচমকা নজর পড়ে গেলে আমি কি করব?' তিনি বললেন, "তোমার নজর ফিরিয়ে নাও।" *(আহমাদ, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সহীহুল জামে' ১০১৪ নং)*

বলা বাহুল্য এ কারণেই মহিলাদেরকে বেগানার সামনে নিজের চেহারা গোপন করতে আদেশ করা হয়েছে। যাতে এক হাতে তালি না বাজে এবং বাঁশ না থাকার ফলে বাঁশরী বাজার কোন আশঙ্কা অবশিষ্ট না থাকে।

এই নজরই নজরবাজদেরকে নিয়ে যায় ব্যভিচারের দিকে। নজরই হল ব্যভিচারের প্রথম বুনিয়াদ ও ভূমিকা। এই ছোট্ট অঙ্গার টুকরা থেকেই সূত্রপাত হয় বিরাট অগ্নিকান্ডের। একবারের দর্শন দর্শকের শয়নে-স্বপনে-নিশি-জাগরণে তার স্মৃতিপটে ভেসে ভেসে ওঠে এবং শুরু হয় নানা কল্পনা, নানা আশা ও কামনা। আর দৃষ্টি ও চোখের ইশারার সাথে সাথে যদি একটু মুচকি মধুর হাসি থাকে, তাহলে ঐ হাসির ভিতরেই ফাঁসী। তারপরই সাক্ষাৎ ও সালাম। অতঃপর মনের কথা প্রকাশ এবং সময় ও স্থান নির্ধারণ। অতঃপর নৈতিকতার বিনাশ সাধন।

এমন অশ্লীলতাকে সমূলে ধ্বংস করার জন্যই বীজ অবস্থাতেই তা নষ্ট করে ফেলতে আদেশ এল কুরআন মাজীদে। মহান আল্লাহ বলেন, "মু'মিন পুরুষদেরকে বল, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে; এটিই তাদের জন্য উত্তম। ওরা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। আর মু'মিনা নারীদেরকে বল, তারাও যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে---।" *(সূরা নূর ৩০-৩১ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "চোখ দু'টিও ব্যভিচার করে। আর তার ব্যভিচার হল, (কাম-নজরে নারীর সৌন্দর্যের প্রতি) দৃষ্টিপাত করা। কান দু'টিও ব্যভিচার করে। আর তার ব্যভিচার হল, (যৌন-কথা) শ্রবণ করা। জিভও ব্যভিচার করে। আর তার ব্যভিচার হল, (যৌন-কথা) বলা। হাতও ব্যভিচার করে। আর তার ব্যভিচার হল, সকামে স্পর্শ করা। ব্যভিচার করে পা দু'টিও। আর তার ব্যভিচার হল, (যৌনক্রিয়ার উদ্দেশ্যে) হেঁটে যাওয়া।" *(মিশকাত ৮৬ নং)*

তরুণ বন্ধু আমার! সৃষ্টির প্রকৃতি এই যে, আলো চাল দেখলে ভেঁড়ার মুখ চুলকায়, টক বা তেঁতুল দেখলে মুখে পানি আসে। এই প্রকৃতিকে দমন করা কঠিন হলেও করতে হবে। তবে দমনের আগে যদি মূল কারণ ধ্বংস করা সম্ভব হয়, তবে সেটাই উত্তম। সেটা আমাদের এখতিয়ারে আছে। আর তা হল এই যে, আমরা কোন অবৈধ নারীর প্রতি দৃকপাত করব না। হঠাৎ নজর পড়ে গেলে সত্বর ফিরিয়ে নেব। দেখব না কোন নারীর ছবি, ফিল্ম, নাটক, যাত্রা প্রভৃতি নারীর প্রদর্শনী।

যারা ধর্ষণের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করে ও ধর্ষণকে মন্দ জানে, তাদের উচিত, নগ্নতাকে মন্দ জানা এবং পর্দা-প্রথার প্রচলন করা। কারণ, চোখের ও মুখের সামনে তেঁতুল কচলাব এবং যার মুখে পানি আসবে তাকে শাস্তি দেব -এমন যুক্তি ভ্রান্ত।

'আজব কবিরাজ তুমি দেখি এ ভূবনে,
খাটার পেয়ালা রাখ রোগীর সামনে!'

আগুনের কাছে মোম রাখলে গলে তো যাবেই। তবে তাদের গোড়া কেটে ডগায় পানি ঢালার কি যুক্তি হয়?

যে পরিবেশে অবৈধ প্রণয়-সূত্র গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা হয় বিভিন্ন উপায়ে, প্রচার-মাধ্যম সহ দেশীয় তাগূতী আইনেও এ প্রেমকে বৈধ ও প্রশংসনীয় কর্ম বলে মনে করা হয়, উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি ও প্রেম-ঘটিত অবৈধ যৌনাচার ব্যভিচারকে কোন অপরাধ বলে মনে করা হয় না, পরন্তু গোটা বিশ্বজুড়ে এমন পরিবেশ গড়ে উঠেছে, যাতে 'বিশ্ব-ভালোবাসা দিবস' পালিত হচ্ছে, সে পরিবেশে বাস করে যুবক আর নিজেকে কতটা পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে?

অবশ্য সে যুবকের জন্য পূর্ণ পরিমাণে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব, যে যুবকের বুকে আছে নিয়ন্ত্রক যন্ত্র পরিপূর্ণ ঈমান এবং ইসলামী নৈতিকতা।

হে নবীন তরুণ বন্ধু আমার! সদা-সর্বদা এ কথা মনে রেখো যে, মহান প্রতিপালক সর্বদা তোমার প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি রেখেছেন। তিনি প্রত্যেক বান্দার সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত। "চক্ষুর চোরা চাহনি এবং অন্তরের গোপন কথা তিনি জানেন।" *(সূরা মু'মিন ১৯ আয়াত)*

তিনি বলেন, "আর অবশ্যই আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার অন্তরে নিভৃত কুচিন্তা সম্বন্ধে আমি অবহিত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর। স্মরণ রেখো, দুই ফিরিশ্তা তার ডান ও বামে বসে তার কাজকর্ম লিপিবদ্ধ করে থাকে।" *(সূরা ক্বাফ ১৬-১৭ আয়াত)*

মনে রেখো বন্ধু! যে চোরা চক্ষু দ্বারা তুমি অবৈধ মহিলার রূপ দর্শন-তৃপ্তি উপভোগ করবে, সেই চক্ষু কাল কিয়ামতে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষি দেবে। মহান আল্লাহ বলেন, "পরিশেষে যখন ওরা দোযখের নিকটে পৌঁছবে তখন ওদের চোখ, কান ও দেহের চামড়া ওদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে।" *(সূরা ফুস্‌সিলাত ২০ আয়াত)* আর ভুলে যেও না যে, "নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় -ওদের প্রত্যেকের নিকট (বিচার-দিবসে) কৈফিয়ত তলব করা হবে।" *(সূরা ইসরা ৩৬ আয়াত)*

তুমি কি চাও না পরিত্রাণ ও আল্লাহর ভালোবাসা? মহান আল্লাহ বলেন, "যখন আমি আমার বান্দাকে ভালোবাসতে শুরু করি, তখন আমি তার শোনার কান, দেখার চোখ, ধরার হাত হয়ে যাই -----।" *(বুখারী)*

অর্থাৎ, যদি তোমার মাঝে আল্লাহর ভালোবাসা আনতে চাও, তাহলে তোমাকে তোমার চোখ দ্বারা কেবল সেই জিনিস দেখা উচিত, যা দেখলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। আর সে জিনিস মোটেই দেখা উচিত নয়, যা দেখলে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে যান। প্রিয় বন্ধুর ইচ্ছা অনুযায়ী না চললে কি বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা থাকে?

ছল চাহনির বন্ধু আমার! যদিও মনে কর যে, 'দিল্ হ্যায় কে মান্‌তা নেহী' তবুও তুমি তোমার মনের বিরুদ্ধে জিহাদ কর। দৃষ্টিকে সংযত রাখার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাও। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথে সর্বপ্রকার সাধনা ও সংগ্রাম কর। সমস্যার সমাধানের পথ তিনি সহজ করে দেবেন। তিনি বলেন, "যারা আমার পথে সংগ্রাম (ও সাধনায় আত্মনিয়োগ) করে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করি। আর নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথের সাথী।" *(সূরা আনকাবূত ৬৯ আয়াত)*

আর মহানবী ﷺ বলেন, "সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জিহাদ হল, নিজের মন ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে

জিহাদ।” *(সহীহুল জামে’ ১০৯৯ নং)*

কোন কিছুর উপর ধৈর্য ধারণ করার চেষ্টা করলে আল্লাহ ধৈর্য ধরার তওফীক দিয়ে থাকেন। পীড়িত হৃদয়ে সবর দান করে থাকেন। *(বুখারী)* সুতরাং মনের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে ধৈর্যের সাথে দৃষ্টি সংযত রাখতে অভ্যাসী হও। পবিত্রতার পথ তোমার জন্য সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

চঞ্চল-মনা বন্ধু আমার! এমন জায়গায় বসো না, যে জায়গায় বসলে তোমার নজর নিয়ন্ত্রণে রাখতে কষ্ট হয়। মহানবী ﷺ বলেন, “খবরদার! তোমরা রাস্তার ধারে বসো না। আর একান্তই যদি বসতেই হয়, তাহলে তার হক আদায় করো।” লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ‘রাস্তার হক কি? হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “দৃষ্টি সংযত রাখা, কাউকে কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেওয়া, সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান করা (এবং পথভ্রষ্টকে পথ বলে দেওয়া)।” *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, সহীহুল জামে’ ২৬৭৫ নং)*

অনুরূপ বাড়ির ছাদে বা এমন উঁচু জায়গায় বসতেও নিষেধ করেছেন আমাদের আদর্শ নবী মুহাম্মাদ ﷺ। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৬/১৪-১৫)*

এই আদেশ ছিল সেই যুগের; যে যুগের মহিলাদের কোন গোপনীয় অঙ্গ -এমন কি চেহারা পর্যন্ত দেখা যেত না। যারা পথে চলার সময় নিজেদেরকে প্রদর্শন করার বা পর-পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মনোভাব রাখত না। রাস্তার এক ধার ঘেসে এমনভাবে চলত যে, দেখে মনে হত, তারা দেয়ালের সাথে মিশে যাচ্ছে! পরন্তু উক্ত আদেশ ছিল সেই যুবক ও পুরুষদের জন্য, যাঁরা ছিলেন প্রকৃত আলোকপ্রাপ্ত আল্লাহ-ভীরু মানুষ। যাঁরা পথের ধারে বা কোন উঁচু জায়গায় বসে বসে মহিলা দেখবেন, এমন কথা কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল। সুতরাং আমাদের এই বর্তমান নগ্নতা ও ঈমান-দুর্বলতার যুগে সে আদেশ কত বড় গুরুত্ব রাখতে পারে, তা অনুমেয়। যে যুগের ‘লারে-লাপ্পা’ মার্কা যুবতী, ‘টৌ-টৌ’ কোম্পানী মহিলা এবং বেসামাল নগ্ন পোশাকে নিজেদেরকে প্রদর্শন করে যুবককে আকর্ষণকারিণী তরুণীদল রাস্তায়-রাস্তায় বিনা বাধায় বুক ফুলিয়ে ও আংশিক খুলে হাওয়া খেয়ে বেড়ায়, যারা নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য ও আধুনিক ডিজাইনের কুরুচিসম্পন্ন পোশাক, প্রসাধন ও সাজ-সজ্জায় বিজাতীয় মহিলাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা করে এবং যাদের হৃদয়ে না আছে আল্লাহর ভয়, আর না-ই আছে কোন প্রকার সম্ভ্রম ও লজ্জা।

সুতরাং ‘হাগনদারীর লাজ না থাকলেও দেখনদারীর লাজ’ থাকা উচিত। এমন জায়গায় যুবকের বসা বা যাওয়া উচিত নয়, যেখানে নজরবাজির ফিতনা সহজে এসে যেতে পারে। যে পথে পর্দাহীনা মহিলা দেখা যায়, সে পথে হেঁটো না। দূর হলেও অন্য পথে হেঁটো। যে পুকুরের পানি খেতে পাবে না, সে পুকুরের পাড় দিয়েও যাবে না। ‘মন ফ্রি’ করার অজুহাতে টিভি, ভিডিও, ভিসিআর বা সিনেমা-হলে ফিল্ম্ দেখা বর্জন কর। কারণ, ছবি হলেও, চোখের দর্শন-তৃপ্তি সে সবেও কম নয়। বর্তমান বিশ্বের খবরাখবর জানার নামে এমন পত্র-পত্রিকা হাতে ধরো না, যাতে আছে নগ্ন ও অর্ধনগ্ন নারীদেহ। যথাসম্ভব বাঁচার চেষ্টা কর। আল্লাহ তোমার চেষ্টার অন্তর দেখবেন।

বেড়াতে যাওয়ার নাম করে অপ্রয়োজনে কোন পর্যটন-কেন্দ্র সমুদ্র-সৈকত, পার্ক ও

বাজারে যেও না। যেখানে তুমি নজরের ফিতনায় পড়ে যেতে পার। আর জেনে রেখো, "আল্লাহর নিকট এ পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়গা হল বাজার।" *(মুসলিম ৬৭১, ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহুল জামে' ৩২৭২ নং)*

এ ছাড়া নোংরা নারী সমাগমস্থল মেলা-খেলাতেও যাবে না। দেখবে না যাত্রা, থিয়েটার, নাটক। এ জগতে দুই শ্রেণীর 'আব্দ' বা দাস আছে। প্রথম শ্রেণী হল 'আব্দুর রহমান' এবং দ্বিতীয় শ্রেণী হল, 'আব্দুশ শয়তান।' উক্ত আব্দুর রহমানের বিভিন্ন গুণ বর্ণনা করার সময় মহান আল্লাহ তার একটি গুণ সম্বন্ধে এই বলেন যে, "যারা মিথ্যা ও বাতিল মজলিসে (অনুষ্ঠানে) যোগদান করে না এবং অসার কার্যকলাপের সম্মুখীন হলে স্বীয় সম্মান রক্ষার্থে তা পরিহার করে ভদ্রভাবে চলে যায়।" *(সূরা ফুরকান ৭২ আয়াত)*

সর্ববৃহৎ মিথ্যা ও বাতিল হল শির্ক ও কুফরী। অতএব মূর্তিপূজা, কবরপূজা, উরস প্রভৃতি কোন শির্কী মেলা দেখতে যাওয়া কোন আব্দুর রহমানের কাজ বা গুণ হতে পারে না। বরং এ ধরনের মেলা থেকে কোন কিছু ক্রয়-বিক্রয়ও বৈধ নয়। ছেলে-মেয়েদেরকে বছরের স্বাদ মিষ্টি খাওয়ানোর দরকার একান্ত হয়েই থাকলে বাজার থেকে কিনে খাওয়াও। চিত্তবিনোদনের দরকার হলে কোন বৈধ স্থানে নিয়ে গিয়ে বেড়াও। কিছু কেনা-কাটার দরকার হলে শহর-বাজারের দোকান থেকে কিনে নাও। দাম বেশী লাগলেও তোমার ঈমানের দাম আরো বেশী। ঈমান যাতে ধূলোধূসরিত হয়ে না যায় তার বিশেষ খেয়াল তো রাখতেই হবে তোমাকে। আর অবশ্যই শির্ক, গান-বাজনা, জুয়া, যাত্রা-নাটক, নারী সমাগম ইত্যাদি বিশেষ আকর্ষণমূলক মেলা-খেলা থেকে সাধারণ বাণিজ্য-বাজার অনেকাংশে ভালো।

প্রিয় বন্ধু আমার! তোমার নজর যদি তোমাকে ফাঁকি দিতে চায়, তাহলে তাকে বশীভূত করার সবচেয়ে বড় ঔষধ হল বিবাহ। ভালো দেখে দ্বীনদার কনে খুঁজে বিয়ে করে ফেল, তাহলে তুমি যৌবনের অনেক পাপ থেকেই বাঁচতে সক্ষম হবে। "বিবাহ হল দৃষ্টি সংযতকারী। অবশ্য বিবাহ করায় অসুবিধা থাকলে রোযা রাখা উচিত। কারণ, রোযা যৌন-ক্ষুধাকে দমন করে।" *(বুখারী, মুসলিম)* পাপাচরণ বন্ধ করে।

যৌবনের বহু পাপ থেকে তোমাকে রক্ষা করতে পারে তোমার সতী স্ত্রী। পরস্ত্রী দর্শনের সর্বচাহিদা মিটাতে পারে সে। তবে অবশ্যই তাকে বাড়িতে কেবল তোমার জন্য সেজে সুন্দরী হয়ে থাকতে সুযোগ ও উৎসাহ দিও। নচেৎ তাকে দাসীর বেশে 'নেড়ীখেড়ী' করে রাখলে বাইরের প্রসাধিকা ও সুসজ্জিতা নারী দেখে নজর সংযত করতে পারবে না। তুমি যেমন দেখতে চাও, ঠিক তেমনি করে তাকে সাজিয়ে রাখ। দেখবে তোমার মন ও চোখ তারই রূপে মুগ্ধ হয়ে কেবল তারই হৃদয়-পিঞ্জরে সর্বদা বন্দী থেকে যাবে এবং অপর নারীর দিকে তাকিয়ে দেখতেও ইচ্ছা করবে না।

মহানবী ﷺ বলেন, "নারী শয়তানী চিত্তে সামনে আসে এবং শয়তানী চিত্তে পিছন ফিরে যায়। (অর্থাৎ, ঐ নারীর মাধ্যমে শয়তান পুরুষকে কুমন্ত্রণা ও কুবাসনা দিয়ে থাকে।) সুতরাং তোমাদের কেউ যদি কোন নারী দেখে এবং তার সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করে ফেলে, তবে সে যেন (বাসায় ফিরে) নিজের স্ত্রীর কাছে আসে ও সঙ্গম করে। কারণ, এরূপ করলে তার মনের কুচিন্তা দূর হয়ে যাবে।" *(মুসলিম)*

পাথরে-পাথরে ঘর্ষণের ফলে আগুন জ্বলে ওঠে, চোখে-চোখে লড়ালড়ির ফলে পিরীত-নেশা মেতে ওঠে। এই ফিতনা থেকে বাঁচতে, যদি কোন মহিলা তোমার সামনে পড়ে তাহলে তার দিকে চোখ তুলো না। বরং মনের ঔৎসুক্য ও উৎকণ্ঠাকে দমন করে তার খারাপ দিকটা মনে করো। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন, 'যখন কোন (বেগানা) নারী তোমাকে মুগ্ধ করে ফেলে, তখন তুমি তার নোংরা দিকটা খেয়াল করো।' *(যম্মুল হাওয়া, ইবনুল জওযী ৩৮পৃঃ)* মনে করো, সে হয়তো ভালো মেয়ে নয়, অপরিষ্কার থাকে, গায়ে গন্ধ আছে বা কোন রোগ আছে। হয়তো বা সুন্দরী নয়, কুশ্রী। হয়তো তার মুখের শ্রী আছে কিন্তু কথার শ্রী নেই। হয়তো ধৃষ্ট ও গর্বিতা। ইত্যাদি।

তাছাড়া একটা কথা মনে করো যে, 'বেল পাকলে কাকের কি?' সে যেমনই হোক তাতে তোমার কি এসে যায়? তোমার জন্য সে তো বৈধ নয়। অতএব নজরের ডোর ছেড়ে তুমি কি শিকার করবে?

বন্ধু আমার! নজরবাজরা সাধারণতঃ সৎচরিত্রের হয় না, তা তো তুমি জানো। আর এ জন্যই মেয়েদের দিকে ভ্যালভ্যাল করে তাকিয়ে দেখে হ্যাংলা কুকুরের মত যে সব পুরুষদের জিভে লালা আসে, ভালো মেয়েরা তাদেরকেই ঘৃণা করে বেশী। সুতরাং তুমি কোন যুবতীর প্রতি তাকিয়ে তার নিকট ঘৃণার পাত্র হবে কেন?

পক্ষান্তরে নজরবাজি হৃদয়ে হাহাকার আনে, কুচিন্তা সৃষ্টি করে, অন্তরকে রোগগ্রস্ত করে ফেলে, স্মৃতিশক্তি হ্রাস করে দেয়, শুকনো বিপদ ডেকে আনে, পরকাল থেকে উদাসীন করে তোলে।

আর নজরবাজির 'কারেন্ট' শাস্তির ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের গৃহে তাদের অনুমতি না নিয়ে উঁকি মেরে দেখে, সে ব্যক্তির চোখ (ঢিল ছুঁড়ে) কানা করে দেওয়া তাদের জন্য বৈধ হয়ে যায়।" *(বুখারী ৬৮৮৮, মুসলিম ২১৫৮ নং, আবু দাঊদ, নাসাঈ)*

অবশ্য মু'মিনের উচিত, সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে চলা এবং দুনিয়া ও আখেরাতে শাস্তি যাতে না পেতে হয়-তার যথার্থ চেষ্টা রাখা।

হুজ্জতী বন্ধু আমার! যদি বল যে, 'হাগনদারীর লাজ না থাকলে দেখনদারীর লাজ কেন থাকবে?' তাহলে তার কারণ শোন। দেখনদারীর লাজ এই জন্য হবে যে, তার বুকে ঈমান আছে, বেহেশ্ত যাওয়ার ইচ্ছা আছে, দোযখের ভয় আছে। তাই চায় না নির্লজ্জ ও ধৃষ্টের সাথে নির্লজ্জতা ও ধৃষ্টামি প্রকাশ করতে। সর্বদা খেয়ালে রেখো যে, "লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা।" *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, প্রভৃতি সহীহুল জামে' ৩১৯৭ নং)*

আর "লজ্জা না থাকলে তুমি যাচ্ছে তাই করতে পার।" *(আহমাদ, বুখারী, আবূদাঊদ, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ২২৩০ নং)* অর্থাৎ, লজ্জাহীনরাই যাচ্ছে তাই আচরণ করে থাকে।

সুতরাং যেখানেই থাক, লজ্জাশীলতা তোমার ভূষণ হওয়া একান্ত দরকার। ভাই-ভাবীর সাথে একই বাড়িতে বাস করতে বাধ্য হলে, ভাবীকে শ্রদ্ধার নজরে দেখো, চক্ষু সংযত করো এবং তার সহিত ঠিক সেই রকম আচরণ ও ব্যবহার করো, যে রকম করে থাক নিজের বড় বোনের সহিত। বিজাতির অনুকরণ করে ভাবীকে উপহাসের পাত্রী মনে করে নিজেকে তার দেওর (দেবর বা দ্বিতীয় বর) মনে করো না। যেহেতু তোমার ভাবীর পক্ষে তোমাকে আল্লাহর নবী ﷺ মৃত্যুর সাথে তুলনা করেছেন! *(বুখারী, মুসলিম প্রমুখ, মিশকাত ৩১০২ নং)* অতএব ভাবী

তোমার ভাবের 'ই' নয়; বরং ভাবী তোমার ভাবী ফিতনা।

অনুরূপ একই বাড়িতে চাচাতো বোন, শ্বশুর বাড়িতে বেপর্দা শালী-শালাজ প্রভৃতিকে আপন বোনের নজরেই দেখো। নচেৎ অন্য নজর তোমাকে সজোরে আঘাত করে বিপদে ফেলবে।

পরিশেষে বলে রাখি যে, যেমন কোন মহিলার প্রতি কাম-নজরে তাকানো অবৈধ, ঠিক তেমনি অবৈধ কোন সুদর্শন কিশোরের প্রতিও। আর যা দেখা হারাম, তার ছবিও দেখা হারাম। *(মুহার্রামাত ৪১পৃঃ দ্রঃ)* পক্ষান্তরে "যে ঘরে (কোন প্রাণীর) ছবি বা মূর্তি থাকে, সে ঘরে ফিরিশ্তা প্রবেশ করেন না।" *(বুখারী, মুসলিম, সহীহুল জামে' ১৫৯৩ নং)*

যুবক ও নারী-প্রেম

নজরবাজির বাজিতে হেরে গেলে যুবকের মনের নিভৃত কোণে গোপন প্রেম সৃষ্টি হয়ে যায়। জেগে ওঠে কত কল্পনা, কত বাসনা। পুনরায় সাক্ষাতের আশা মনকে অতিষ্ঠ ও অধীর করে তোলে। রাতের অন্ধকারে যেন কাঁটার বিছানায় শয়ন করে অনিদ্রায় কল্পনার জগতে বিচরণ করে। দেখা ছবি মানসপটে ভেসে উঠলে তাঁতালো পাত্রে পানি পড়ার মত মনটা 'ছ্যাঁক' করে ওঠে। প্রেম-সমুদ্রের তরঙ্গমালা রিক্ত বক্ষকে প্রবল বেগে আঘাতের পর আঘাত দিতে থাকে। প্রণয়ের কচি-কিশলয় যেন মনের মাটি ছেড়ে কামনার মুক্ত আকাশে দোলা দেয়। শয়নে-স্বপনে-নিশি জাগরণে ভালোবাসার আবেগভরা কত কবিতা স্মৃতির মানসপটে জেগে ওঠে। গোপন প্রিয়ার উদ্দেশ্যে মন গেয়ে ওঠেঃ-

'বর্ষা-ঝরা এমনি প্রাতে আমার মত কি
ঝুরবে তুমি একলা মনে, বনের কেতকী?
মনের মনে নিশীথ-রাতে
চুম দেবে কি কল্পনাতে?
স্বপ্ন দেখে উঠবে জেগে, ভাববে কত কি!
মেঘের সাথে কাঁদবে তুমি, আমার চাতকী!
--- বন্ধু, তুমি হাতের-কাছের সাথের সাথী নও,
দূরে যত রও এ-হিয়ার তত নিকট হও!
থাকবে তুমি ছায়ার সাথে
মায়ার মত চাঁদনী রাতে!
যত গোপন তত মধুর -নাইবা কথা কও!
শয়ন-সাথে রও না তুমি, নয়ন পাতে রও।
ওগো আমার আড়াল-থাকা, ওগো স্বপন-চোর!
তুমি আছ, আমি আছি এই তো খুশী মোর।
কোথায় আছ কেমনে রাণী,
কাজ কি খোঁজে, নাই বা জানি!

ভালোবাসি এই আনন্দে আপ্‌নি আছি ভোর।
চাই না জাগা, থাকুক্ চোখে এমনি ঘুমের ঘোর!
রাতে যখন একলা শোব চাইবে তোমায় বুক,
নিবিড়-ঘন হবে যখন একলা থাকার দুখ।
দুখের সুরায় মস্ত্ হয়ে
থাকবে এ প্রাণ তোমায় লয়ে,
কল্পনাতে আঁক্‌ব তোমার চাঁদ-চুয়ানো মুখ!
ঘুমে জাগায় জড়িয়ে রবে, সেই তো চরম সুখ!'

এইভাবে যত দিন যায়, গোপন প্রিয়ার প্রতি দর্শন-তৃষ্ণা তত বেড়ে ওঠে। সাক্ষাতের বাসনা তীব্র হয়। কিন্তু বাধা পড়ে সামাজিক ও ধর্মীয় নৈতিকতার সজাগ দৃষ্টি। ফলে বেড়ে ওঠে বেদনা। আর 'রাত্রি যত গভীর হয়, প্রভাত তত এগিয়ে আসে। বেদনা যত নিবিড় হয়ে আসে, প্রেম তত কাছে আসে।' 'প্রেমে যত বাধা পড়ে, প্রেম তত বেড়ে চলে।'

মনের বাসনা, কল্পনা ও সেই সাথে বাধার ফলে মনের চাঞ্চল্য আরো বৃদ্ধি পায়। মন চায় প্রেমের কথা প্রেমিকার কাছে ফুটে বলতে। সরাসরি সে সুযোগ না থাকলে কলম দ্বারা সে নিবেদন ও আবেগ পৌঁছে দেওয়া হয়।

'একলা রাতে শুয়ে থাকি
স্বপনে তোমারে দেখি
বালিশ ভিজে চোখের জলে
বিছান ভিজে ঘামেতে,
যারে যা চিঠি লেইখা দিলাম
সোনার বন্ধুর নামেতে---!!!'

মন তখন কলমের মুখে কাগজের সাথে ভালোবাসার কত কথা বলে। কত কথা ভাষায় প্রকাশ করতে না পেরে না বলা থেকে যায়।

'কলমে নাই কালি হাতে নাই জোর,
পত্র লিখতে বসে আমার রাত্রি হল ভোর!
প্রীতির সাথে ইতি দিয়ে শেষ করলাম লেখা,
জানি না যে, তোমার সাথে কবে হবে দেখা!'

কখনো বা কথা হয় মনে-মনে, গোপনে, কানে-কানে, ফোনে-ফোনে। প্রেম এমনই জিনিস যে, মনের গোপন কোণে তা ধীরে-ধীরে বেড়ে উঠতে থাকে। প্রেম যোগায় কল্পনা। ভালো-মন্দের কল্পনা। আশা ও আশঙ্কার, ভয় ও ভরসার কত শত সুদূর কল্পনা। আর কল্পনা আনে চিন্তাশক্তি ও সাহিত্যিক রচনা-শৈলিতা। প্রেম আনে জীবনের আন্দোলন, আমূল পরিবর্তন ও সংস্কার। সান্নিধ্যের আশা এবং দূরত্বের হতাশা তথা বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কার সুখ ও কষ্ট মানুষের মনে কবিত্ব সৃষ্টি করে।

'নারীর বিরহে, নারীর মিলনে, নর পেল কবি-প্রাণ,
যত কথা তার হইল কবিতা, শব্দ হইল গান।'

মন তখন শুধু গেয়ে ওঠে ভালোবাসার গান, মিলনের গান, বিরহের গান।

'তুমি আমায় ভালোবাস তাই তো আমি কবি,
তোমার এ রূপ -সে তো তোমার ভালোবাসার ছবি!'

প্রেম যেমন দুই প্রকার; পবিত্র ও অপবিত্র। ঠিক কবিত্বও দুই প্রকার; বৈধ ও অবৈধ। আকাশ-কুসুম অবাস্তব কল্পনা করে আবোল-তাবোল বা অশ্লীল কথামালার কবিতার কবি সাধারণতঃ অপবিত্র প্রেমের প্রেমিকই হয়ে থাকে। আর এ শ্রেণীর কবির মন যখনই কবিতা লিখতে নির্জনে বসে, তখনই শয়তান তার সঙ্গী হয়ে কবির কল্পনায় সহযোগিতা করে। *(সহীহুল জামে' ৫৭০৬ নং)*

এ শ্রেণীর কবি প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, "বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে থাকে। তুমি কি দেখ না যে, ওরা প্রত্যেক উপত্যকায় (লক্ষ্যহীনভাবে সর্ববিষয়ে) কল্পনা-বিহার করে? এবং ওরা যা বলে, তা করে না।" *(সূরা শুআরা ২২৪-২২৬ আয়াত)*

এ শ্রেণীর কবি কখনো তাওহীদ ও ইসলামের প্রশংসা ও জয়গান গাইলেও শির্ক ও কুফরী তথা বিদআতের প্রশংসা এবং জয়গান গেয়ে থাকে। কখনো বীরত্বের কথা, কখনো নারী-প্রেমের কথা, কখনো সতীত্বের নিন্দা, আবার কখনো বেশ্যার প্রশংসা, এবং এইভাবে জীবনের প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে কল্পনার ঘোড়া ছুটিয়ে কবিতা রচনা করে থাকে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবিতায় যা বলে, মনে তা বিশ্বাস রাখে না। যতটা বলে, বাস্তব ততটা নয় বা মোটেই নয়। যা বলে, তা নিজে করে না।

প্রেমজালে আবদ্ধ কবি বন্ধু আমার! তোমার প্রেম যদি পবিত্র হয়, তাহলে সে কথা ভিন্ন। তোমার কবিতার শব্দ-ছন্দ যদি কল্পনা-প্রসূত অবাস্তব না হয়, অতিরঞ্জিত, অশ্লীল ও নৈতিকতা-বিরোধী না হয়, বরং বাস্তবধর্মী ও সত্যের আহ্বায়ক হয়, বাতিলকে খন্ডন করার জন্য হয়, তাহলে অবশ্যই তা প্রশংসনীয়। মহান আল্লাহ বলেন, "তবে তাদের কথা ভিন্ন, যারা ঈমান এনে সৎকর্ম করে, আল্লাহকে খুব স্মরণ করে এবং অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে, তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়?" *(ঐ ২২৭ আয়াত)*

প্রেমিক বন্ধু আমার! তুমি হয়তো ভাবতেও পার যে, তোমার প্রেম পবিত্র। কিন্তু জেনে রেখো যে, মানুষের মন বড় মন্দপ্রবণ। যেটা করতে নিষিদ্ধ, সেটা করেই যেন মানুষের আনন্দ বেশী। আর যেটা নিয়ে মানুষ আনন্দে মত্ত ও উদাস হতে পারে, সেটাই দ্বীনে নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি অনুরাগ, আকর্ষণ ও কৌতুহল মানুষের প্রকৃতি। বলা বাহুল্য, এখানেই থাকে সৃষ্টিকর্তার আনুগত্যের আসল পরীক্ষা।

যে বই-এর উপর লেখা থাকে, 'অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য পড়া নিষেধ' সে বইটাই অপ্রাপ্তবয়স্করা আগে পড়ার চেষ্টা করে। নচেৎ যেন, শান্তি পায় না, স্বস্তি পায় না। অধিকাংশ মানুষেরই মনের প্রবণতা ঠিক পাগলার মত; যখন পাগলাকে বলা হল, 'পাগলা সাঁকো নাড়িস্ নে!' পাগলা বলল, 'মনে ছিল না, ভালো, মনে করে দিলি।' আর এই বলে সে অর্ধভগ্ন বাঁশের সাঁকো নেড়ে ভেঙ্গেই ফেলল।

এমনই ঘটে থাকে। যার যাতে আনন্দ, তাকে সে কাজ করতে নিষেধ করলে অনেক সময় তার সেই প্রবৃত্তি অধিকতর প্রবল হয়ে ওঠে। পরন্তু যার যে কাজে প্রবৃত্তি, তাকে সেই কাজে

নিষেধ করতে গিয়ে দেখা যায় যে, তার সে প্রবৃত্তি জেগে উঠেছে, যা সে ভুলে ছিল।

আশা করি যে, তুমি সে প্রকৃতির নও। কারণ, তোমাকে মনে রাখতে হবে যে, "বেহেশ্তের পথ বড় কাঁটাময় এবং দোযখের পথ বড় আনন্দময়।" *(বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৩১২৬, ৩১৪৭ নং)* আর সে আনন্দের কি কোন মূল্য আছে, যার পশ্চাতে অপেক্ষা করে দুঃখ ও কষ্ট?

কিন্তু মনের উপর তোমার যদি নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তাহলেই সর্বনাশ! পরন্তু আকাঙ্খার ধন যত দুর্লভ হয়, মনের আকাঙ্খা তত বাড়ে। আর ভোগ যেমনই হোক, তার একটা তীব্র নেশা আছে। একপাত্র নিঃশেষ করে অবিলম্বে আর এক পাত্রের দিকে হাত বাড়াতে ইচ্ছা হয়। মন্দপ্রবণ মন যত ভোগ করে, তার ভোগের বাসনা ততই বেড়ে চলে। তুমি যদি কারূনের সমান ধন-মাল পাও, ফেরাউনের মত সুস্বাস্থ্য ও দেহ পাও এবং সর্বপ্রকার রঙ, রূপ ও লাবণ্যের দশ হাজার উদ্ভিন্ন-যৌবনা সুন্দরী যুবতী শয্যা-সঙ্গিনীরূপে পাও, তবুও তুমি কি মনে কর যে, এতে তোমার মন-জান ভরবে? কক্ষনো না। অবৈধ পথে বল্গাহীন মনের প্রবৃত্তি ও প্রবণতাই হল এমনি। পক্ষান্তরে হালাল পথের একটি নারীই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। মনের সকল চাহিদা তারই মাঝে মিটে যাবে; যদি তোমার নিয়ন্ত্রণে থাকে তবে। নচেৎ অবৈধ প্রণয় ও কামনার জ্বালা তোমার মনকে কোনদিন শান্তি দিতে পারবে না।

'কহিবে না কথা তুমি! আজ মনে হয়,
প্রেম সত্য চিরন্তন, প্রেমের পাত্র সে বুঝি চিরন্তন নয়।
জন্ম যার কামনার বীজে
কামনারই মাঝে সে যে বেড়ে যায় কল্পতরু নিজে।
দিকে দিকে পাখা তার করে অভিযান,
ও যে শুষিয়া নেবে আকাশের যত বায়ু প্রাণ।
আকাশ ঢেকেছে তার পাখা
কামনার সবুজ বলাকা!
প্রেম সত্য, প্রেম-পাত্র বহু অগণন,
তাই -চাই, বুকে পাই, তবু কেন কেঁদে ওঠে মন।'

নিদ্রাহারা বন্ধু আমার! ধোকা খেও না অতিরঞ্জিত উপন্যাস ও ফিল্মী-দুনিয়ার রোমান্টিক বিভিন্ন প্রেম-কাহিনী পড়ে ও শুনে। 'প্রেম অনির্বাণ' এ কথা সত্য হলেও তোমার প্রেম যে ঐরূপ বিরল ও রোমান্টিক হবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? তুমি তো পুরুষ। পুরুষের মত মনকে সবল কর এবং নিজেকে 'হিরো' করার চেষ্টা করো না।

পক্ষান্তরে যদি কোন সুন্দরী তোমাকে অযাচিতভাবে প্রেম নিবেদন করে, তবুও তুমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে এমন 'ইঁদুর-মারা কল'-এ পা দিও না। নচেৎ প্রেমিক কবি হওয়ার বদলে নিজের প্রতিভাই হারিয়ে বসবে।

হ্যাঁ, আর 'ইয়ে করে বিয়ে' অর্থাৎ পরিচয় থেকে প্রণয় এবং প্রণয় থেকে পরিণয় হওয়ার কথা ভাবছ? এমন বিবাহকে 'পছন্দ করে বিবাহ' নাম দিলেও আসলে তা হল ইউরোপীয় 'কোর্টশীপ' প্রথা। যা কোন মুসলিমের জন্য বৈধ ও শোভনীয় নয়। সূদের নাম পরিবর্তন করে 'লভ্যাংশ' বললে যেমন সূদ হালাল হয় না, ঠিক তেমনি বিয়ের আগে অবৈধ প্রণয়ে ফেঁসে,

চোখ, হাত, জিভ, পা ও যৌনাঙ্গের ব্যভিচার করে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিয়ে করাকে 'লাভ-ম্যারেজ' বা 'পছন্দ করে বিয়ে' নাম দিলে তা হালাল হয়ে যায় না। ইসলাম পছন্দ করে বিয়েকে বিধিবদ্ধ করেছে এবং বিয়ের আগে কনেকে একবার দেখে নিতে অনুমতি দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিয়ের আগে হৃদয়ের আদান-প্রদানের মাধ্যমে প্রেম সৃষ্টির জন্য বর-কনের হাতে ডোর ছেড়ে দেয়নি। যেমন উভয়ের মধ্যে কারো তার বিবাহে অসম্মতি থাকলে জোরপূর্বক বিবাহ-বন্ধনকে ইসলাম অনুমোদন ও স্বীকৃতিই দেয় না।

আসল কথা হল, আধুনিক যুগের পাশ্চাত্যের অভিশপ্ত ছায়া অনেক মুসলিম যুবক-যুবতীর মাঝেও বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও সিনেমা-জগতের মাধ্যমে এসে পড়েছে। তাই পশ্চিমী কায়দায় তারা নিজেদের সংসার গড়ে তোলার পূর্বে এমন যৌনাচার ও ভালোবাসাকে একটা বৈধ ও সভ্য ফ্যাশন বলে বরণ করে নিয়েছে। অথচ পাশ্চাত্য সমাজ, যেখানে 'লাভ-ম্যারেজ' ছাড়া অভিভাবকদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ উপায়ে এবং শরয়ী দূরদর্শিতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিবাহ মোটেই হয় না বললেই চলে। যৌন-স্বাধীনতার সে লাগাম-ছাড়া দেশে দাম্পত্য-জীবন যে কত তিক্ত ও জ্বালাময়, তা অনেক মানুষেই জানে।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় আনুষ্ঠানিক বিবাহ তুলনামূলকভাবে খুবই কম হয়। আর যেটুকু হয় সেটুকু বড় দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও দেহ-মন দেওয়া-নেওয়ার পর হয়! বন্ধু-বান্ধবীরূপে বাস করতে করতে ৩৫/৪০ বছর বয়সে পৌঁছে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কেউ হয়, কেউ হয় না। কেউ টেস্ট্ করতে করতেই জীবন অতিবাহিত করে ফেলে; পছন্দ আর হয়ে ওঠে না। আমেরিকার এ রকমই এক বরের বয়স ৯৪ এবং কনের বয়স ৯৩ বছর। এই দীর্ঘ প্রায় এক শতাব্দী কাল ধরে বন্ধুত্ব ও এক অপরকে বুঝে নেওয়ার পর তারা এই সেদিন বিবাহিত সংসার-জীবনে প্রবেশ করল! আর তারা এ কথাও প্রকাশ করল যে, তাদের বাসর (?!) রাত ছিল জীবনের সবচেয়ে লম্বা (?) ও মধুরতম রাত! *(আয-যিওয়াজ পত্রিকা, এপ্রিল-জুন ১৯৯৮, ২৫পৃঃ)*

স্বাধীনতাকামী বন্ধু আমার! এমন নৈতিকতা ও শালীনতা-বর্জিত স্বাধীনতাকে প্রগতি ভেবে বসো না। কারণ, এটাই হল তাদের দুর্গতিময় অধোঃগতি।

হ্যাঁ, আর কোন অমুসলিম নারীর প্রেমে পড়ে বলো না যে, তুমি তো একজন মানুষকে হেদায়াতের আলো দানের চেষ্টা করছ। বরং হয়তো আসল কথা হল এই যে, তুমি তার প্রেমজালে বন্দী হয়ে পড়েছ। আর তা যদি সত্য হয়, তাহলে মহান প্রভুর নির্দেশ শোন। তিনি বলেন, "মুশরিক নারীগণ ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না; যদিও তারা তোমাদের নিকট মনোহারিণী হয় তবুও মু'মিন (মুসলিম) দাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।" *(সূরা বাকারাহ ২২১ আয়াত)*

নারী-পুরুষের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠার যুগে ধর্ষণ অস্বাভাবিক নয়, যেমন অস্বাভাবিক নয় যে কোনও ধরনের রমণীর সাথে ভালোবাসা হয়ে যাওয়া। যা অস্বাভাবিক তা হল, একজন জ্ঞানী ও মুসলিম যুবকের এই প্রমাণ করা যে, 'পিরীতে মজিল মন, কি বা হাঁড়ি, কি বা ডোম!'

বেপর্দা পরিবেশে প্রেম-পিরীত স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু অস্বাভাবিক হল একজন মুসলিম যুবকের বেপর্দা মহিলাকে ভালোবেসে ফেলা।

সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে প্রেম হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু অস্বাভাবিক

হল, মুসলিম দেশেও এমন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চালু রাখা।

বাড়ির দাসীর সঙ্গেও অবৈধ প্রণয় গড়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। যা অস্বাভাবিক তা হল, মুসলিম পরিবারের এমন ঢিলা তরবিয়ত ও অবজ্ঞাপূর্ণ অভিভাবকত্ব।

কোন নিকটাত্মীয়া যুবতীর সাথেও ভালোবাসা হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক হল, একই বাড়িতে এগানা-বেগানার এমন সহাবস্থান।

প্রেম তো হতেই পারে। প্রেম তো এক প্রকার যাদু। কোন প্রকারের মনের মিল বা আকর্ষণ সৃষ্টি হলে এবং প্রবৃত্তির ডোর লাগামহীনভাবে ছেড়ে দিলেই 'ভালোবাসা' সৃষ্টি হয়। কোন প্রকার ভালো লেগে গেলেই হল। দ্বীন, সম্পদ, রূপ বা বংশ, কারণ যাই হোক না কেন, মনের ভালো লাগা সবার শীর্ষে। ভালো লাগার কাছে বিবেকও হার মেনে যায়। সকল বিচার-বিবেচনা বিকল হয়ে পড়ে। কুৎসিত হলেও প্রেমিকের চোখে সেই হয় বিশ্বসুন্দরী। অপরাধ করলেও তার সকল ভুল ফুল স্বরূপ দৃষ্টিগোচর হয়। প্রেম মানুষকে অন্ধ ও বধির করে তোলে। বেহায়া ও নির্লজ্জ করে ফেলে, করে ফেলে অস্থির-চিত্ত ও অর্ধ-পাগল।

'চেতনেতে অচেতন, প্রেমে টানে যার মন।' নদী যখন বর্ষার পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে কানায়-কানায় প্রবাহিত হয়, তখন সে কি খেয়াল রাখতে পারে যে, পানির স্রোত কিভাবে এসে তার বুক পূর্ণ করে দিচ্ছে এবং তার উভয় কূল প্লাবিত করে বয়ে উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায় বয়ে যাচ্ছে? নব-যৌবনের হৃদয় যখন কানায়-কানায় ভালোবাসায় ভরে ওঠে, তখন প্রেমিক নিজের আত্ম-সচেতনতার কথা ভুলেই যায়, পরন্তু প্রেমিকারও কত ত্রুটি সে লক্ষ্য করতে পারে না। ফলে দু'তরফা ক্ষতি হয়ে থাকে এমন প্রেম-রোগীর।

প্রেম আনে ঔদাস্য ও অজ্ঞানতা। প্রেম করে প্রতিভা নষ্ট।

'মানবের মনে প্রেম হইলে প্রবল,
বুদ্ধি-জ্ঞান সমুদয় যায় রসাতল।
বাঘের নিকটে কারো খাটে না শক্তি,
প্রেমের হাতেও নর নিরুপায় অতি।
প্রেম যদি জাগে মনে জ্ঞান নাহি রয়,
বিবেকের স্থান তথা নাহিক নিশ্চয়।
ব্যাটের অধীনে যথা চলে সদা বল,
প্রেমের অধীনে তথা প্রেমিক সকল।'

কত মানসিক পীড়া এসে বাসা বাঁধে পিরীত-নেশাগ্রস্ত প্রেমিকের মনে। কখনো বা মনের বাঁধনকে এঁটে রাখতে না পেরে এমন আচরণ করে বসে, যা স্বাভাবিক চোখে হাস্যকর। পাগলের মত আচরণ করেও নিজেকে বীর ভাবে। নিজেকে সুপুরুষ ভেবে যারা প্রেম করে না তাদেরকে কাপুরুষ মনে করে।

অনেক সময় এমন প্রেমের মজনুকে দেখে মনে হয় যে, তাকে কেউ যাদু করেছে। অনেকে অপরাধ এড়াবার জন্যও এ কথা নিজে বলে থাকে। কিন্তু আসল কথা এই যে, প্রেমের চেয়ে বড় যাদু আর কিছু নেই।

অস্বাভাবিক আচরণের জন্য প্রেমের নায়ক লোকের চোখে নিন্দিত হয়। তার বদনাম

ছড়িয়ে পড়ে সমাজে। প্রেম-সাধনায় সিদ্ধিলাভ না হলে অনেকে আক্ষেপে ভেঙ্গে পড়ে। অনেক সময় ভাবে 'মাছ ধরব, অথচ গায়ে কাদা লাগাব না।' কিন্তু পরিশেষে সে প্রেমের দলদলে তলিয়ে যায়, নতুবা অন্য কেউ তার গায়ে কাদা ছিটিয়ে দেয়। অবশেষে প্রেমও সাফল্য পায় না। অথচ মাঝখান থেকে শূন্য হাতে পায় শুধু বদনাম আর অপমান।

'যে সব প্রতীক প্রতিমার প্রেমে কেটেছে দীর্ঘ দিন,
যাদের জন্য নিন্দিত আমি লোকের চক্ষে হীন।
তুচ্ছে পাত্রে তারাই আমার ডুবিয়েছে খ্যাতি-যশ,
লঘু সঙ্গীত বিকিয়ে আমার সুনাম শূন্যে লীন।'

পক্ষান্তরে একজন মু'মিনের উচিত নয়, উদাসীন হওয়া, নিজেকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করা, অবৈধ প্রণয়ে পড়ে অস্বাভাবিক আচরণ করা।

প্রেমে পড়ে প্রেমিক তার দ্বীন ও ঈমানের মত অমূল্য ধনও হারিয়ে বসে অনেক সময়। অবৈধ প্রণয়ের ঐ কুপ্রবৃত্তি মু'মিনের ঈমানকে দুর্বল করে ফেলে। সত্যই তো, যে হৃদয়ে অবৈধ নারী-প্রেম সমাসীন থাকে, সে হৃদয়ে পবিত্র আল্লাহর প্রেম কেন বাসা বাঁধবে? তাই একটা বাস্তব কথা এই যে, সাধারণতঃ তারাই বেশী এই অবৈধ নারী-প্রেমে ফেঁসে থাকে, যাদের মনে ততটা অথবা মোটেই আল্লাহ-প্রেম নেই।

'অনির্বাণ প্রেম'-এর কোন কোন হতভাগা প্রেমিক বেদ্বীন নারীর প্রেমে পড়ে, প্রিয়ার প্রেম ও মনকে জয় করতে গিয়ে নিজের দ্বীন ত্যাগ করে মুর্তাদ্দ্ হয়ে বসে! যার ফলে দুনিয়াতে ইসলামী আইনে হত্যাযোগ্য অপরাধ এবং আখেরাতে চিরস্থায়ী দোযখ বাস করার মত পাপে লিপ্ত হয়ে যায়!

প্রেম দ্বীনদার যুবকের হৃদয়কেও ঈমানী চিন্তাধারা ও আল্লাহর যিক্র থেকে মশ্গুল করে রাখে। অনেক সময় নামাযগুলিতেও প্রেম ও প্রেমিকার কথা ভাবতে ভাবতে শয়তান তাকে এমন এমন কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তার নামায অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে এবং তার 'ওঠ্-বস্' করাই সার হয়। প্রেমিক যত তার প্রেমিকার (অবৈধভাবে) কাছে হওয়ার চেষ্টা করে, ঠিক তত সে আল্লাহ থেকে দূর হতে থাকে। আর এইভাবে আল্লাহর ভয় ও 'তাকওয়া' ধীরে-ধীরে হৃদয় থেকে বিলীন হয়ে যায়।

এই দিক দিয়ে 'প্রেম' শয়তানের এমন এক হাতিয়ার যে, তদ্দ্বারা সে সহজে নেক লোকদেরকে ঘায়েল করে থাকে। বিশেষ করে তার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম বেশী করে অথবা তা করার প্রশিক্ষণ নিতে থাকে (যেমন আলেম, মসজিদের ইমাম, তালেবে ইল্ম প্রভৃতি) তাকে সর্বাগ্রে পরাস্ত ও ক্ষান্ত করার জন্য সে এই মারণাস্ত্র প্রয়োগ করে থাকে। আর এই নারী ও অর্থ-প্রেমের মাধ্যমে ইবলীস মুসলিম সমাজকে তার শ্রদ্ধেয় আলেম সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন করতে এবং আলেম-উলামাকে সমাজের চোখে খাটো ও ঘৃণ্য করতে কৃতার্থ ও পারঙ্গম হয়। সুতরাং আল্লাহর নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যে, তিনি যেন মুসলিম যুব-সমাজকে শয়তানের এমন চক্রান্ত ও কুট-কৌশলের হাত থেকে রক্ষা করেন এবং এমন ইল্ম দান করেন, যার দ্বারা হৃদয়ে 'তাকওয়া' লাভ হয় ও শয়তান হয় লাঞ্ছিত-পরাভূত।

প্রেম হল একটা এমন গোলমেলে ব্যাপার, যার মাধ্যমে মানুষের অনেক কিছুই গোলমাল

হয়ে যায়। সুবুদ্ধির মাথা খাওয়া যায়। ভালো ছাত্রের সুবিন্যস্ত পড়াশোনায় তালগোল খেয়ে যায়। 'কখনো খেয়ো নাকো তালে আর ঘোলে, কখনো ভুলো নাকো ঢেমনের বোলে' প্রবাদ ভুলে গিয়ে পরীক্ষায় গোল্লা খেয়ে থাকে। কুঁড়ি অবস্থায় ফুলের মত প্রতিভা জীবন থেকে ঝরে পড়ে। প্রেমের পরশে মানসিক চাপ বৃদ্ধি পায়, সুচিন্তার স্থানকে কুচিন্তা এসে জবরদখল করে নেয়। ফলে অধ্যয়ন যায়, উন্নয়ন যায়, রুদ্ধ হয় জ্ঞান শিক্ষার দুয়ার।

অনেকে উন্নতির নাগাল পেয়েও নারীর মায়াজালে ফেঁসে গিয়ে পদ হারায়, চাকুরী হারায়, হারায় অনর্থক বহু ধন-সম্পদ।

ব্যভিচার বা অবৈধ যৌন-মিলন এক মহাপাপ। প্রেম প্রেমিক-প্রেমিকাকে এই পাপে লিপ্ত করায়। যদিও প্রেম ও কামনা দু'টি পৃথক জিনিস, তবুও 'বিয়ে তো করবই' এই আশায় পুঞ্জীভূত কাম চরিতার্থ করে ফেলে। মন দিতে-নিতে গিয়ে দেহ-বিনিময় ঘটে যায় এই সর্বনাশী প্রেমের ফুল-বাগানে। আর সত্য কথা এই যে, বর্তমানে 'প্রেম' বা 'ভালোবাসা' বলতে যা বুঝায় এবং অধিকাংশ তাতে যা ঘটে, তা হল 'ব্যভিচার।' প্রেমে সর্বপ্রথম, সর্বশেষ ও আসল যে বাসনা ও আকাঙ্খা থাকে, তা হল যৌনমিলন। এ ছাড়া যুবক-যুবতীর মাঝে বিবাহের পূর্বে পবিত্র প্রেমের কথা কল্পনাই করা যায় না। এ ধরনের প্রেম সাধারণতঃ কপট হয়ে থাকে। এমন ভালোবাসায় নায়ক-নায়িকার মাঝে কেবল এক প্রকার 'সুড়সুড়ি' থাকে। আর তা মিটানোর জন্য উভয়ের মধ্যে থাকে নানা অভিনয় ও ছল-কৌশল। অতঃপর সে 'সুড়সুড়ি' শেষ হতেই সব শেষ হয়ে যায়। এই শ্রেণীর প্রেমিক-প্রেমিকা সাধারণতঃ একজনকে পেয়ে সুখী হতে পারে না। আসলে এরা প্রেমিক নয়, লম্পট।

এক পাপ অপর এক পাপকে আকর্ষণ ও আহ্বান করে। দেহ-মিলন যখন ঘটবে তখন প্রকৃতিকে তো আর সব সময় বাধা দেওয়া যায় না। উভয়ের অলক্ষ্যে অবৈধ সন্তান জন্ম নেয়। এ অযাচিত ও অবাঞ্ছিত লাঞ্ছনার সন্তানকে আসতে না দিয়ে ভ্রূণ অবস্থায় হত্যা করা হয়! অনেকে সঠিক সময়ে পরিস্থিতির সামাল দিতে না পেরে প্রাণ হত্যা করে! ভ্রূণে জীবন আসার পর তা নষ্ট করা প্রাণ হত্যার শামিল। কিন্তু লাগাম-ছাড়া সমাজে তারও প্রচলন বেড়েই চলেছে। আইন করে ভ্রূণ-হত্যা ও গর্ভপাত বৈধ করা হচ্ছে। এমন হত্যার উপায় ও উপকরণ বড় সহজলব্ধ করা হচ্ছে। যার প্রেক্ষিতে ব্যভিচার আরো বেড়েই চলছে। আবার মজার কথা এই যে, ঐ নিপাতকৃত ভ্রূণ থেকে ফ্র্যান্সের এক কোম্পানী মহিলাদের অতি প্রিয় প্রসাধন ও অঙ্গরাগ 'লিপষ্টিক' বা 'ঠোঁট-পালিশ' প্রস্তুত করে থাকে। আর এইভাবে ব্যভিচার ও ভ্রূণ-হত্যা এক অর্থকরী ব্যবসাতেও পরিণত হয়েছে!

ব্যাংককে প্রতি বছরে ২ লাখের উপর গর্ভপাত হয়! তন্মধ্যে ৫০ ভাগ কুমারী, ৩৭ ভাগ ছাত্রী এবং বাদবাকী গৃহিনীরা এই গর্ভপাত ঘটিয়ে থাকে! *(অপসংস্কৃতির বিভীষিকা ৯৩পৃঃ দ্রঃ)*

পক্ষান্তরে জন্মের পর অনেকে সেই সদ্যপ্রসূত অযাচিত শিশুকে নিষ্ঠুরভাবে ডাস্‌বিনে অথবা নদী-জঙ্গলে ফেলে আসে!!

শুধু ভ্রূণ হত্যাই নয়, এই অবৈধ প্রণয়-ঘটিত কারণে মানুষ খুনও হয়ে থাকে। প্রেমে বাধা পড়লে পথের কাঁটা দূর করতে বাধাদানকারীকে খুন, প্রেমিকার প্রেমের ভিখারী অন্য কেউ আছে জানতে পেরে ঈর্ষায় সেই শরীক প্রেমিককে খুন, অথবা প্রেমিকা অন্যকেও প্রেম-

নিবেদন করে জানতে পেরে রাগ ও ঈর্ষায় নিজ হাতে প্রেমিকাকেই খুন করা হয়ে থাকে! অপেক্ষাকৃত ছোট পাপ করতে করতে পরিশেষে এত বড় মহাপাপ করে ফেলে প্রেমের পাগলরা, যে পাপের শাস্তি (আল্লাহ মাফ না করলে) দোযখ ছাড়া কিছু নয় পরকালে। মহান আল্লাহ বলেন, "আর যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার শাস্তি হবে জাহান্নাম, সেখানেই সে চিরকাল থাকবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করে রাখবেন।" *(সূরা নিসা ৯৩ আয়াত)*

অবৈধ প্রেম-ঘটিত কারণে অনেকের সোনার সংসার ধ্বংস হয়ে যায়। অপর এক নারীকে ভালোবাসতে গিয়ে নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি অবিচার ও অত্যাচার করা হয়। অথবা কোন কুলবধূর প্রেমে পড়ে অথবা তার প্রেমকে প্রশ্রয় দিয়ে, তাকে প্রেমপত্র লিখে বা গায়ে-পড়া হয়ে সাক্ষাতে অথবা ফোনে মধুর কথা বলে প্রেমজালে আবদ্ধ করার চেষ্টা করে তার স্বামীর সংসারে অশান্তির মহাপ্রলয় আনয়ন করা হয়। লম্পট হলেও কোন স্বামীই চায় না যে, তার স্ত্রী অন্যাসক্তা হোক, যেমন কোন স্ত্রীও চায় না যে, তার স্বামী অন্যাসক্ত হোক বা দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করুক। সুতরাং উভয় প্রকার ধ্বংসই যে মহাধ্বংস তা বলাই বাহুল্য।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন বিবাহিতা মহিলাকে তার স্বামীর পক্ষে নষ্ট করে ফেলে, সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়।" *(আহমাদ ২/৩৯৭, আবু দাউদ ৭৫৯, হাকেম ২/১৯৬)*

আল্লাহর রসূল আরো ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমানতের কসম খায়। আর যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অথবা কোন দাসকে তার প্রভুর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে সে ব্যক্তিও আমাদের দলভুক্ত নয়।" *(আহমদ ৫/৩৫২, বাযযার, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/২৮৯, সহীহুল জামে' ৫৪৩৬নং)*

তাছাড়া অবৈধ প্রেম সৃষ্টি করার ব্যাপারে যেমন শয়তানের বড় হাত থাকে, তেমনি বৈধ প্রেম ধ্বংস করা এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা হল তারই কাজ। শয়তান পানির উপর সিংহাসন পেতে বিভিন্ন মহাপাপ সংঘটিত করার জন্য নিজের চেলাদল পাঠিয়ে থাকে। প্রত্যহ হিসাব নেওয়ার সময় তার নিকট সব থেকে বেশী প্রশংসার্হ হয় সেই চেলাটি, যে কোন স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতে পেরেছে। সিংহাসন ছেড়ে উঠে এসে এমন চেলাকে জড়িয়ে ধরে সাবাসী ও বাহাদুরীও দেয় ইবলীস! *(আহমাদ, মুসলিম ২৮১৩ নং)*

শুধু স্বামী-স্ত্রীর মাঝেই নয়, বরং এই অশান্তির ঝড় নেমে আসে তাদের আত্মীয়দের মাঝেও। বিশেষ করে তাদের সন্তান থাকলে তাদের জীবনে যে চরম সর্বনাশী পরিণতি নেমে আসে তা অনুমেয়। 'কোলের ছেলে জলে ফেলে যৌবন সাজিয়ে' স্বামীর সংসার ছেড়ে নতুন রসিক নাগরের সাথে গোপনে বের হয়ে সংসার ও ব্যভিচার করলে ঐ ছেলের অবস্থা যা হয় তা দেখে পথের শিয়াল-কুকুরও কাঁদে! আশ্রয়হীন হয়ে উপযুক্ত অভিভাবক বিনা মানুষ হতে গিয়ে অনেক সময় দুশ্চরিত্র ও অসৎরূপে গড়ে ওঠে। আর এর ফলে যত ক্ষতি হয়, তার মূল কারণ হল ঐ সংসার-বিনাশী মানবরূপী শয়তান রসিক নাগর।

অবৈধ প্রণয় প্রণয়ীকে নিজ মা-বাপের স্নেহ-দুআ থেকে দূরে সরিয়ে ফেলে। যে যুবতীকে নৈতিক কারণে মা-বাপ পছন্দ করে না, সে যুবতীর প্রেমে ফেঁসে প্রেম অনির্বাণ রাখতে গিয়ে সংসার-জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস মা-বাপকে ছাড়তে হয়। আর এ কাজে সে মা-

বাপের অবাধ্য সন্তানরূপে পরিচিত হয়; যে অবাধ্য সন্তান মা-বাপের অসন্তুষ্টি অবস্থায় বেহেশ্ত্ প্রবেশের অনুমতি থেকে বঞ্চিত থাকবে।

অবৈধ প্রেম করে বিয়ে করা বউ নিয়ে গঠিত সংসার অধিকাংশ টিকে না। কারণ, বিয়ের পূর্বে ভালোবাসায় অতিরঞ্জন ও অভিনয় থাকে, প্রেমের প্রবল উচ্ছ্বাসে দূরকে ভালো মনে হয়, দূরে-দূরে থাকলে প্রেম গাঢ় হয়, অতিরঞ্জিত প্রেম পাওয়া যায়, ত্রুটি নজরে পড়ে না। দূরে থেকে কেবল প্রেমের সোহাগ নেওয়া যায়, শাসনের বাধা পাওয়া যায় না। তাছাড়া নতুন নতুন সবকিছুই ভালো লাগে, অসুন্দরীকে আচমকা-সুন্দরী লাগে। 'দূর থেকে সরষে ক্ষেত ঘন লাগে।' দূর থেকে উত্তপ্ত মরুভূমিকেও পানির সাগর মনে হয়। আর দূর বলেই-

'নদীর এ পার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস,
ও পারেতে যত সুখ আমার বিশ্বাস।---'

বিবাহের পূর্বে দূরে দূরে থাকলে প্রণয়িণী কেবল হৃদয়ে থাকে, বিবাহের পর সংসারে এলে, সর্বক্ষণের জন্য একান্ত কাছে এলে অনেক সময় তার বিপরীত দেখা যায়। (আর এ জন্যই নিজের স্ত্রী চাইতে অপরের স্ত্রী বেশী ভালো মনে হয়। যেমন স্ত্রীকেও অন্যের স্বামী অধিক ভালো লেগে থাকে।) অতঃপর হয় এই যে, কাছে এসে একটি আঘাত খেলেই প্রেমের সে শিশমহল ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। কপট প্রেমকে ভিত্তি করে মাকড়সা বা তাসের ঘরের মত যে ঘর-সংসার গড়ে ওঠে, তা সামান্য প্রতিকূল বাতাসেই বিধ্বস্ত হয়ে যায়। পশ্চিমা দেশগুলোতে তালাকের আধিক্য এ কথার স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে। যেখানে ফুল তুলে তার গন্ধ ও সৌন্দর্য লুটে নিয়ে ঝলসে গেলে ছুঁড়ে ফেলা হয়। নাম-মাত্র বিবাহ হলেও অল্প কয়েক দিনে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে।

তাছাড়া ঐ শ্রেণীর অনেক বিবাহ কোন চাপে পড়ে করতে হয়, মন থেকে নয়; বরং অনেক সময় সমাজ ঐ বিবাহকে প্রেমিক-প্রেমিকার ঘাড়ে শাস্তি স্বরূপ (?) চাপিয়ে দেয়। অথবা গর্ভ হয়ে গেলে প্রেমিকা অথবা তার কর্তৃপক্ষের চাপে বা কেবল লজ্জা ঢাকার জন্য প্রেমিক বিবাহ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু সর্বশেষ ফল দাঁড়ায়, যুবতীর লাবণ্য ধ্বংস ও পরে বিবাহ-বিচ্ছেদ। সুতরাং এত সব ক্ষতি জেনে-শুনেও এমন ফাঁদে পা দিয়ে লাভ কি বন্ধু!

অনির্বাণ প্রেম-পীড়িত দোস্ত্ আমার! সুস্বাস্থ্য তোমার জন্য আল্লাহর দেওয়া এক বড় নেয়ামত ও আমানত। প্রেমের দুশ্চিন্তায় পড়ে তা হারিয়ে ফেলায় তোমার কোন অধিকার নেই। ভালো মানুষ প্রেমে পড়ে অনেক সময় রোগক্লিষ্ট হয়ে পড়ে। যেখানে দূরত্ব ও বাধা বেশী, সেখানেই প্রেমের বাড় বেশী। কারণ, অবৈধ প্রেম বাড়াতে শয়তান সহায়ক কুট্না হয়। যার ফলে নানান্ অশুভ চিন্তা, অবৈধ বাসনা, অবাস্তব কল্পনা এবং প্রিয়তমা হারিয়ে যাওয়া বা প্রেম অসফল হওয়ার বিভিন্ন আশঙ্কা হৃদয়-কোণে এসে বাসা বাঁধে। ফলে কখনো খাওয়াতে অরুচি জন্মে, অনিদ্রা দেখা দেয়। কখনো বা মানসিক চাপে শারীরিকভাবে ব্যাধিগ্রস্ত ও দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে।

'আসক্তির ছয় চিহ্ন জেনো হে তনয়,
দীর্ঘশ্বাস, ম্লানমুখ, সিক্ত অক্ষিদ্বয়।
জিজ্ঞাসিলে, অন্য তিন লক্ষণ কোথায়,
স্বল্পাহার, অল্পভাষ, বঞ্চিত নিদ্রায়।'

পরিবেশের হাওয়া যখন প্রেমের প্রতিকূলে চলে, তখনই প্রেমিকের মনের আকাশে দুঃখের কালো মেঘ ছেয়ে আসে, কষ্ট পায় নানাভাবে। প্রেমিক অথবা প্রেমিকার হিতাকাঙ্খী অথবা শত্রু এমন প্রেমে বাধা দিতে চায়। ব্যথিত হৃদয় না-পাওয়ার আক্ষেপ জানিয়ে দেয় প্রেমিকার কাছে-

'--- ভুলি নাই তবু তোমারেই ভালোবেসেছি
কখনো জীবনে কাল বোশেখীর ঝড়
এসেছে গোপনে, ভেঙ্গে গেছে বাঁধা ঘর
কত হারানোর ব্যথারে ভুলিতে নীরবে গোপনে কেঁদেছি।।
অগ্নি-শিখায় কভু এই মন নিজেরে করেছি ছাই,
কত অশ্রুর ধারায় এ বুক ভাসিয়েছি আমি হায়।---'

প্রেম হল ক্ষণিকের মানসিক সুখ। মানুষকে বাঁচতে হলে একটা নেশা নিয়ে বাঁচতে হয়। আর সেই নেশাতে সে মনের মাঝে চরম তৃপ্তি লাভ করে থাকে। অবশ্য অবুঝ মন তখন বৈধ-অবৈধের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হয় না। কিন্তু উভয়ের মাঝেই যেন বেহেশ্তী সুখের আমেজ অনুভব করে থাকে। যত ব্যথা আসে, সকল ব্যথা যেন প্রিয়ার সাক্ষাতে অথবা স্মরণে দূরীভূত হয়ে যায়।

'সাবাস বলি পিরীত-নেশা হেতু তুমি সকল সুখের,
যতই ভুগি রোগে শোকে, বদ্যি তুমি সকল দুখের।'

প্রেমের সবকিছুই অতিরঞ্জিত। অতিরঞ্জন করেই অনেকে বলে থাকে,

'প্রেম-খাতাতে একবার যে
লিখিয়া দিয়াছে নামটি তার,
নাই প্রয়োজন স্বর্গে তাহার
নরক গিয়াছে দূরের পার!!'

প্রেমিক বন্ধু আমার! এমন ভুয়ো বুলিতে ধোকা খেয়ে দুনিয়াতেই কল্পিত বেহেশ্ত্ খোঁজার অবৈধ বৃথা চেষ্টা করো না। কারণ, প্রেম ক্ষণিকের স্বর্গ হলেও মনে রেখো যে, প্রেমের আনন্দ থাকে স্বল্পক্ষণ, আর তার বেদনা থাকে সারাটি জীবন। প্রেম মানুষকে শান্তি দেয়, কিন্তু স্বস্তি দেয় না। প্রেম হল ধূপের মত; যার আরম্ভ হয় জ্বলন্ত আগুন দিয়ে, আর শেষ পরিণতি হয় ছাই দিয়ে।

ভালোবাসা করার অর্থ হল, তুষে আগুন দেওয়া; যা একেবারে দপ্ করে জ্বলেও ওঠে না, আর চট্ করে নিভাতেও চায় না। বরং ভিতরে ভিতরে গোপনে পুড়ে ছাই হতে থাকে।

হৃদয়ে আনন্দের অনুভূতি যতটা হয়, তার চেয়ে বেশী হয় ব্যথার অনুভূতি। প্রেমে আনন্দের তুলনায় ব্যথা থাকে অধিক ও নিদারুণ। আর সে ব্যথার কোন অব্যর্থ ঔষধও নেই। মোট কথা ভালোবাসা যা দেয়, তার চেয়ে বহুগুণ বেশী কেড়েও নেয়।

পক্ষান্তরে কপট প্রেমে প্রেমিক যখন ধোকা খায়, তখন মনের গহিন কোণে হা-হুতাশ তাকে অস্থির করে তোলে। মনের মানসপটে স্মৃতি জাগরিত হয়ে উঠলে প্রাণে মোচড় দিয়ে ওঠে। যখন পদ্মফুল চলে যাবে এবং তার কাঁটার জ্বালা মনকে অতিষ্ঠ করে তুলবে তখন অপমান ও শোকে শ্বাস রোধ হবে। আর মন গেয়ে উঠবে,

'--- আজ আমি মরণের বুক থেকে কাঁদি-
অকরুণা! প্রাণ নিয়ে একি মিথ্যা অকরুণ খেলা!
এত ভালোবেসে শেষে এত অবহেলা
কেমনে হানিতে পার নারী!
এ আঘাত পুরুষের,
হানিতে এ নির্মম আঘাত, জানিতাম, মোরা শুধু পুরুষেরা পারি।'

আফশোষ ও আক্ষেপে মন-প্রাণ দগ্ধীভূত হবে এবং গাইবে-

'ভুল করেছি সারা জীবন তোমায় ভালোবেসে,
জানি নাই যে, কাঁদতে হবে আমায় অবশেষে।'

স্বার্থপরতার প্রেমে স্বার্থে আঘাত লাগলে অথবা স্বার্থে সিদ্ধিলাভ হয়ে গেলে প্রেম আর প্রেম থাকে না বন্ধু! অতএব ওদেরই একটি অভিজ্ঞতার কথা মনে রেখো-

'ভালোবাসার এমনি মজা যেমন নাকি ঘি,
যাবৎ Hot তাবৎ Good, Cold হলেই ছি।'

পক্ষান্তরে ধোকাবাজি, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা এমন পাপকাজ, যা মানুষকে দোযখে টেনে নিয়ে যায়। *(সহীহুল জামে' ৬৭২৬ নং)* একজনকে 'তোমাকে ছাড়া বিয়েই করব না' বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে, তার যথাসর্বস্ব লুটে নিয়ে তাকে ধোকা দেওয়া, অথবা তার চেয়ে আরো ভালো কেউ নজরে পড়লে প্রথমকে বর্জন করে দ্বিতীয়কে গ্রহণ করা, ইত্যাদি প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা ঐ কপট প্রেমের আগা-গোড়াই অমানবিক কর্ম।

প্রেমের অভিনয়ে ধোকা খেয়ে গেলে আক্ষেপের সাথে নিজেকে ধিক্কারে ধ্বংস করে দিতে ইচ্ছে হয়। তখন আত্মহত্যা করা কঠিন মনে হয় না। প্রিয়তমা ফাঁকি দিলে, অথবা গাঢ় প্রেমের পর কোন কারণে উভয়ের মাঝে বিবাহে বাধা পড়লে এবং এ জগতে একমাত্র চাওয়া ও পাওয়া মন-প্রাণ দিয়ে চেয়েও না পাওয়া গেলে, জীবন রাখায় যে লাভ আছে, তা মনে করে না অনেকে। মার্কিন মুল্লুকে প্রতি বছর ছয় হাজারেরও বেশী তরুণ আত্মহত্যা করে শুধু ঐ অবৈধ প্রণয়-ঘটিত কারণে। *(অপসংস্কৃতির বিভীষিকা ৯২পৃঃ দ্রঃ)*

সুতরাং মুসলিম যুবককে সতর্কতার সাথে জেনে রাখা উচিত যে, এমন প্রণয় মহাপাপের কাজ। পক্ষান্তরে যদি কোন প্রকারে প্রেম হয়ে গিয়ে প্রেমিকা তাকে ধোকা দিয়েই ফেলে, তাহলে তার জন্য আত্মহত্যা করতে হবে কেন? আত্মহত্যা যে আর এক মহাপাপ। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ধৈর্যের সাথে আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত। কারণ, তিনি তাকে এমন দ্বিচারিণী নারী থেকে রক্ষা করেছেন। যে নারী অতি সংগোপনে তার প্রেমে অন্যকেও শরীক করেছিল, সে নারীকে তার জীবন থেকে দূর করে দিয়েছেন।

আর এ কথাও মনে করা ঠিক নয় যে, দুনিয়াতে কেবল তার উপযুক্ত প্রেমময়ী মাত্র একটা লায়লাই জন্ম নিয়েছিল এবং এ জগতে আর এমন কোন নারী নেই, যে তাকে ঐ হারিয়ে যাওয়া লায়লার মত ভালোবাসবে। বরং বাস্তব কথা এই যে, অভিনীত ও অতিরঞ্জিত অবৈধ প্রেমের চাইতে বৈবাহিক-সূত্রে সৃষ্ট পবিত্র প্রেম আরো প্রগাঢ়, আরো নির্মল। কারণ, তা হল আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি। তিনি বলেন, "তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি

তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পেতে পার। আর তিনি তোমাদের মাঝে পারস্পরিক প্রেম ও স্নেহ সৃষ্টি করেছেন।" *(সূরা রূম ২১ আয়াত)*

সুতরাং আত্মহত্যার মাধ্যমে নিজের দ্বীন-দুনিয়া ধ্বংস করে দুর্বল মনের পরিচয় দেওয়া কাপুরুষের কাজ। পক্ষান্তরে ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করে সবল মনে নতুন করে পবিত্র জীবন গড়ে তোলাই হল সুপুরুষের কাজ।

প্রেমরোগের চিকিৎসা

১- প্রেম আল্লাহর তরফ থেকে পাওয়া মানুষের জন্য এক বড় নেয়ামত। তা যথাস্থানে প্রয়োগ করা এক ইবাদত। আর তা অপপ্রয়োগ করা হল গোনাহর কাজ। অর্থাৎ অবৈধ প্রেম হল সচ্চরিত্রতা ও নৈতিকতার পরিপন্থী। বিবাহের পূর্বে হৃদয়ের আদান-প্রদান বা পছন্দ অথবা ভালোবাসার নামে যুবক-যুবতীর একত্রে ভ্রমণ-বিহার, নির্জনে খোশালাপ, অবাধ মিলামিশা ও দেখা-সাক্ষাৎ, গোপনে চিত্তবিনোদন প্রভৃতি আদর্শ ধর্ম ইসলামে বৈধ নয়।

বর্তমান পরিবেশে কেবল সেই যুবকই অবৈধ প্রণয় থেকে বাঁচতে পারে, যার হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয়। আর আল্লাহর ভয় বুকে থাকলে শত বাধা ও বিপত্তির মাঝে চলার পথ সহজ হয়ে যায়। আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে -এই ভয়ে যে নিজের প্রবৃত্তি দমন করবে, তার ঠিকানা হবে বেহেশ্তে। বরং তার জন্য রয়েছে দু'টি বেহেশ্ত।

পক্ষান্তরে আল্লাহর ভয় হৃদয়ে থাকলে আল্লাহ বান্দাকে এমন নোংরামি থেকে বাঁচিয়ে নেন। ঈমানে আল্লাহর প্রতি ইখলাস থাকলে তিনি বান্দাকে অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখেন। নবী ইউসুফ ﷺ ও যুলাইখার ব্যাপারে তিনি বলেন, "সেই মহিলা তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিল এবং সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত, যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত। তাকে মন্দ কাজ ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখার জন্য এইভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। নিশ্চয় সে ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত দাসদের একজন।" *(সূরা ইউসুফ ২৪ আয়াত)*

সুতরাং মনের সন্দেহ ও কামনার বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রধান অস্ত্র হল ঈমান। ঈমান সুদৃঢ় রাখ, কারো অবৈধ ভালোবাসায় ফাঁসবে না এবং অবৈধ উপায়ে কেউ তোমার মন চুরি করতে পারবে না।

২- প্রেমরোগের সবচেয়ে বড় অব্যর্থ ও আসল ঔষধ হল ধৈর্য ও মনের দৃঢ়-সংকল্পতা এবং সুপুরুষের মত মনের স্থিরতা। ইচ্ছা পাকা থাকলে উপায়ের পথ বড় সহজ। ধৈর্য কঠিন হলেও তার পরিণাম বড় শুভ; যেমন গাছের ছাল তেঁতো হলেও তার ফল ভারি মিষ্টি।মনের খেয়াল-খুশীকে নিয়ন্ত্রণে রেখে দৃঢ়-সংকল্প হও যে, তুমি ঐ শয়তানী কুমন্ত্রণায় সায় দেবে না। শয়তান হল তোমার প্রধান শত্রু এবং এই প্রণয়ের প্রধান দূত। আর মহান আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কার্যের নির্দেশ দেয়---।" *(সূরা নূর ২১ আয়াত)*

অতএব ধৈর্যের সাথে শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও।

৩- নজর পড়ার সাথে সাথে মনের মানসপটে কোন রূপসীর ছবি অঙ্কিত হয়ে গেলে তার মন্দ দিকটা মনে করো। ভেবো, সে হয়তো আচমকা সুন্দরী, আসলে সুন্দরী নয়। নতুবা বোরকার ভিতরে হয়তো অসুন্দরী। নতুবা ওর হয়তো কোন অসুখ আছে। নতুবা ওর হয়তো বংশ ভালো নয়। নতুবা ওর হয়তো ঘর-বাড়ি ভালো নয়। নতুবা হয়তো ওর সাথে বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়। নতুবা ও হয়তো তোমাকে পছন্দ করবে না। নতুবা ওর অতীত হয়তো কলঙ্কিত, ইত্যাদি। আঙ্গুর ফল নাগালের মধ্যে না পেলে টক মনে করলে মনে সবুর হয়।

তাছাড়া বেল পাকলে কাকের কি? দেখছ কি ভ্যালভ্যাল? যার সরষে তার তেল! তাতে তোমার কাজও নেই, লাভও নেই।

৪- জীবনের প্রথম চাওয়াতে ভালো বলে যাকে তুমি ভালোবেসে মনের কাছে পেয়েছ, সেই তোমাকে ভালোবাসবে এবং সে ছাড়া তোমাকে আর কেউ ভালোবাসবে না, বা আর কেউ তোমার কদর করবে না এমন ধারণা ভুল। 'ভালো কে? যার মনে লাগে যে।' তোমার ঐ লায়লার চেয়ে আরো ভালো লায়লা পেতে পার। সুতরাং বিবাহের মাধ্যমেও প্রেমময়ী ও গুণবতী সঙ্গিনী পাবে। তবে অবৈধভাবে ওর পেছনে কেন?

৫- প্রেম-পাগলা মজনু বন্ধু! আজ যাকে তুমি ভালোবাসছ, যে তোমাকে তার চোখের ইশারায় প্রেমের জালে আবদ্ধ করেছে, আজ যাকে তুমি তোমার জানের জান মনে করছ, কাল হয়তো সে তোমার অভাব দেখে, কোন অসুখ দেখে, কোন ব্যবহার দেখে অথবা তোমার চাইতে ভালো আর কোন নাগরের ইশারা দেখে, তোমাকে 'টা-টা' দিতে পারে। যে তোমার ইশারায় তার নিজের মা-বাপ, বংশ, মান-সম্ভ্রম প্রভৃতি অমান্য ও পদদলিত করে তোমার কাছে এসে যেতে পারে, সে যে তোমার ও তোমার মা-বাপের মান রাখবে, তার নিশ্চয়তা কোথায়? আর এ কথাও জেনে রেখো যে, আজ তুমি মারা গেলে কাল সে আবার অন্যকে বিয়ে করে নতুন সংসারের নতুন বউ হবে। সুতরাং এমন প্রেমের প্রতিমার জন্য এত বলিদান কিসের?

প্রেমিক বন্ধু! পৃথিবীতে যত রকম আশ্চর্যময় জিনিস আছে, তার মধ্যে সব চাইতে বেশী আশ্চর্যময় জিনিস হল মেয়ে মানুষের মন। সাগরের মত নারী ডাগর জিনিস। তাকে জয় করতে বড় পন্ডিত ও জ্ঞানী লোকেও হিমসিম খেয়ে যায়। সুতরাং তুমি কে? তুমিও হয়তো একদিন বলতে বাধ্য হবে যে,

'এ তুমি আজ সে - তুমি তো নহ; আজ হেরি তুমিও ছলনাময়ী,
তুমিও হইতে চাও মিথ্যা দিয়া জয়ী?
কিছু মোরে দিতে চাও, অন্য তরে রাখ কিছু বাকী,
দুর্ভাগিনী! দেখে হেসে মরি! কারে তুমি দিতে চাও ফাঁকি?
---প্রাণ নিয়ে এ কি নিদারুণ খেলা খেলে এরা হায়,
রক্ত-ঝরা রাঙা বুক দ'লে অলক্তক পরে এরা পায়!
এরা দেবী, এরা লোভী, এরা চাহে সর্বজন প্রীতি!

ইহাদের তরে নহে প্রেমিকের পূর্ণ পূজা, পূজারীর পূর্ণ সমর্থন,
পূজা হেরি' ইহাদের ভীরু-বুকে তাই জাগে এত সত্য-ভীতি!
নারী নাহি হতে চায় শুধু একা কারো,
এরা দেবী, এরা লোভী, যত পূজা পায় এরা চায় তত আরো।
ইহাদের অতি লোভী মন,
একজনে তৃপ্ত নয়, এক পেয়ে সুখী নয়, যাচে বহু জন!'

বন্ধু আমার! যদি তুমি ভাব যে, সব নারী তো আর এক রকম নয়। আমার লায়লা আমাকে ধোকা দেবে না। কিন্তু এ কথার নিশ্চয়তা কোথায় বন্ধু? তার কি কোন বন্ধনী বা বেষ্টনী আছে?

আর একান্তই যদি তোমার ঐ ধারণা সত্য হয়ে থাকে, তাহলে অবৈধ প্রেম খেলে কেন, লুকোচুরি করে ফিস্‌ফিসিয়ে কেন, গোপন প্রেম-পত্র লিখে কেন? বরং বৈধ উপায়ে পয়গাম পাঠিয়ে তাকে তোমার প্রণয়-সূত্রে গেঁথে নাও। হালাল উপায়ে তুমি তাকে তোমার জীবনে নিয়ে এস এবং আল্লাহ ও রসূলের নাফরমানি করো না।

৬- কোন তরুণীর রূপ দেখেই ধোকা খেয়ো না বন্ধু! প্রেমিকের চোখে প্রেমিকাই হল একমাত্র বিশ্বসুন্দরী। কিন্তু সে তো আবেগের খেয়াল, বাস্তব নয়। তাছাড়া দ্বীন ও চরিত্র না দেখে কেবল রূপে মজে গেলে সংসার যে সুখের হবে, তা ভেবো না। কারণ, চক্‌চক্ করলেই সোনা হয় না। কাঁচ না কাঞ্চন তা যাচাই-বাছাই করা জ্ঞানী মানুষের কাজ। পরন্তু ফুলের সৌরভ ও রূপের গৌরব ক'দিনের জন্য? তাই অন্তরের সৌন্দর্য দেখা উচিত। আর সত্যিকারের সে সৌন্দর্য কপালের দু'টি চোখ দিয়ে নয়, বরং মন ও জ্ঞানের গভীর দৃষ্টি দিয়েই দেখা সম্ভব। অতএব সেই মন যদি নিয়ন্ত্রণ না করতে পার তাহলে তুমি 'ইন্না লিল্লাহ--' পড়। আর জেনে রেখো যে, এমন সৌন্দর্য ও দ্বীন ও গুণের অধিকারিণী রমণী কোন দিন লুকোচুরি করে তোমার সাথে প্রেম করতে আসবে না।

৭- স্ত্রী হল জীবনের চিরসঙ্গিনী। সংসারে যত রকমের সম্পদ ও ধন মানুষ পায়, তার মধ্যে পুণ্যময়ী স্ত্রীই হল সব চাইতে বড় ও শ্রেষ্ঠ ধন। সুখ ও দুঃখের সময় সাথের সাথী এই স্ত্রী। এই স্ত্রী ও সাথী নির্বাচন করতে হলে মনের আবেগ ও উপচীয়মান যৌবনের প্রেম ও কামনা দ্বারা নয়; বরং বিবেক ও মন দ্বারা দ্বীন ও চরিত্র দেখে ভেবে-চিন্তে নির্বাচন করতে হয়। তাহলেই পরিশেষে ঠকতে ও পস্তাতে হয় না।

৮- কারো চোখের অশ্রুর কথা বলছ? তবে জেনে রেখো যে, মেয়েদের চোখ থেকে দু' রকমের অশ্রু ঝরে থাকে; একটি দুঃখের, অন্যটি ছলনার। আর এটাও তোমার মন ও প্রেমের আবেগ দিয়ে নয়, বরং প্রজ্ঞার বিবেক দিয়ে বুঝতে হবে।

প্রেম-বিহ্বল বন্ধু আমার! পূর্বেই বলেছি, সাগরের মত নারী ডাগর জিনিস। নারীকে ছোট ও দুর্বল ভেবো না। সমুদ্র-উপকূলে দাঁড়িয়ে মহাসমুদ্রের যতটুকু দেখা যায়, ঠিক কোন নারীর ততটুকুই অংশ দেখা সম্ভব হয়। নারী দুর্জ্ঞেয়, অজেয় নারীর মন। আর আমার মনে হয় যে, তুমি নিশ্চয়ই দিগ্‌বিজয়ী বীর নও।

৯- তুমি যাকে ভালোবেসে ফেলেছ, সে ধনীর মেয়ে নয় তো? অর্থাৎ, কোন প্রকারে সে তোমার জীবনে এসে গেলে, তুমি তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার বাসনা পূর্ণ করে চলতে পারবে

তো? যদি তা না হয় তাহলে শোন, দরজা দিয়ে অভাব ঢুকলে জানালা দিয়ে ভালোবাসা লুকিয়ে পালিয়ে যায়। সুতরাং প্রেমের নামে নিজের জীবনে বঞ্চনা ও অভিশাপ ডেকে এনো না।

আবার কাউকে শুধু ভালো লাগলেই হয় না। তুমি তার বা তাদের পরিবেশ ও বাড়ির উপযুক্ত কি না, তাও ভেবে দেখ। নচেৎ 'বাওনের চাঁদ চাওয়া'র মত ব্যাপার হলে শুধু শুধু মনে কষ্ট এনে লাভ কি? তাছাড়া তুমি যদি তোমার শিক্ষা, চরিত্র, ব্যবহার ও সাংসারিক যোগ্যতায় তাদেরকে মুগ্ধ করতে পার, তাহলে গরীব হলেও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে। আর তুমিই হবে তাদের যোগ্য জামাই। পক্ষান্তরে লুকোচুরিতে চরিত্র নষ্ট করে থাকলে তুমি তাদের চোখে খারাপ হয়ে যাবে। শেষে আর জামাইও হতে পারবে না।

১০- প্রেম-ভিখারী বন্ধু আমার! প্রেম যদি করতেই চাও তাহলে ক্ষণস্থায়ী এ ঢলন্ত-যৌবনা ফুরন্ত রূপের রূপসীদের সাথে কেন? অসৎচরিত্রা অসতীদের সাথে কেন? হ্যাঁ, সে অসতী বৈকি? যে তোমার সাথে অবৈধভাবে প্রেম করতে আসে, অবাধ মিলামিশা, দেখা-সাক্ষাৎ, চোখাচোখি, হাসাহাসি করে সে অসতী বৈকি?

সুতরাং প্রেম যদি করতেই হয় তাহলে চিরকুমারী অনন্ত-যৌবনা, অফুরন্ত রূপের রূপসীদের সাথে কর। কাঞ্চন-বদনা, সুনয়না, আয়তলোচনা, লজ্জা-বিনম্র, প্রবাল ও পদ্মরাগ-সদৃশ, উদ্ভিন্ন-যৌবনা ষোড়শীদের সাথে কর। যে তরুণীরা হবে সকল প্রকার অপবিত্রতা থেকে পবিত্রা, যারা তুমি ছাড়া আর কারো প্রতি নজর তুলেও দেখবে না। যে সুরভিতা রূপসীদের কেউ যদি পৃথিবীর অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে উঁকি মারে, তাহলে তার ঝলমলে রূপালোকে ও সৌরভে সারা বিশ্বজগৎ আলোকিত ও সুরভিত হয়ে উঠবে। যে সুরমার কেবলমাত্র মাথার ওড়না খানিকে পৃথিবী ও তার সমস্ত সম্পদ ব্যয় করলেও ক্রয় করা সম্ভব হবে না। *(বুখারী ৬৫৬৮ নং)*

সুতরাং হালাল উপায়ে বিবাহ কর এবং তার সাথেই প্রেম কর। আর উভয়ে আল্লাহর আনুগত্য করার মাধ্যমে ঐ রূপসীদেরকে বিবাহ করার জন্য দেন-মোহর সংগ্রহ করতে লেগে যাও।

১১- অবৈধ প্রণয় থেকে বাঁচতে নির্জনতা ত্যাগ কর। কারণ, নির্জনতায় ঐ শ্রেণীর কুবাসনা মনে স্থান পায় বেশী। অতএব সকল অসৎ-চরিত্রের বন্ধু থেকে দূরে থেকে সৎ-বন্ধু গ্রহণ করে বিভিন্ন সৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হও। আল্লাহর যিক্রে মনোযোগ দাও। বিভিন্ন ফলপ্রসূ বই-পুস্তক পাঠ কর। সম্ভব হলে সে জায়গা একেবারে বর্জন কর, যে জায়গায় পা রাখলে তার সহিত দেখা হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যে তোমার মন চুরি করে রেখেছে। টেলিফোন এলে তার কথার উত্তর দিও না। পত্র এলে জবাব দিও না। তোমার প্রণয়ের ব্যাপারে তাকে আশকারা দিও না। এমন ব্যবহার তাকে প্রদর্শন করো না, যার ফলে সে তোমার প্রতি আশা ও ভরসা করে ফেলতে পারে। বরং পারলে তাকে নসীহত করো এবং এমন অসৎ উপায় বর্জন করতে উপদেশ দিও। তাতে ফল না হলে পরিশেষে ধমক দিয়েও তাকে বিদায় দিও।

আর বেকার বসে থেকো না। কোন না কোন কাজে, নিজের কাজ না থাকলে কোন সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যস্ত থাকার চেষ্টা কর।

একা না ঘুমিয়ে কোন আত্মীয়, ভাই বা হিতাকাঙ্ক্ষী সৎ-বন্ধুর কাছে ঘুমাবার চেষ্টা কর। রাত্রে ঘুম না এলে যত কুরআন ও শয়নকালের দুআ মুখস্থ আছে শুয়ে শুয়ে সব পড়ে শেষ করার চেষ্টা কর। 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার, 'আলহামদু লিল্লাহ' ৩৩ বার এবং 'আল্লাহু আকবার' ৩৪ বার পাঠ কর। তার পরেও ঘুম না এলে, ঘুম না হলে তোমার কোন ক্ষতি হবে -এমন ভেবো না। অথবা রাত পার হয়ে যাচ্ছে বলে মনে মনে আক্ষেপ করো না। এমন ভাবলে ও করলে আরো ঘুম আসতে চাইবে না। অতঃপর একান্ত ঘুম যদি নাই আসে তাহলে বিছানা ছেড়ে উঠে ওযু করে নামায পড়তে শুরু কর। এর মাঝে ঘুমের আবেশ পেলে শুয়ে পড়। ঘুম না এলে বিছানায় উল্টাপাল্টা করলে অন্যান্য দুআ পড়ার পর এই দুআ পড়,

'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল ওয়া-হিদুল ক্বাহ্হার, রাব্বুস্ সামা-ওয়াতি অল্আরযি অমা বাইনাহুমাল আযীযুল গাফ্ফার।'

১২- গান-বাজনা শোনা থেকে দূরে থাক। কারণ, পূর্বেই জেনেছ যে, গানে যুব-মন প্রশান্তি পায় না; বরং মনের আগুনকে দ্বিগুণ করে জ্বালিয়ে তোলে। সুতরাং প্রেমময় মনের দুর্বলতা দূর করতে অধিকাধিক কবর যিয়ারত কর, জানাযায় শরীক হও, মরণকে স্মরণ কর। উলামাদের ওয়ায-মাহফিলে উপস্থিত হও, তাদের বক্তৃতার ক্যাসেট শোন।

১৩- অভিনয় দেখা পরিহার কর। কারণ, ফিল্ম্-যাত্রা-নাটক-থিয়েটার ইত্যাদি তো প্রেমের আগুনে পেট্রোল ঢালে। আর এ সব এমন জিনিস যে, তাতে থাকে অতিরঞ্জিত প্রেম। অবাস্তব কাল্পনিক প্রেম-কাহিনী ও রোমান্টিক ঘটনাবলী। অতএব সে অভিনয় দেখে তুমি ভাবতে পার যে, তুমিও ঐ হিরোর মত প্রেমিক হতে পারবে, অথবা ঐ হিরোইনের মত তুমিও একজন প্রেমিকা পাবে, অথবা ঐ অভিনীত প্রেম তোমার বাস্তব-জীবনেও ঘটবে। অথচ সে ধারণা তোমার ভুল। পক্ষান্তরে ঐ সকল প্রেক্ষাগৃহ বা রঙ্গমঞ্চের ধারে-পাশে উপস্থিত হয়ে চিত্তবিনোদন করার মত গুণ আল্লাহর বান্দাদের নয়; বরং প্রবৃত্তির গোলামদের।

১৪- যাকে ভালোবেসে ফেলেছ, তাকে কখনো একা নির্জনে কাছে পাওয়ার আশা ও চেষ্টা করো না। ব্যভিচার থেকে দূরে থাকলেও দর্শন ও আলাপনকে ক্ষতিকর নয় বলে অবজ্ঞা করো না। জেনে রেখো বন্ধু! যারা মহা অগ্নিকান্ডকে ভয় করে তাদের উচিত, আগুনের ছোট্ট অঙ্গার টুকরাকেও ভয় করা। উচিত নয় ছোট্ট এমন কিছুকে অবজ্ঞা করা, যা হল বড় কিছু ঘটে যাওয়ার ভূমিকা। ছোট্ট মশা নমরূদের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। ছোট ছোট পাখীদল হস্তিবাহিনী সহ আবরাহাকে ধ্বংস করেছে। একটি ছোট্ট ছিদ্র একটি বিশাল পানি-জাহাজকে সমুদ্র-তলে ডুবিয়ে দিতে পারে। বিছার কামড়ে সাপ মারা যেতে পারে। সামান্য বিষে মানুষ মারা যায়। ক্ষুদ্র হুদহুদ্ পাখী বিলকীস রাণীর রাজত্ব ধ্বংস করেছে। একটি ছোট্ট ইঁদুর কত শত শহর ভাসিয়ে দিতে পারে বন্যা এনে। আর এ কথাও শুনে থাকবে যে, হাতির কানে নগণ্য পিঁপড়া প্রবেশ করলে অনেক সময় হাতি তার কারণেই মারা যায়!

১৫- প্রেমিক বন্ধু আমার! প্রেমে পড়ে মানুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। চোখ, কান, জিভ, হাত, পা এবং অনেক ক্ষেত্রে যৌনাঙ্গের ব্যভিচার সংঘটিত করে অবৈধ পিরীত। প্রিয়ার দিকে হেঁটে যাওয়া হল পায়ের ব্যভিচার। অতএব প্রেয়সীর প্রতি যে পথে ও পায়ে তুমি চলতে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত নও, সেই পথের উপর তোমার পায়ের নিশানা ও দাগকে কোন দিন ভয় করেছ কি?

ভেবেছ কি যে, তোমার ছেড়ে যাওয়া প্রত্যেক নিশানা সযত্নে হিফাযত করে রাখা হচ্ছে। মহান আল্লাহ বলেন, "আমিই মৃতকে জীবিত করি এবং লিখে রাখি যা ওরা অগ্রে পাঠায় ও পশ্চাতে রেখে যায়। আমি প্রত্যেক জিনিসই স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি।" *(সূরা ইয়াসীন ১২)*

প্রিয়তমার সাথে খোশালাপ হল জিভের ব্যভিচার। গোপন প্রিয়ার সাথে প্রেম-জীবনের সুমিষ্ট কথার রসালাপ তথা মিলনের স্বাদ বড় তৃপ্তিকর। কিন্তু বন্ধু! এমন সুখ তো ক্ষণিকের জন্য। তাছাড়া এমন সুখ ও স্বাদের কি মূল্য থাকতে পারে, যার পরবর্তীকালে অপেক্ষা করছে দীর্ঘস্থায়ী শাস্তি ও দুঃখ।

যে জিভ নিয়ে তুমি তোমার প্রণয়িণীর সাথে কথা বল, সে জিভের সকল কথা রেকর্ড করে রাখা হচ্ছে, তা তুমি ভেবে দেখেছ কি? মহান সৃষ্টিকর্তা বলেন, "মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তাদের নিকটই আছে।" *(সূরা ক্বাফ ৫০ আয়াত)*

রসিক নাগর বন্ধু আমার! প্রেমে পড়ে তুমি প্রেমিকার সাথে মিলে যে পাপ করছ, সে পাপ কি ছোট ভেবেছ? ভেবে দেখ, হয়তো তোমাদের মাঝে এমন পাপও ঘটে যেতে পারে, যার পার্থিব শাস্তি হল একশত কশাঘাত, নচেৎ প্রস্তরাঘাতে খুন। কিন্তু দুনিয়াতে এ শাস্তি থেকে কোন রকমে বেঁচে গেলেও আখেরাতে আছে জ্বলন্ত আগুনের চুল্লী। অতএব 'যে পুকুরের জল খাব না, সে পুকুরের পাড় দিয়ে যাব না' -এটাই সুপুরুষের দৃঢ়সংকল্প হওয়া উচিত নয় কি?

ভেবেছ কি যে, তুমি তোমার ভালোবাসার সাথে যে অবৈধ প্রেমকেলি, প্রমোদ-বিহার করছ, তা ভিডিও-রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। প্রীতির স্মৃতি রাখতে গিয়ে অনেক সময় যে ছবি তোমরা অবৈধ ও অশ্লীলভাবে তুলে রাখছ, তা একদিন ফাঁস হয়ে যাবে। এ সব কিছুই মানুষের চোখে ফাঁকি দিয়ে করলেও কাল কিয়ামতে তুমি স্বচক্ষে দেখতে পাবে। "যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সে তা-ও দেখতে পাবে।" *(সূরা যিলযাল ৭-৮ আয়াত)* এবং তার যথার্থ প্রতিদানও পাবে।

প্রেম-সুখী বন্ধু আমার! যে মাটির উপর তুমি ঐ অশ্লীলতা প্রেমের নামে করছ, সেই মাটি তোমার গোপন ভেদ গ্রামোফোন রেকর্ডের মত রেকর্ড করে রাখছে। কাল কিয়ামতে সে তা প্রকাশ করে দেবে। পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। *(ঐ ৪ আয়াত)*

বন্ধু আমার! তুমি হয়তো তোমার ঐ প্রেমকেলিতে মানুষকে ভয় করছ, মা-বাপকে লজ্জা করছ। কিন্তু সদাজাগ্রত সেই সর্বস্রষ্টাকে লজ্জা ও ভয় করেছ কি? যে স্রষ্টা তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহ তোমার দেহ সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর তৈরী দেহকে তাঁরই অবাধ্যাচরণে ব্যবহার করছ।

এ কথা তো তুমি বিশ্বাস কর যে, আমাদের মাথার চুল থেকে নিয়ে পায়ের নখ পর্যন্ত সমস্ত দেহ সেই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরই দান। আমাদের ব্যবহারের জন্য তিনি আমাদের দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যথাস্থানে স্থাপন করে আমাদের প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছেন। কিয়ামতে যখন আমরা আমাদের স্বকৃত পাপের কথা ভয়ে অস্বীকার করে বসব, তখন ঐ অঙ্গসমূহ কথা বলে আমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে সাক্ষি দেবে। *(সূরা ইয়াসীন ৬৫ আয়াত)* সুতরাং এ দেহ আল্লাহর মালিকানায়, আমাদের মালিকানায় নয়। এ দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যদি তাঁর অবাধ্যাচরণ ও বিরোধিতায় প্রয়োগ করি তাহলে তার চেয়ে বড় ধৃষ্টতা ও নির্লজ্জতা আর কি হতে পারে? আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করে তাঁর ইবাদত করার জন্য পাঠালেন দুনিয়াতে

এবং তার মহা প্রতিদান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন আখেরাতে। কিন্তু বান্দা যদি সেই প্রতিশ্রুতির কথা, আখেরাত ও মৃত্যুর কথা ভুলে গিয়ে দুনিয়াই সর্বশেষ মনে করে, তবে নিশ্চয়ই তা লজ্জার কথা। এ জন্যই মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা কর।" সকলে বলল, 'হে আল্লাহর নবী! আমরা তো -আলহামদু লিল্লাহ- আল্লাহকে লজ্জা করে থাকি।' তিনি বললেন, "না ঐরূপ নয়। আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করার অর্থ এই যে, মাথা ও তার সংযুক্ত অন্যান্য অঙ্গ (জিভ, চোখ এবং কান)কে (অবৈধ প্রয়োগ হতে) হিফাযত করবে, পেট ও তার সংশ্লিষ্ট অঙ্গ (লিঙ্গ, হাত, পা ও হৃদয়)কে (তাঁর অবাধ্যাচরণ ও হারাম হতে) হিফাযত করবে এবং মরণ ও তার পর হাড় মাটি হয়ে যাওয়ার কথা (সর্বদা) স্মরণে রাখবে। আর যে ব্যক্তি পরকাল (ও তার সুখময় জীবন) পাওয়ার ইচ্ছা রাখে, সে ইহকালের সৌন্দর্য পরিহার করবে। যে ব্যক্তি এ সব কিছু করে, সেই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করে।" *(সহীহ তিরমিযী ২০০০ নং)*

ভেবেছ কি বন্ধু! তোমার চোখ, কান, হাত, পা এবং শরীরের চামড়া পর্যন্ত কাল কিয়ামত কোর্টে আল্লাহর সামনে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করবে? কুরআন বলে, "পরিশেষে যখন ওরা দোযখের নিকট পৌঁছবে, তখন ওদের চোখ, কান ও ত্বক ওদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে---।" *(সূরা ফুস্সিলাত ২০ আয়াত)* "যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের জিভ, তাদের হাত ও তাদের পা, তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে। সে দিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানবে যে, আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট ব্যক্তকারী।" *(সূরা নূর ২৪ আয়াত)*

মহান আল্লাহ আরো বলেন, "যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে ভয়ে নতজানু হতে দেখবে, প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার আমলনামা (কর্মলিপি) দেখতে আহ্বান করা হবে। আর বলা হবে, তোমরা যা করতে আজ তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেওয়া হবে। আমার নিকট সংরক্ষিত এই আমলনামা, যা সত্যভাবে তোমাদের ব্যাপারে কথা বলবে। তোমরা যা করতে আমি তা লিপিবদ্ধ করতাম।" *(সূরা জাসিয়াহ ২৭-২৯ আয়াত)* "ওরা কি মনে করে যে, আমি ওদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রণার খবর রাখি না? অবশ্যই রাখি। আমার ফিরিশ্তাগণ তো ওদের নিকট থেকে সব কিছু লিপিবদ্ধ করে।" *(সূরা যুখরুফ ৮০ আয়াত)*

গোপন-প্রেমিক বন্ধু আমার! ভালোবাসার নামে একজন উদাসীনা তরুণীকে গোপনে তার পিত্রালয় থেকে বের করে এনে কোন জায়গায় কোন মুন্সীকে ৫০/ ১০০ টাকা দিয়ে তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই বিয়ে পড়িয়ে নিয়ে ঘরের বউ করে তুলে আনলে, সে যে তোমার জন্য হালাল হবে না, তা তুমি জান কি? মহানবী ﷺ বলেন, "যে নারী তার অভিভাবকের সম্মতি ছাড়াই নিজে নিজে বিবাহ করে, তার বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল।" *(আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী, মিশকাত ৩১৩১ নং)*

অর্থাৎ, ঐ বউ নিয়ে সংসার করলে চির জীবন ব্যভিচার করা হবে। যেমন ব্যভিচার হবে স্ত্রী থাকতে আপন শালীর প্রেম অনির্বাণ রাখতে গিয়ে তাকেও বউ করে ঘরে আনলে। যেমন দারুণ স্পর্শকাতর 'ঢাকঢাক গুড়গুড়' পরিস্থিতিতে প্রিয়ার গর্ভে সন্তান ধারণ করা অবস্থায়

গোপনে চট্পট লজ্জা ঢাকার জন্য বিয়ে পড়িয়ে ফেলা হলেও তাকে নিয়ে সংসার বৈধ নয়। কারণ, বিবাহের পূর্বে বর-কনেকে 'কোর্টশীপ' বা হৃদয়ের আদান-প্রদানের কোন সুযোগ ইসলাম দেয়নি। আর সেক্সী কোন 'টেস্ট্-পরীক্ষা' তো নয়ই। অবশ্য উভয়ের জন্য একে অপরকে কেবল দেখে নেওয়ার অনুমতি আছে। তাছাড়া মহিলার গর্ভাবস্থায় বিবাহ-বন্ধন শুদ্ধ হয় না। সন্তান-প্রসবের পরই বিবাহ সম্ভব; যদিও সন্তান ঐ প্রেমিকেরই, যার সহিত প্রেমিকার বিবাহ হচ্ছে। বর্তমান পরিবেশে বিবাহ ও তালাককে এক প্রকার 'খেলা' মনে করা হলেও, আসলে তা কিন্তু ঐ ধরনের কোন 'খেলা' নয়। সুতরাং নিজের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী প্রয়োগ করতে চাইলে আল্লাহর বিধানে তা বাতিল গণ্য হবে।

জেনে রাখা ভালো যে, জোরপূর্বক কোন তরুণীকে বিবাহ করলে বিবাহ শুদ্ধ হয় না। যেমন কারো বিবাহিত স্ত্রীকে ভালোবেসে তুলে এনে তার সম্মতিক্রমে হলেও পূর্ব স্বামী তালাক না দেওয়া পর্যন্ত এবং তার অভিভাবক সম্মতি না দেওয়া পর্যন্ত বিবাহ শুদ্ধ হয় না। তাকে নিয়ে সংসার করলে ব্যভিচার করা হয়। এ ছাড়া ভাইঝি, বোনঝি, সৎ মা, শাশুড়ী প্রভৃতি এগানা নারীর সাথে প্রেম ও ব্যভিচার করা সবচেয়ে বড় পশুত্ব!

১৬- কুলকুল-তান যৌবনের যুবক বন্ধু আমার! যদি কাউকে ভালো লেগেই যায়, তাহলে হালাল ও বিধেয় উপায়ে তাকে পাওয়ার চেষ্টা কর। আর ভেবো না যে, প্রেম করে বিয়ে বেশী সুখময়। বরং বিয়ে করলেই দায়িত্ববোধের সাথে প্রেমের চেতনা অধিক বাড়ে। এ পবিত্র প্রেমে কোন প্রকার ধোকা থাকে না, থাকে না কোন প্রকার অভিনয় ও কপটতা। যে নির্মল প্রেমে থাকে দায়িত্বশীলতা ও কর্তব্যপরায়ণতা। আর এ জন্যই সমাজ-বিজ্ঞানী নবী ﷺ বলেন, "প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য বিবাহের মত অন্য কিছু (বিকল্প) নেই।" *(ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৫২০০ নং)*

অতএব প্রেম প্রকাশ ও বৃদ্ধি করা জন্য, প্রেমের ডালি খালি করার জন্য, প্রেম অনির্বাণ রাখার জন্য, প্রেম-রোগ উপশম করার জন্য, পবিত্র বিবাহ-বন্ধনের মত আর অন্য কোন বিকল্প গত্যন্তর নেই। তাই আল্লাহর কাছে দুআ করে গোপনে তোমার মানুষটিকে চেয়ে নাও এবং তাঁর নিকট হারামকারিতা থেকে শতবার পানাহ চাও। আর উপযুক্ত লোক লাগিয়ে বৈধ উপায়ে তাকে তোমার জীবন-সঙ্গিনী করে নাও। যে রতি হয়ে তোমার মনে এসেছিল, তাকে সতী হয়ে তোমার ঘরে আসতে দাও। যে প্রিয়া হয়ে প্রেমে ছিল, সে বধূ হয়ে তোমার অধরে আসুক। যে তোমার 'দ্রাক্ষা-বুকে শিরীন-শারাব' হয়ে এতদিন গোপনে লুকিয়ে ছিল, সে এবার প্রকাশ্যে তোমার পেয়ালায় এসে যাক্।

কিন্তু একান্তই তোমার আশা যদি দুরাশা হয়ে থাকে, তুমি যেমন পাওয়ার যোগ্য, তার চাইতে বড় যদি চাওয়া হয়ে থাকে, অথবা অন্য কোন কারণে যদি তুমি তোমার গোপন প্রিয়াকে তোমার জীবন-তরীতে না-ই পেয়ে থাক, তাহলে দুঃখ করো না। নিশ্চয়ই তাতে তোমার কোন মঙ্গল আছেই আছে, তাই তুমি তাকে পাওনি। অতএব এ ক্ষেত্রে তাকে মনে চাপা দেওয়ার জন্য খোঁজ করে তার চেয়ে বা তারই মত একজন (দ্বীনদার) সুন্দরীকে তোমার হৃদয়ের সিংহাসনে বসিয়ে ফেল। এটাই তোমার দ্বীন-দুনিয়ার জন্য উত্তম। এতে তোমার পূর্ব নেশা কেটে যাবে, মন স্থির হয়ে সংসার সুখের হবে এবং ফাটা ও কাটা মনে

প্রলেপ পড়বে। আর বিবাহ যদি একান্তই সম্ভব না হয়, তাহলে অবৈধ প্রণয় ও যৌন-প্রবৃত্তিকে দমন করতে আল্লাহর ওয়াস্তে রোযা পালন কর। ইনশাআল্লাহ, তোমার মনের সকল 'অস্‌অসা' দূর হয়ে যাবে, কারণ, রোযা হল 'তাকওয়া' ও আল্লাহ-ভীতির কারখানা।

নারী-পাগলা বন্ধু আমার! পুরুষের পক্ষে নারীর ফিতনার মত বড় ফিতনা আর অন্য কিছু নেই। মহানবী ﷺ বলেন, "আমার গত হওয়ার পরে পুরুষের পক্ষে নারীর চেয়ে অধিকতর ক্ষতিকর কোন ফিতনা অন্য কিছু ছেড়ে যাচ্ছি না।" *(আহমাদ, বুখারী ৫০৯৬, মুসলিম ২৭৪০ নং, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

নারী-ঘটিত ফিতনা অথবা নারীকে কেন্দ্র করে ঘটিত ফিতনার হার এ জগতে কম নয়। আর এই ফিতনায় পুরুষের ধন যায়, জ্ঞান হারায়, মান হারায়, দ্বীন হারায় এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রাণও হারায়। তাই তো মহানবী ﷺ পুরুষকে সাবধান করে বলেন, "অতএব তোমরা দুনিয়া ও নারীর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। আর জেনে রেখো যে, বনী ইসরাঈলের প্রথম ফিতনা যা ছিল, তা ছিল নারীকে কেন্দ্র করে।" *(আহমাদ, মুসলিম ২৭৪২, তিরমিযী ২১৯১, ইবনে মাজাহ ৪০০০ নং)*

শয়তানের যেমন কৌশল, চক্রান্ত ও ছলনা আছে, পুরুষের ব্যাপারে নারীরও বিভিন্ন কৌশল, চক্রান্ত ও ছলনা আছে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে উভয়ের চক্রান্তের কথা আলোচিত হয়েছে। কিন্তু বিতাড়িত শয়তানের চক্রান্ত ও কৌশলের ব্যাপারে কুরআন বলেছে, "নিশ্চয় শয়তানের কৌশল দুর্বল।" *(সূরা নিসা ৭৬ আয়াত)* পক্ষান্তরে নারীর কৌশল ও ছলনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, "নিশ্চয় তোমাদের ছলনা ভীষণ!" *(সূরা ইউসুফ ২৮ আয়াত)* সুতরাং জ্ঞানী বন্ধু! সাবধান থেকো। শয়তান ও নারীর চক্রান্ত-জালে ফেঁসে গিয়ে নিজের দ্বীন-দুনিয়া বরবাদ করে দিও না। কেউ যদি তোমার কাছে অযাচিতভাবে প্রেম নিবেদন করতে চায়, তবে সর্বপ্রকার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তার ছলনায় সাড়া দিও না। আর মনে রেখো যে, "আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না; (তারা হল,) ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ (রাষ্ট্রনেতা), সেই যুবক যার যৌবন আল্লাহ আযযা অজাল্লার ইবাদতে অতিবাহিত হয়, সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদ সমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন সদা আকৃষ্ট থাকে।) সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালোবাসার উপর মিলিত হয় এবং এই ভালোবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন (তাদের মৃত্যু) হয়। সেই ব্যক্তি যাকে কোন কুলকামিনী সুন্দরী (অবৈধ যৌন-মিলনের উদ্দেশ্যে) আহ্বান করে কিন্তু সে বলে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি। সেই ব্যক্তি যে দান করে গোপন করে; এমনকি তার ডান হাত যা প্রদান করে তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। আর সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তার উভয় চোখে পানি বয়ে যায়।" *(বুখারী ৬৬০নং, মুসলিম ১০৩১নং)*

ছলনাময়ী নারীর চক্রান্তে যাতে না পড়, তার জন্য বাংলা প্রবাদেও সতর্কবাণী এসেছে, তা মনে রেখো; 'কখনো খেয়ো নাকো তালে আর ঘোলে, কখনো ভুলো নাকো ঢেমনের বোলে।' ঠিকই তো 'বালির বাঁধ, শঠের প্রীতি, এ দুয়ের একই রীতি।' আর তাছাড়া 'জলের রেখা, খলের পিরীত' থাকেও না বেশীক্ষণ। এ ধরনের চক্রান্তময় প্রেমে থাকে এক প্রকার সুড়সুড়ি,

এক ধরনের স্বার্থ। যা শেষ হলে সব শেষ। সুতরাং মনে রেখো বন্ধু আমার! 'জল-জঙ্গল-নারী, এ তিনে বিশ্বাস নাই, বড়ই মন্দকারী।'

নারী শারীরিকভাবে দুর্বল হলেও এবং অনেকে নারীকে সামান্য জ্ঞান করলেও আসলে মনের দিক দিয়ে নারী বিশাল। পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য হল নারীর মন। সুবিস্তৃত মেঘমালা এবং ক্ষিপ্রগামী বাতাসের গতিবেগ হয়তো নির্ণয় করা সহজ; কিন্তু নারীর মনের গতিবেগ নির্ণয় করা মোটেই সহজ নয়। তা মাপা বা অনুমান করা আদৌ আসান নয়। আর এ জন্যই অনেকে সরল মনে নারীর ছলনার গরল পান করে ধোকা খায়।

'বুঝিনু না, ডাকিনীর ডাক এ যে,
এ যে মিথ্যা মায়া,
জল নহে, এ যে খল, এ যে ছল মরীচিকা-ছায়া।'

অতএব বন্ধু আমার! এমন নারীর ছলনা থেকে বাঁচার জন্য, এমন নারীর ফিতনা থেকে দূরে থাকার জন্য তুমি হযরত ইউসুফ নবী (আঃ) এর মত দুআ কর,

﴿رَب السجْنُ أَحَب إِلَي مِما يَدْعُونَنِيْ إِلَيهِ وَإِلا تَصْرِفْ عَنيْ كَيْدَهُن أَصْبُ إِلَيْهِن وَأَكُنْ من الجَاهِلِيْنَ﴾

অর্থাৎ, হে পরোয়ারদেগার! ওরা আমাকে যে বিষয়ের দিকে আহ্বান করছে, তা অপেক্ষা কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয়। তুমি যদি আমাকে ওদের ছলনা হতে রক্ষা না কর, তবে আমি ওদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞ মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। *(সূরা ইউসুফ ৩৩)*

মানুষের মন হল ফাঁকা ময়দানে পড়ে থাকা এক টুকরা হাল্কা পালকের মত। বাতাসের সামান্য দোলায় সে মন দুলতে থাকে, হিলতে থাকে, ছুটতে থাকে। মন হল পরিবর্তনশীল। সে মন থাকে আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মাঝে। তিনি মানুষের মন ঘুরিয়ে ও ফিরিয়ে থাকেন। অতএব এ বলেও দুআ করো তাঁর কাছে,

يَا مُقَلبَ القُلُوْبِ ثَبتْ قَلْبِيْ عَلى دِيْنِكَ.

অর্থাৎ, হে মনের গতি পরিবর্তনকারী! আমার মনকে তোমার দ্বীনের উপর স্থির রাখ।

পবিত্র প্রেম

মনে মনে কাউকে ভালো লেগে যাওয়া, কাউকে ভালোবেসে ফেলা, কারো প্রতি প্রেম হয়ে যাওয়া কোন দোষের কিছু নয়। কারণ, এ হল মনের ব্যাপার। আর মন যদি পবিত্র ও নির্মল থাকে তবে পাপেরও ভয় থাকে না তখন।

পবিত্র প্রেম হল অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর মত, যা নিঃশব্দে ধীরে ধীরে হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে লুকিয়ে বইতে থাকে, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল হতে পায় না। পবিত্র প্রেম সেই প্রেমকে বলে, যার মাঝে থাকে না কোন প্রকার পাপ-পঙ্কিলতা, থাকে না কপটতা ও কামচরিতার্থ করার লালসা ও বাসনা। পবিত্র প্রেম হল পবিত্র হৃদয়ের সেই ভালোবাসা ও আকর্ষণের নাম, যা হৃদয়ের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে। (বিবাহের পূর্বেই) প্রেম হৃদয়ের বাইরে বের হয়ে এলেই অপবিত্র হয়ে যায়। দর্শন, আলাপন, পত্রালাপ, দূরালাপ, স্পর্শ প্রভৃতির আবর্জনা মিশেই প্রেম কলুষিত ও কলঙ্কিত হয়। পরন্তু বিবাহ এ সব থেকে পবিত্র করে প্রেমকে নির্মল করে দেয়। কিন্তু সমস্যা হল এই যে, লোকেরা স্ত্রীর সাথে হালাল প্রেমকে 'প্রেম' মনে করে না, ভাবে সেটা কোন বাপুত্তি অধিকার। পক্ষান্তরে অপবিত্র ও অস্বাভাবিক প্রেমকেই লোকেরা 'ভালোবাসা' নামে অভিহিত করে থাকে।

প্রেম হয়ে যাওয়াটা মানুষের প্রকৃতিগত ব্যাপার এবং তা তার নির্মল ও সুকোমল হৃদয়েরই পরিচায়ক। কিন্তু প্রেম করাটা হল খারাপ। অর্থাৎ, প্রেমের অভিনয় করে কাউকে ধোকা দেওয়া অথবা অবৈধভাবে প্রেমের বিভিন্ন মঞ্জিল অতিক্রম করা ভালো মানুষের কাজ নয়। যেমন ভালো নয় কারো প্রেমের জেলে বন্দী হয়ে পড়া, অতিরঞ্জিতভাবে প্রেমের পূজা করা। আসলে হৃদয়ের প্রেমকে যে নিয়ন্ত্রণে রেখে যথার্থরূপে বৈধভাবে যথাস্থানে প্রয়োগ করতে পারে, সেই হল জ্ঞানী মানুষ। যেমন ভালো নয় শুষ্ক হৃদয়, তেমনি উচ্ছৃঙ্খল মানসিকতাও ভালোর পরিচয় নয়।

পবিত্র প্রেমের সাথে কামনার কোন সম্পর্ক নেই। 'প্রেম ও কামনা হল সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। প্রেম হচ্ছে ধীর, প্রশান্ত ও চিরন্তন। আর কামনা হচ্ছে সাময়িক উত্তেজনা।'

পবিত্র প্রেমের প্রেমিক বন্ধু আমার! প্রেমকে পবিত্র ও চিরন্তন রাখার জন্য বৈধ পথ ব্যবহার করে যাও। জেনে রেখো, কাউকে পছন্দ হওয়ার আগে, কোন কিছুকে পছন্দ করার পূর্বে, তোমার নিকট আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পছন্দ অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। আর মহান আল্লাহ বলেন, "যে কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার পথ বের করে দেবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে রুযী দান করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করবে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হবেন। আল্লাহ তার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সমস্ত কিছুর জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা স্থির করে রেখেছেন।" *(সূরা ত্বালাক্ব ২-৩ আয়াত)* "যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন।" *(ঐ ৪ আয়াত)*

অতএব এক আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভরসা রেখে তোমার পবিত্র প্রেমকে পবিত্র রেশমী রুমালের মত হৃদয়েই বেঁধে রেখো এবং পবিত্র অবস্থাতেই সেখান হতে খুলে নেওয়ার চেষ্টা

করো। আর তাঁর দরবার ছেড়ে প্রেমে সাফল্য লাভ করার জন্য কোন সৃষ্টির দরবারে গিয়ে আরো জঘন্য অপবিত্রতা শির্কে পড়ে যেও না। অর্থাৎ, তাকে পাওয়ার জন্য কোন তাবীয-ব্যবসায়ীর কাছে শির্কী তাবীয নিতে খবরদার যেও না। যোগ-যাদু করে তাকে বশীভূত করার উদ্দেশ্যে কোন যাদুকরের প্রতি পা বাড়াও না, কোন দর্গা বা মাযারে গিয়ে প্রেম অনির্বাণ রাখার আবেদন জানিয়ে মানত মেনে বা 'ধুল-ফুল' খেয়ে এস না। এ রকম করলে তুমি সব চাইতে বেশী অপবিত্র ও নীচ হয়ে যাবে।

পবিত্র প্রেমকে গোপনে অতিরঞ্জিত করে নিজেকে ধ্বংস করো না এবং এ কথা ভেবো না যে, "যে ব্যক্তি প্রেম করে এবং হারামে পতিত না হয়ে পবিত্র অবস্থায় মারা যায়, সে শহীদ!" এ কথা 'লায়লা-মজনু ও শিরী-ফরহাদ' জগতের বহু মানুষের নিকটেই প্রচলিত থাকলেও এবং অনেকে তা 'হাদীস' বলে জানলেও, আসলে তা কিন্তু প্রেমবাজদের দ্বীনের নবীর নামে মিথ্যা রচনা। *(সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৪০৯ নং)*

তবে হ্যাঁ, প্রেম হয়ে যাওয়ার পর যদি কেউ আল্লাহর ওয়াস্তে সবর করে এবং প্রেমিকার প্রতি দৃক্পাত করে না ও তার সাথে কথা বলার চেষ্টাও করে না। বরং আল্লাহর ভয়ে পবিত্রতা বজায় রাখে এবং তার নিকটবর্তী হওয়ারও চেষ্টা করে না। অথচ ইচ্ছা করলে সে এ সব কিছুই অনায়াসে করতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তার মনের সকল আশা-আকাঙ্খাকে গোপনে দমন করে রাখে এবং আল্লাহর প্রেম, ভয় ও সন্তুষ্টিকে এ সবের উপর অগ্রাধিকার দান করে, তাহলে সে আল্লাহ তাআলার এই প্রতিশ্রুতির আওতাভুক্ত হওয়ার আশা রাখতে পারে, যে প্রতিশ্রুতির কথা তিনি কুরআন মাজীদে বলেন, "যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং খেয়াল-খুশী হতে মনকে বিরত রাখে, অবশ্যই জান্নাত হবে তার আশ্রয়স্থল।" *(সূরা নাযিআত ৪০-৪১ আয়াত)* "আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দন্ডায়মান হতে হবে -এই ভয় রাখে (এবং সেই ভয়ে সকল পাপ-পঙ্কিলতা বর্জন করে) তার জন্য রয়েছে দু'টি বেহেশ্ত।" *(সূরা রাহমান ৪৬ আয়াত)*

এ ছাড়া 'শহীদ' হল আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত এক বিরাট 'মর্যাদা।' সে মর্যাদা তাঁর সন্তুষ্টির পথে নিজের জানকে কুরবানী দিলে -তবেই লাভ হয়। নিজের কামনা-বাসনা ও মনের খেয়াল-খুশীর তাবেদারী করে একজন সুন্দরী লাভের পথে জীবন দিলে সে মর্যাদা অবশ্যই পাওয়া যায় না।

তদনুরূপ বহু প্রেমবাজ ধৃষ্টরা এ কাজে আল্লাহর মনোনীত নবীদেরকেও শামিল করে নিজেদের দল ভারী করে ফেলেছে! আল্লাহর কুরআনকেও মিথ্যা বানিয়ে তারা গেয়েছে,

'প্রেমের মড়া জলে ডোবে না-
প্রেম করেছে ইউসুফ নবী,
তার প্রেমে জোলেখা বিবি গো---!'

এ বলে তারা তাদের কাজ যে খারাপ নয়, তা প্রমাণ করার মানসে সীমাহীন ধৃষ্টতা প্রকাশ করেছে।

যেমন হযরত ঈসা (আঃ) এর সাধ্বী মাতা মারয়্যামকেও তুলনা করা হয়েছে বারাঙ্গনার সাথে! কবি বলেন,

'অহল্যা যদি মুক্তি লভে মা, মেরী হতে পারে দেবী,
তোমরাও কেন হবে না পূজ্যা বিমল সত্য সেবি?!'

পাপী বানানো হয়েছে নির্বিচারে সকলকে। এ জন্য বলা হয়েছে,

'এ পাপ-মুলুকে পাপ করেনিক কে আছে পুরুষ নারী,
আমরা তো ছার; পাপে পঙ্কিল পাপীদের কান্ডারী!
---আদম হইতে শুরু করে এই নজরুল তক্ সবে,
কম-বেশী করে পাপের ছুরীতে পুণ্যে করেছে জবেহ!'

অথচ এ কথা অন্যান্য ধর্মের দেবতাদের ক্ষেত্রে সত্য হলেও সত্যের কান্ডারী নবীগণের ক্ষেত্রে একেবারে মিথ্যা। সুতরাং কোন কিছু নিয়ে মন্তব্য করার পূর্বে বিবেচনা করে দেখা জরুরী যে, যাকে চাবুক লাগাচ্ছি, আদৌ সে চাবুক খাওয়ার যোগ্য কি না?

শুধু নবীই নয়, বরং আল্লাহর ফিরিশ্তাদেরকেও ছাড়া হয়নি এ ব্যাপারে! কবি বলেছেন,

'--দু'দিনে আতশী (?) ফেরেশ্তা প্রাণ ভিজিল মাটির রসে,
শফরী চোখের চটুল চাতুরী বুকে দাগ কেটে বসে।
ঘাঘরী ঝলকি' গাগরী ছলকি' নাগরী 'জোহরা' যায়-
স্বর্গের দূত মজিল সে রূপে, বিকাইল রাঙা পায়!
অধর আনার রসে ডুবে গেল দোজখের মার ভীতি,
মাটির সোরাহী মস্তানা হল আঙ্গুরি খুনে তিতি!'
কোথা ভেসে গেল সংযম বাঁধ, বারণের বেড়া টুটে,
প্রাণ ভরে পিয়ে মাটির মদিরা ওষ্ঠ পুষ্প পুটে!!'

এ ধরনের বহু মজার গল্প শুনিয়ে ঐ শ্রেণীর তথাকথিত মানবতাবাদী নৈতিকতার শত্রুরা নিজেদের পাপকে সুশোভিত করার জন্য বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করে থাকে।

মহান আল্লাহ বলেন, "যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, সেই বিষয়ে তুমি অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় -ওদের প্রত্যেকটিকে (কাল কিয়ামতে) কৈফিয়ত দিতে হবে।" *(সূরা ইসরা ৩৬ আয়াত)*

ব্যভিচার

বিবাহ-বন্ধনের পূর্বে মনের বন্ধন যথেষ্ট মনে করে নারী-পুরুষের অবৈধ সংসর্গ বা যৌন-মিলন সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের এক বড় ব্যাধি। বিয়ে না করেই এ ধরনের যৌনক্রিয়া চরিত্রগত একটি জঘন্য অপরাধ। এ পথ ও আচরণ হল দুশ্চরিত্র, ভ্রষ্ট ও লম্পটদের। উভয়ের 'বিয়ে তো হবেই' মনে করে কোন প্রকার স্পর্শ বা দেহ-মিলন বৈধ হতে পারে না। যতক্ষণ না আল্লাহর বিধান দ্বারা উভয়ের মাঝে বন্ধন প্রতিষ্ঠা হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত দেখা-সাক্ষাৎও হারাম।

ব্যভিচার একটি কদর্য ও নোংরা আচরণ। ব্যভিচারে রয়েছে একাধিক বিঘ্ন ও বিপত্তি। ব্যভিচারে বংশ-পরিচয় হারিয়ে যায়, সম্ভ্রম নষ্ট হয়। ব্যভিচার-ঘটিত কারণে মানুষে-মানুষে

শত্রুতা ছড়িয়ে পড়ে। এটি এমন অপরাধ, যে অন্যান্য আরো অপরাধ টেনে নিয়ে আসে। ব্যভিচার হল পশুর আচরণ। ব্যভিচারের ফলে নানান ব্যাধি ও মহামারী দেখা দেয় সমাজে। যার জন্য সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ মানুষকে সাবধান করে বলেন, "আর তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং নিকৃষ্ট আচরণ।" *(সূরা ইসরা ৩২ আয়াত)*

অপরাধ হিসাবে ব্যভিচার তুলনামূলকভাবে অধিকতর জঘন্য। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, 'হত্যার পর ব্যভিচারের চেয়ে বড় গোনাহর কাজ আর অন্য কিছুকে জানি না।' বলা বাহুল্য এ কদাচার কোন মু'মিন নারী-পুরুষের হতে পারে না। মহান আল্লাহ নিজ বান্দার কিছু গুণ বর্ণনা করে বলেন, "এবং তারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান (শির্ক) করে না, আল্লাহ যে প্রাণ-হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতীত তা হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ গুলো করে তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন ওদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে ওরা হীন অবস্থায় স্থায়ী হবে।" *(সূরা ফুরকান ৬৮-৬৯)*

মহানবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, সবচেয়ে বড় পাপ কি? উত্তরে তিনি বললেন, "তোমার আল্লাহর সহিত কাউকে অংশী স্থাপন করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'তারপর কোন্ পাপ?' তিনি বললেন, "তোমার সঙ্গে খাবে এই ভয়ে নিজ সন্তান হত্যা করা।" পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল, 'তারপর কোন্ পাপ?' তিনি বললেন, "তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা।" *(বুখারী ৪৭৬১, মুসলিম ৮৬ নং)*

উক্ত আয়াত ও হাদীসে লক্ষণীয় যে, ব্যভিচারের পাপকে মানুষ খুন করার মত মহাপাপ এবং শির্কের মত অতি মহাপাপের পাশাপাশি বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এই জঘন্য কাজটি মুশরিকের জন্য শোভনীয়, কোন মুসলিমের জন্য নয়। আর এ জন্যই মহান আল্লাহ একটি বাস্তব পরিস্থিতি উল্লেখ করে বলেন, "ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক নারীকেই বিবাহ করে এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষই বিবাহ করে। আর তা মু'মিনদের জন্য হারাম করা হয়েছে।" *(সূরা নূর ৩ আয়াত)*

মহান আল্লাহ তাঁর মু'মিন বান্দার গুণ বর্ণনা করে অন্যত্র বলেন, "মু'মিন বান্দারা অবশ্যই সফলকাম। ---যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। --- (অর্থাৎ, ব্যভিচার করে না।) *(সূরা মু'মিনূন ৫, সূরা মাআরিজ ২৯ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "মু'মিন থাকা অবস্থায় কোন ব্যভিচারী ব্যভিচার করে না।" *(বুখারী, মুসলিম প্রমুখ)* অর্থাৎ, এ অবস্থায় তার ঈমান তার হৃদয়ে অবস্থান করে না!

পক্ষান্তরে ব্যভিচার সে-ই করতে পারে, যার লজ্জা-শরম নেই। নির্লজ্জ নারী-পুরুষই এমন অবৈধ যৌন-মিলন ঘটাতে পারে। অথচ "লজ্জা হল ঈমানের একটি শাখা।" *(মুসলিম, তিরমিযী প্রমুখ, সহীহুল জামে ৩১৯৭ নং)* সুতরাং লজ্জা না থাকলে তথা নির্লজ্জ হয়ে ব্যভিচারের মত মহাপাপ করলে সে অবস্থায় মু'মিন থাকা যায় কি করে?

ব্যভিচারী আল্লাহর কাছে দুআ করলেও তার দুআ কবুল হয় না। *(সহীহুল জামে ২৯৭১নং)*

ব্যভিচারী ইসলামী রাষ্ট্রে কঠিন শাস্তির উপযুক্ত। বিবাহিত নারী-পুরুষ ব্যভিচার করে থাকলে তাদেরকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হয়। অবশ্য ব্যভিচারী নারী-পুরুষ অবিবাহিত হলে তাদের শাস্তি হাল্কা। মহান আল্লাহ বলেন, "ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী -ওদের প্রত্যেককে

একশত বেত্রাঘাত কর; আল্লাহর বিধান কার্যকরী করতে ওদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে অভিভূত না করে -যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। আর মু'মিনদের একটি দল যেন ওদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।" *(সূরা নূর ২ আয়াত)*

এ ছাড়া মহানবী ﷺ এর জবানী মতে উভয়কে বেত্রাঘাত সহ এক বছরের জন্য দেশ থেকে বহিষ্কার করার কথাও বলা হয়েছে।

সুতরাং উক্ত জঘন্যতম কাজ যে কেউ প্রেম ও ভালোবাসার মাধ্যমে করুক অথবা এমনিই করুক, ভদ্র করুক অথবা অভদ্র করুক, ধনী করুক অথবা গরীব করুক, প্রত্যেকের জন্য একই শাস্তি প্রযোজ্য এবং কারো ব্যাপারেই এ শাস্তি প্রয়োগে কোন প্রকার দয়া প্রকাশ করার অবকাশ নেই। কারণ, ব্যভিচারী হল সমাজের কলঙ্ক, কুলের কুলাঙ্গার, পবিত্র পরিবেশের ঘৃণ্য জীব। বিশেষ করে সেই নারী ও পুরুষ, যার স্বামী ও স্ত্রী থাকতেও অথবা যৌনক্ষুধা কিছু প্রশমিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচার করে, বেশ্যালয়ে যায় অথবা 'ফ্রেন্ড্' ব্যবহার করে, তারা এমন অপরাধী; যাদেরকে সমাজে বাঁচিয়ে রাখাই হল কলঙ্ক প্রতিপালিত করা, আর তা পবিত্র সমাজ ও পরিবেশের জন্য বড় অহিতকর।

পরন্তু কেউ যদি গোপনে এমন মহাপাপ করেও দুনিয়ার শাস্তি থেকে বেঁচে যায়, তাহলে সে যে রক্ষা পেল তা নয়। দুনিয়াতে তার শাস্তি প্রয়োগ না হলেও আখেরাতে মহাবিচারকের বিচারে সে মহাশাস্তি ভোগ করবে।

পাপ করে যাবে কোথায়? তোমার পাপের কথা তোমার অতন্দ্র-প্রহরী সঙ্গী ফিরিশ্তা তোমার রোজনামচা আমলনামায় লিখে রাখছেন। একদিন এমন আসছে, যেদিন আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে। তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করতে হবে। মাটি সেদিন তার সকল খবর বলে দেবে। অণু পরিমাণ পাপ অথবা পুণ্য স্বচক্ষে দেখা যাবে।

মনে কর এক কক্ষে তুমি তোমার প্রিয়তমার সহিত অবৈধ দেহ-মিলনে বিভোল আছ। এমন সময় কক্ষের দরজা ঠেলে তোমার আব্বা, আম্মা, ভাই, বিশ্বস্ত বন্ধু অথবা কোন শত্রু তোমাকে ঐ অবস্থাতেই দেখে ফেলল। তখন তোমার অনুভূতি কি হবে? আর যদি তুমি এমনই চালাক হও যে, তোমার সে কাজ কেউই ধরতে ও বুঝতে পারে না, তাহলে "তুমি কখনো মনে করো না যে, অত্যাচারীরা যা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে উদাসীন। অবশ্য তিনি ওদেরকে সেদিন পর্যন্ত ঢিল দেন, যেদিন চক্ষু স্থির হবে।" *(সূরা ইবরাহীম ৪২ আয়াত)*

সৃষ্টির নজর থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করলেও স্রষ্টার নজর থেকে তা কোন সময়ই পারবে না। ঘরের সকল দরজা বন্ধ করে পাপে লিপ্ত হলেও আল্লাহ ও তোমার মাঝে কোন দরজা বা পর্দার আড়াল আনতে পার না। রাতের গোপন গহীন অন্ধকারে সকলে ঘুমে ঢলে পড়েছে, তুমি সে সময়কে প্রিয়ার সহিত মিলনের সুবর্ণ সুযোগ মনে করলেও, এ কথা ভুলে যেও না যে, একজন সদা জাগ্রত আছেন। যিনি সকল পর্দা ও অন্ধকারের আবরণ ভেদ করে তোমার প্রতি সুতীক্ষ্ম দৃষ্টি রেখেছেন। সুতরাং পরকালের মহাশাস্তির জন্য প্রস্তুত থেকো।

মহানবী ﷺ বলেন, "অধিকাংশ যে অঙ্গ মানুষকে দোযখে নিয়ে যাবে, তা হল মুখ ও গুপ্তাঙ্গ।" *(আহমাদ ২/২৯১, তিরমিযী ২০০৪, ইবনে মাজাহ ৪২৪৬, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৭৭ নং)*

তিনি স্বপ্নযোগে এক শ্রেণীর ব্যভিচারী নারী-পুরুষের আযাব দর্শন করেন; যারা উলঙ্গ

অবস্থায় আগুনের চুল্লীতে আগুনের ক্ষিপ্ত প্রবাহে ওঠা-নামা করছে! *(মুসলিম)*

তিনি আরো দেখেন যে, এক সম্প্রদায় ফুলে-ফেঁপে ঢোল হয়ে আছে, তাদের নিকট হতে বিকট দুর্গন্ধ ছুটছে। মনে হচ্ছিল তাদের সে গন্ধ যেন পায়খানার ট্যাংকের মত। তারা ছিল ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর দল। *(ইবনে খুযাইমাহ ১৯৮৬, ইবনে হিব্বান ৭৪৯১ নং, হাকেম ১/৪৩০)*

ব্যভিচারের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও ভয়ঙ্কর পরিণতি

ব্যভিচারে নায়ক-নায়িকার জন্য সাময়িক সুখ থাকলেও এর পরিণতি কিন্তু চরম ভয়ানক। পরকালের শাস্তি ছাড়াও ইহকালে রয়েছে তার অহিতকর বিভিন্ন কুফল।

আধুনিক যুগে ব্যভিচার ও জরায়ু-স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় উপহার হল এড্স। এড্স এমন এক মহামারী, যার সঠিক ঔষধ ও চিকিৎসা-পদ্ধতি অদ্যাবধি আবিষ্কার হয়নি। যে রোগ নিয়ে বিশ্বের বড় বড় ডাক্তারদের সম্মিলন হচ্ছে, কিন্তু এর কোন প্রতিকার বা প্রতিরোধ-ব্যবস্থা সার্বিকভাবে হয়ে উঠছে না।

এড্স এমন ভয়ানক ব্যাধি, যা ক্যান্সার অপেক্ষা অধিক বিপজ্জনক। যার শেষ পরিণাম হল, নানা ধরনের ব্যথা-বেদনার পর মৃত্যু। ক্যান্সারের মতই এড্স শরীরের কোন নির্দিষ্ট স্থানে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। বরং সারা শরীরে ছড়িয়ে থাকে এ রোগের জীবাণু। ফলে নির্মূল করার মত কোন চিকিৎসার আশা বড় একটা অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং এমন ব্যাধিগ্রস্তের অধিকাংশ মানুষ মরণ-সাগরে গিয়ে মিলিত হয়।

জাতি সংঘের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ১৯৯৮ সালে এড্স রোগের ফলে ২৩ লাখ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে! *(মাজাল্লাতুল বায়ান ১৪০/৮৯)*

বলাই বাহুল্য যে, এ রোগের প্রকোপ সেই উন্নত-বিশ্বেই বেশী, যেখানে আছে প্রগতির রঙে চরম যৌন-স্বাধীনতা ও ব্যভিচারের ব্যাপক প্রচলন। যে সব দেশে কুমারী মা ও গর্ভিণীর সংখ্যা সীমাহীন এবং যে সব দেশের অভিধান থেকে 'সতী ও সতীত্ব' শব্দটুকুও মুছে ফেলা হয়েছে।

সত্য বলেছেন আল্লাহর নবী ﷺ। সত্য তাঁর নবুওয়াতের অহীলব্ধ ভবিষ্যদ্বাণী। তিনি বলেছেন, "হে মুহাজিরদল! পাঁচটি কর্ম এমন রয়েছে যাতে তোমরা লিপ্ত হয়ে পড়লে (উপযুক্ত শাস্তি তোমাদেরকে গ্রাস করবে)। আমি আল্লাহর নিকট পানাহ চাই, যাতে তোমরা তা প্রত্যক্ষ না কর।

যখনই কোন জাতির মধ্যে অশ্লীলতা (ব্যভিচার) প্রকাশ্যভাবে ব্যাপক হবে তখনই সেই জাতির মধ্যে প্লেগ এবং এমন মহামারী ব্যাপক হবে যা তাদের পূর্বপুরুষদের মাঝে ছিল না----।" *(বাইহাকী, ইবনে মাজাহ ৪০১৯নং, সহীহ তারগীব ৭৫৯নং)*

নবী ﷺ বলেন, "যখনই কোন জাতি তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তখনই তাদের মাঝে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যখনই কোন জাতির মাঝে অশ্লীলতা আত্মপ্রকাশ করে তখনই সে

জাতির জন্য আল্লাহ মৃত্যুকে আধিপত্য প্রদান করেন। (তাদের মধ্যে মৃতের হার বেড়ে যায়।) আর যখনই কোন জাতি যাকাৎ-দানে বিরত হয় তখনই তাদের জন্য (আকাশের) বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হয়।” *(হাকেম ২/১২৬, বাইহাকী ৩/ ৩৪৬, বায্যার ৩২৯৯ নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ১০৭নং)*

অবৈধ যৌনাচারের ফলে প্রাদুর্ভূত বিভিন্ন পুরনো রোগ তো আছেই। গণোরিয়া, সিফিলিস, শুক্রক্ষরণ প্রভৃতি যৌনরোগ ব্যভিচারীদের মাঝেই আধিপত্য বিস্তার করে। গণোরিয়া বা প্রমেহ রোগে জননাঙ্গে ঘা ও জ্বালা সৃষ্টি হয় এবং সেখান হতে পুঁজ নিঃসরণ হয়। মূত্রনালী জ্বালা করে, সুড়সুড় করে। মূত্রত্যাগে কষ্ট হয়। পানির মত প্রস্রাবের পর হলুদ পুঁজযুক্ত পদার্থ বের হয়। সে সঙ্গে মাথা ধরা ও ঘোরা, জ্বর এবং নিম্নগ্রন্থি-স্ফীতি তো আছেই।

সিফিলিস বা উপদংশ রোগ শরীরে প্রবেশ করার পর সপ্তাহ মধ্যে লাল দাগ ও ফুস্কুড়ি প্রকাশ পায়। এরপর হতে শরীর অনবরত চুলকায় ও তার চারধারে প্রদাহযুক্ত পানি-ভরা ফোস্কা দেখা দেয় এবং ঐ সব ফুস্কুড়ি হতে পরে গলে ঘা হয় ও পুঁজ বের হয়। রোগ পুরনো হলে নখ খসে যায়, চুল ওঠে এবং সর্বাঙ্গে উদ্ভেদ প্রকাশ পায়।

আর শুক্রক্ষরণ রোগে তরল বীর্য যখন-তখন ঝরতে থাকে। এর ফলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে, বুক ধড়ফড় করে, মাথা ধরে ও ঘোরে ইত্যাদি।

সুতরাং এমন সব রোগের কথা শুনে শঙ্কিত হওয়া উচিত ব্যভিচারীকে। ক্ষণস্থায়ী সে স্বাদে লাভ কি, যার পরে আছে দীর্ঘস্থায়ী বা চিরস্থায়ী বিষাদ।

ব্যভিচার ব্যভিচারীর জন্য সাংসারিক ও পারিবারিক লাঞ্ছনা ডেকে আনে। আত্মীয়-স্বজনের সামনে হতে হয় অপমানিত। কারণ, ব্যভিচারী যতই সতর্কতা ও গোপনীয়তা অবলম্বন করুক না কেন, একদিন না একদিন তার সে পাপ-রহস্য মানুষের সমাজে প্রকাশ পেয়েই যায়। ফলে তার ব্যাপারে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে একটা এমন দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ে, যার দরুন সে প্রায় সকলের কাছে নিন্দার্হ ও ঘৃণার্হ হয়। সহজে কেউ তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক কায়েম করতে চায় না। অনেক সময় তার কারণে তার পুরো বংশ ও পরিবারেরই বদনাম হয়। শেষে পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, ভালো লোকেরা তাদের সহিত কোন সম্পর্ক কায়েম করতে চায় না। অবশ্য ‘কানা বেগুনের ডোগলা খদ্দের’ তো আছেই।

পক্ষান্তরে ব্যভিচারীর জীবনে লাঞ্ছনা যখন আসে, তখন তার হৃদয়ের জ্যোতি বিলীন হয়ে যায় এবং মন ভরে ওঠে অন্ধকারে। অপমানের পর এমনও হয়ে থাকে যে, শেষে সে একজন নির্লজ্জ ধৃষ্টতে পরিণত হয়ে যায়। সমাজে চলার পথে তার আর কোন প্রকার ‘হায়া-শরম’ বলতে কিছু থাকে না। আর যার লজ্জা থাকে না, তার কিছু থাকে না। লজ্জাহীনের পূর্ণ ঈমানও থাকে না। যার ফলে মানুষের মনুষ্যত্ব ধ্বংস হয়ে যায় এবং পশুর পশুত্ব এসে স্থান নেয় তার মনে ও আচরণে।

ব্যভিচারীর মনে সব সময় এক প্রকার ভয় থাকে। অন্তরে বাসা বাঁধে সার্বক্ষণিক লাঞ্ছনা। যেমন আল্লাহর আনুগত্যে থাকে সম্মান ও মনের প্রফুল্লতা। মহান আল্লাহ বলেন, “যারা মন্দ কাজ করে, তাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে---।” *(সূরা ইউনুস ২৭)*

ব্যভিচারী সর্বদা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে। জারজ জন্ম নিলে তো আরো। এ ছাড়া ব্যভিচারের ফলে তার সম্ভ্রম ও আত্মমর্যাদা যায়, স্ত্রী-কন্যার ব্যাপারে ঈর্ষা যায়। বরং ব্যভিচারী মিথ্যাবাদীও হয়, খেয়ানতকারী ও ধোকাবাজ হয়। সাধারণতঃ বন্ধুর বন্ধুত্বের মানও খেয়াল রাখে না। *(রওযাতুল মুহিব্বীন দ্রঃ)*

ব্যভিচারী দ্বীনী ইল্ম থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ, ইল্ম হল আল্লাহর নূর। আর আল্লাহর নূর কোন পাপিষ্ঠকে দেওয়া হয় না, তথা পাপের কালিমা সে জ্যোতিকে নিষ্প্রভ করে ফেলে।

ব্যভিচার এমন এক 'ফ্রি সার্ভিস' চিত্তবিনোদনের সুন্দর উপায় যে, ব্যভিচারীকে বিবাহ করে ঘর-সংসার করতে বাধা দেয়। তাকে বিবাহে আগ্রহহীন ও নিস্পৃহ করে তোলে। বিনা খরচ ও পরম স্বাধীনতায় যদি কাম-চরিতার্থ করা সহজ হয় এবং স্বামীর কোন প্রকার দায়িত্ব ঘাড়ে না নিয়েই যদি মনের মত 'বউ' পাওয়া যায়, তবে কে আর বিয়ে করবে? ব্রিটেনের প্রায় ৯০ শতাংশ যুবক-যুবতী এই দায়-দায়িত্বহীন সম্পর্ককেই পছন্দ করে এবং বিবাহে জড়িয়ে পড়াকে বড্ড ঝামেলার কাজ মনে করে! *(আল-ইফ্ফাহ ১৯ পৃঃ)*

ব্যভিচার স্বামী-স্ত্রীর সংসারে ফাটল ধরায়। কারণ, অন্যাসক্ত স্বামীর মন পড়ে থাকে অন্য যুবতীর প্রতি। অনুরূপ অন্যাসক্তা স্ত্রীর মন পড়ে থাকে কোন অন্য রসিক নাগরের যৌবন-আসনে। আর এই উভয়ের মাঝে সন্দেহ বাসা বাঁধে। একে অপরের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। সন্দেহ হয় স্বামীর নিজের সন্তানের ব্যাপারেও। প্রতিবাদ ও কৈফিয়ত হলে কলহ বাধে। অতঃপর চলে মারধর। আর তারপরই তালাক অথবা খুন!

ব্যভিচার পিতার পিতৃবোধ এবং মাতার মাতৃবোধ বিনষ্ট করে ফেলে। পিতৃ ও মাতৃ-বাৎসল্য সন্তানদের উপর থেকে উঠে যায়। যেমন অনেকের জানতে বা অজান্তে সমাজে পয়দা হয় হাজারো জারজ সন্তান।

ব্যভিচার সমাজে নিরাপত্তাহীনতা ডেকে আনে। ধর্ষণের ভয়ে কিশোরী-যুবতীর নিরাপত্তা থাকে না। এমন কি নিরাপত্তা থাকে না কোন সুদর্শন কিশোরেরও! বাড়ির ভিতরে থেকেও মনের আতঙ্কে শান্তির ঘুম ঘুমাতে পায় না তারা। অনেকে ঐ শ্রেণীর হিংস্র নেকড়ের পাল্লায় পড়ে জীবন পর্যন্তও হারিয়ে বসে।

মানসিক বিপর্যয় ঘটিয়েই ব্যভিচার বহু সমাজ-বিরোধী অপরাধী সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ করে পিতা-মাতার স্নেহ ও মায়া-মমতা থেকে বঞ্চিত জারজ সন্তানরা মানসিক কঠোরতা ও সামাজিক ঘৃণার মাঝে মানুষ হতে থাকে এবং পরিশেষে অপরাধ জগৎকেই মনের মত জগৎ বলে নিজের জন্য বেছে নয়।

ব্যভিচার চরিত্রহীনতার এক মহা অপরাধ। এ অপরাধ-রাজ্যে বাস করে মানুষ যে সব সময় আনন্দ পায় তা নয়। যেমন আল্লাহর আনুগত্য ও স্মরণে মন প্রশান্ত থাকে, তেমনি তাঁর অবাধ্যাচরণ ও পাপ-পঙ্কিলতাময় জীবনে মন বিক্ষিপ্ত ও অশান্তিময় থাকে। আর মহান আল্লাহ বলেন, "তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ, যে তার খেয়াল-খুশীকে নিজের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ তা জেনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং ওর কর্ণ ও হৃদয় মোহর (সীল) করে দিয়েছেন। আর ওর চোখের উপর ফেলে দিয়েছেন পর্দা। অতএব আল্লাহ তাকে বিভ্রান্ত করার পর কে তাকে পথ নির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?" *(সূরা*

জাসিয়াহ ২৩ আয়াত)

বলা বাহুল্য যে, প্রেম ও ব্যভিচারের মত ক্ষণিকের সুখ ও সম্ভোগের জগতে মন-পূজারী বহু যুবক-যুবতী আপোসের মাঝে প্রেম ও মিলন কলহ নিয়ে কত শত মনের ধিক্কারে আত্মহত্যার শিকারে পরিণত হয়। ১৯৮৭ সালের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বৃটেনে প্রতি ২ ঘন্টায় একটি করে যুবক আত্মহত্যা করে মৃত্যুবরণ করে থাকে! *(আল-ইফ্‌ফাহ ২৫পৃঃ)*

ব্যভিচার এমন এক অপরাধ যে, তার ফলে খুন হয় লাখো লাখো সদ্যপ্রসূত কচি-কাঁচা শিশু। নির্দয় পাষন্ড মা জন্মের পর তাকে ডাষ্টবিনে, নদীতে অথবা কোন ঝোপে-জঙ্গলে ফেলে আসে! লাখো লাখো সন্তানকে ভ্রূণ অবস্থায় পেটেই হত্যা করা হয়। কারণ, পিতা-মাতার উদ্দেশ্য ছিল, কেবল কামতৃষ্ণা নিবারণ করা, কোন অযাচিত সন্তান নেওয়া নয়।

ব্যভিচারের ফলে বংশে এমন এক সন্তান অনুপ্রবেশ করে, যে সে বংশের কেউ নয়। সে মীরাস পায়, অথচ সে ওয়ারেস নয়। অনেক সময় এই সন্তান প্রকৃত ওয়ারেসীনকে বঞ্চিতও করে। পরিবারে অনেকের সে মাহরাম গণ্য হয়, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে গায়র মাহরাম ও বেগানা। আর এইভাবে একটি পাপের কারণে আরো বহু গুপ্ত ফাসাদ চলতে থাকে সংসারে। যে পাপের কথা কেবল মন জানে, যেমন আসল বাপের কথা কেবল মা জানে।

ব্যভিচার আল্লাহর গযব আনয়ন করে। "সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় অথবা কঠিন শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।" *(সূরা নূর ৬৩ আয়াত)*

ব্যভিচার এক নিকৃষ্ট মহাপাপ। যে পাপের শাস্তি স্বরূপ অনুরূপ পাপ তার পরিবারে এসে যেতে পারে। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন, "মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ।" *(সূরা শূরা ৪০ আয়াত)* "যারা মন্দ কাজ করে তাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং তাদেরকে লাঞ্ছনা আচ্ছন্ন করবে ---।" *(সূরা ইউনুস ২৭ আয়াত)* সাধারণতঃ ব্যভিচারীদের স্ত্রী অথবা বোন অথবা কন্যাও ব্যভিচারিণী হয়ে থাকে। কারণ, তারা তাদের ব্যাপারে ঈর্ষাহীন হয়ে পড়ে। তাছাড়া যে পরস্ত্রীকে অসতী করে বেড়ায়, তার স্ত্রীও অসতী হতে পারে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, "দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য।" *(সূরা নূর ২৬ আয়াত)*

অথচ কোন মানুষ, বরং স্বয়ং ব্যভিচারী ও লম্পটও চায় না যে, তার স্ত্রী ব্যভিচারিণী বা অসতী হোক।

'নিজেদের নেই মনুষ্যত্ব, জানি না কেমনে তারা-
নারীদের কাছে চাহে সতীত্ব হায়রে শরম-হারা!'

ব্যভিচারী হলেও সে কোন দিন চাইবে না যে, তার স্ত্রীও তারই মত ব্যভিচার করুক অথবা তার স্ত্রীকে কেউ ধর্ষণ করুক। স্ত্রী খুন হয়েছে শুনে মনে যতটা আঘাত লাগে, স্ত্রী ব্যভিচার করেছে বা ধর্ষিতা হয়েছে শুনে মনে আঘাত লাগে তার থেকে অনেক গুণ বেশী। সা'দ বিন উবাদাহ (রাঃ) বলেন, 'যদি আমি আমার স্ত্রীর সাথে অন্য পুরুষকে দেখি, তাহলে তরবারি দ্বারা তার মাথা কেটে ফেলব।' এ কথা মহানবী ﷺ এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, "তোমরা কি সা'দের ঈর্ষায় আশ্চর্যবোধ করছ? আল্লাহর কসম! আমি ওর থেকেও বেশী ঈর্ষাবান এবং আল্লাহ আমার থেকেও বেশী ঈর্ষাবান। আর এ জন্যই তিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য

সকল অশ্লীলতাকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। *(বুখারী ৭৪১৬, মুসলিম ১৪৯৯ নং)*

অনুরূপ কোন আত্মমর্যাদাবান পুরুষই চায় না যে, তার কোন নিকটাত্মীয় মহিলা ব্যভিচারিণী হোক। অতএব ব্যভিচারী কিরূপে অপরের নিকটাত্মীয় মহিলার সহিত সে কাজ পছন্দ করে?

একদা এক যুবক আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'আপনি আমাকে ব্যভিচার করার অনুমতি দিন!' তিনি বললেন, "তুমি কি তোমার মায়ের সাথে তা পছন্দ কর? তোমার বোন বা মেয়ের সাথে, তোমার ফুফু বা খালার সাথে তা পছন্দ কর?" যুবকটি প্রত্যেকের জন্য উত্তরে একই কথা বলল, 'না। আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার জন্য আমার জীবন উৎসর্গ হোক। (তাদের সঙ্গে আমি এ কাজ করতে চাই না।)' তখন মহানবী ﷺ বললেন, "তাহলে লোকেরাও তো পছন্দ করে না যে, কেউ তাদের মা, মেয়ে, বোন, খালা বা ফুফুর সাথে ব্যভিচার করুক।" *(আহমাদ ৫/২৫৬-২৫৭, ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৭০ নং)*

অতএব ব্যভিচারী যুবককে এ ব্যাপারে উপদেশ গ্রহণ করা উচিত।

ব্যভিচার ও লাম্পট্য জগতের এ পাপ কিন্তু এক পর্যায়ের নয়। যেমন, ছোট ব্যভিচার হল, কাম নজরে দেখা চোখের ব্যভিচার। যৌন উত্তেজনামূলক কথা শোনা কানের ব্যভিচার এবং তা বলা জিভের ব্যভিচার। স্পর্শ করা হাতের এবং যৌন-মিলনের উদ্দেশ্যে চলা পায়ের ব্যভিচার। আর দুই যৌনাঙ্গের মিলনে হয় বড় ও আসল ব্যভিচার। *(মিশকাত ৮৬ নং)*

কোন অবিবাহিতা নারীর সহিত ব্যভিচার করার চাইতে বড় ব্যভিচার হল কোন বিবাহিতা নারীর সহিত ব্যভিচার। এর চাইতে বড় হল কোন আত্মীয় বা প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার। অতঃপর নিজের ভাইঝি-বোনঝি বা খালা-ফুফুর সাথে, অতঃপর নিজের বোনের সাথে, অতঃপর নিজের মেয়ের সাথে এবং সর্বোপরি বড় ব্যভিচার হল মায়ের সাথে ব্যভিচার! (নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিকা কুল্লিহ) অবশ্য একান্ত জানোয়ার ছাড়া নিজের নিকটাত্মীয় এগানা মহিলাদের সাথে কেউ একাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয় না। আর এগানা মহিলা হল সেই সব মহিলা, যাদের সহিত কোন সময়ই বিবাহ বৈধ নয়।

পরিবেশে ব্যভিচার প্রসার লাভ করার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। তার মধ্যে প্রধান প্রধান কারণ নিম্নরূপঃ-

১- যুবক-যুবতীর নির্জনতা অবলম্বন, একান্তে গমন-ভ্রমণ, কোন বাড়ি বা রুমে একাকী উভয়ের বসবাস, রিক্সা বা গাড়িতে চালকের সাথে একাকিনী যাতায়াত, দোকানে দোকানদারের কাছে একাকিনী মার্কেট করা, দর্জির কাছে একান্তে পোশাকের মাপ দেওয়া, ডাক্তারের সহিত নার্সের অথবা রোগিনীর একান্তে চিকিৎসা কাজ, প্রাইভেট টিউটরের কাছে একাকিনী পড়াশোনা করা ইত্যাদি। এগুলি ব্যভিচারের এক একটি সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ। মহানবী ﷺ বলেন, "কোন মহিলার সাথে কোন পুরুষ যখন নির্জনতা অবলম্বন করে, তখন শয়তান তাদের তৃতীয় জন (কুট্‌না) হয়। *(তিরমিযী, মিশকাত ৩১১৮-নং)* আর এই কারণেই মহিলার জন্য স্বামীর ভাই ইত্যাদি বেগানা আত্মীয়কে মৃত্যুর সাথে তুলনা করা হয়েছে! *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩১০২নং)*

২- অবাধ মিলামিশা। পর্দার সাথে হলেও পাশাপাশি নারী-পুরুষের অবস্থান ব্যভিচারের এক বিপজ্জনক ছিদ্রপথ। একই বাড়িতে চাচাতো প্রভৃতি ভাই-বোন, স্কুল-কলেজে ও চাকুরী-ক্ষেত্রে যুবক-যুবতীর অবাধ দেখা-সাক্ষাৎ, অনুরূপ মার্কেটে, মেলা-খেলায়, বিয়ে-বাড়ি, মড়া-বাড়ি, হাসপাতাল প্রভৃতি জায়গায় নারী-পুরুষের বারবার সাক্ষাতের ফলে পরিচয় এবং প্রেম, আর তার পরই শুরু হয় ব্যভিচার।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, 'তোমাদের কি শরম নেই? তোমাদের কি ঈর্ষা নেই? তোমরা তোমাদের মহিলাদেরকে পর-পুরুষদের মাঝে যেতে ছেড়ে দাও এবং এরা ওদেরকে ও ওরা এদেরকে দেখাদেখি করে!' *(হাকাযা তুদাম্মিরু জারীমাতুল জিনসিয়্যাতু আহলাহা ২২পৃঃ)*

৩- বিবাহে বিলম্ব। সঠিক ও উপযুক্ত বয়সে বা প্রয়োজন-সময়ে বিয়ে না হলে যৌনক্ষুধা নিবারণের জন্য ব্যভিচার ঘটা স্বাভাবিক। অধ্যয়ন শেষ করার আশায় অথবা চাকুরী পাওয়ার অপেক্ষায় অথবা সামাজিক কোন বাধায় (বিধবা) বিবাহ না হওয়ার ফলে ব্যভিচারের এক চোরা পথ খোলা যায়।

৪- অতিরিক্ত মোহর অথবা পণ ও যৌতুক-প্রথাও ব্যভিচারের একটি কারণ। কেন না, উভয় প্রথাই বিবাহের পথে বড় বাধা।

৫- মহিলাদের বেপর্দা চলন ও নগ্নতা। ব্যভিচার ও ধর্ষণের এটি একটি বড় কারণ। ছিলা কলাতে মাছি বসা স্বাভাবিক। ছিলা লেবু বা খোলা তেঁতুল দেখলে জিভে পানি আসা মানুষের প্রকৃতিগত ব্যাপার। অনুরূপ পর্দাহীনা, অর্ধনগ্না ও প্রায় পূর্ণ নগ্না যুবতী দেখলে যুবকের মনে কাম উত্তেজিত হওয়াও স্বাভাবিক। আর এ জন্যই ইসলামে পর্দা-প্রথা মহিলার উপর ফরয করা হয়েছে। নারীকে তার সৌন্দর্য বেগানা পুরুষকে প্রদর্শন করতে নিষেধ করা হয়েছে। *(সূরা নূর ৩১ আয়াত)* আর মহানবী ﷺ বলেছেন যে, "নারী হল গোপনীয় জিনিস। তাই যখন সে (গোপনীয়তা থেকে) বের হয়, তখন শয়তান তাকে পুরুষের চোখে শোভনীয়া ও লোভনীয়া করে তোলে।" *(তিরমিযী, মিশকাত ৩১০৯ নং)*

৬- নোংরা ফিল্ম্ দেখা, অশ্লীল পত্র-পত্রিকা পড়া এবং গান শোনা। যৌবনের কামনায় যৌন-চেতনা বা উত্তেজনা বলে একটা জিনিস আছে। যার অর্থ এই যে, যৌন-কামনা ঘুমিয়ে থাকে বা তাকে সুপ্ত রাখা যায় এবং কখনো কখনো তা প্রশান্ত থাকে বা তাকে প্রশমিত রাখা সম্ভব। বলা বাহুল্য নোংরা ফিল্ম, পত্র-পত্রিকা এবং গান হল এমন জিনিস, যা সুপ্ত যৌন-কামনাকে জাগ্রত করে এবং প্রশান্ত যৌন-বাসনাকে উত্তেজিত করে। এ ছাড়া সলফগণ বলেন যে, 'গান হল ব্যভিচারের মন্ত্র।'

৭- বেশ্যাবৃত্তির স্বীকৃতি ও সমাজে তাদের পেশাদারীর অনুমতি। তাদেরকে 'যৌনকর্মী' বলে আখ্যায়িত করে তাদের বৃত্তিকে অর্থোপার্জনের এক পেশা বলে স্বীকার করে নেওয়া ব্যভিচার প্রসার লাভের অন্যতম কারণ।

৮- মদ ও মাদক-দ্রব্যের ব্যাপক ব্যবহার। মদ, হিরোইন প্রভৃতির নেশায় নারীর নেশা ও চাহিদা সৃষ্টি হয় মাতাল মনে। ফলে এর কারণেও ব্যভিচার ব্যাপক হয়।

৯- আর সবচেয়ে বড় ও প্রধান কারণ হল, দ্বীন ও ঈমানের দুর্বলতা, নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়। যার মাঝে ঈমান ও তাকওয়া নেই, সে ব্যভিচার থেকে বাঁচতে পারে না। এমন

ব্যক্তির মনের ডোর শয়তানের হাতে থাকে। অথবা নিজের খেয়াল-খুশী মত চালাতে থাকে নিজের জীবন ও যৌবনকে।

বলা বাহুল্য, যুবক যদি উল্লেখিত ব্যভিচারের কারণসমূহ থেকে দূরে থাকতে পারে, তাহলে অবশ্যই সে ব্যভিচার থেকে বাঁচতে পারবে। পক্ষান্তরে উপরোক্ত কারণসমূহের কোন একটির কাছাকাছি গেলেই ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ে পড়বে। আর মহান আল্লাহর ঘোষণা হল, "তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। কারণ তা হল অশ্লীল এবং নোংরা পথ।" *(সূরা ইসরা ৩২ আয়াত)*

ব্যভিচার ব্যাপক আকারে প্রসার লাভ করা এই কথার ইঙ্গিত যে, কিয়ামত অতি নিকটে আসছে। *(বুখারী ৮১, মুসলিম ২৬৭১ নং)* অতএব যত দিন যাবে, ব্যভিচার পৃথিবীময় তত আরো বৃদ্ধি পাবে। তবে ঈমানদাররা ঈমান নিয়ে অবশ্যই সর্বদা সে অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকবে।

ব্যভিচার বন্ধ করার লক্ষ্যে যৌথভাবে সামাজিক যে প্রচেষ্টার প্রয়োজন তা হল নিম্নরূপঃ-

১- পর্দাহীনতা দূর করে, সমাজে পবিত্র পর্দা-আইন চালু করা। আর এ দায়িত্ব হল প্রত্যেক মুসলিমের, নারী ও পুরুষ, যুবক ও বৃদ্ধ, রাজা ও প্রজা সকলের।

২- ব্যভিচারের 'হদ্দ' দন্ডবিধি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চালু করা। এমন শাস্তি প্রয়োগ করা, যাতে কোন লম্পট তার লাম্পট্যে সুযোগ ও সাহস না পায়।

৩- মহিলাকে কোন মাহরাম বা স্বামী ছাড়া একাকিনী বাড়ির বাইরে না ছাড়া।

৪- কোন বেগানা (দেওর, বুনাই, নন্দাই, বন্ধু প্রভৃতি) পুরুষের সাথে নারীকে নির্জনতা অবলম্বন করার সুযোগ না দেওয়া। সে বেগানা পুরুষ ফিরিশ্তাতুল্য হলেও তার সহিত মহিলাকে নির্জনবাস বা সফর করতে না দেওয়া।

৫- সৎ-চরিত্র গঠন করার সামাজিক ভূমিকা পালন করা; অশ্লীল ছবি, পত্র-পত্রিকা, গান-বাজনা, যাত্রা-থিয়েটার প্রভৃতি বন্ধ করা এবং রেডিও, টিভি ও পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি প্রচার-মাধ্যমে সচ্চরিত্র গঠনের উপর তাকীদ প্রচার করা।

৬- সর্বতোভাবে বিবাহের সকল উপায়-উপকরণ সহজ করা। সহজে বিবাহ হওয়ার পথে সকল বাধা-বিপত্তি দূর করা।

৭- স্কুল-কলেজে সহশিক্ষা বন্ধ করে বালক ও বালিকাদের জন্য পৃথক পৃথক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা। অবিবাহিত তরুণ-তরুণী ও কিশোর-কিশোরীকে যৌন-শিক্ষা না দেওয়া।

৮- নারীর জন্য পৃথক চাকুরী-ক্ষেত্র তৈরী করা।

৯- সকল প্রকার বেশ্যাবৃত্তি ও যৌন-ব্যবসা বন্ধ করা।

কিন্তু বন্ধু! তুমি যদি কোন অমুসলিম রাষ্ট্রে বাস কর, তাহলে নোংরামির স্রোতে গা না ভাসিয়ে নিজেকে ও নিজের পরিবার-পরিজনকে বাঁচানোর জন্য নিম্নের উপদেশমালা গ্রহণ করঃ-

১- তোমার পরিবার ও পরিবেশের মাঝে একটি স্বায়ত্ত-শাসনভুক্ত রাষ্ট্র গঠন কর এবং সেই রাষ্ট্রে যথা-সম্ভব ইসলামী আইন চালু কর।

২- অশ্লীলতার মোকাবিলা করার জন্য নিজের আত্মাকে ট্রেনিং দাও। আল্লাহ-ভীতি ও

'তাকওয়া' মনের মাঝে সঞ্চিত রাখ। শয়তান ও খেয়াল-খুশীর দাসত্ব করা থেকে বহু ক্রোশ দূরে থাক। 'নাফসে আম্মারাহ'কে সর্বদা দমন করে রাখ। মনে-প্রাণে আল্লাহর স্মরণ রাখ। মন প্রশান্ত থাকবে।

৩- পরিপূর্ণ মু'মিন হল সেই ব্যক্তি, যে তার চরিত্রে সবচেয়ে সুন্দর। অতএব তুমি তোমার চরিত্রকে সুন্দর ও পবিত্র কর।

৪- নোংরা পরিবেশে ধৈর্যশীলতা অবলম্বন কর। ধৈর্যের ফল বড় মিঠা হয়। অতএব ধৈর্যের সাথে অশ্লীলতার মোকাবিলা কর।

৫- মন্দ পরিণামকে ভয় কর। দুনিয়া ও আখেরাতের লাঞ্ছনা ও শাস্তির ভয় রাখ।

৬- অশ্লীলতা ও ব্যভিচার থেকে বাঁচতে পারলে তাতে যে সওয়াব ও মর্যাদা লাভ হয়, তার লোভ ও আশা রাখ। কিয়ামতে ছায়াহীন মাঠে আরশের ছায়া লাভ এবং বেহেশ্তে হুরীদের সহিত ইচ্ছাসুখের সম্ভোগের কথা মনে রাখ।

৭- মনে রেখো যে, তুমি যেমন চাও না, তোমার মা-বোন বা স্ত্রী ব্যভিচারিণী অথবা ধর্ষিতা হোক, তেমনি অন্য কেউই তা চায় না। অতএব সকলের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখ।

৮- লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি অংশ ও শাখা। মু'মিন হিসাবে তুমি সে মহৎ গুণকে তোমার হৃদয় থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিও না। লজ্জাশীলতা তোমার মনের প্রতি অশ্লীলতার সকল ছিদ্রপথ বন্ধ করুক।

৯- হিম্মত উঁচু রাখ। নিজের সচ্চরিত্রতা নিয়ে নিজেকে ধন্য মনে কর। আর মনে রেখো যে, সচ্চরিত্র এক অমূল্য ধন; যা আর কারো না থাকলে তোমার আছে।

১০- সেই সকল অশ্লীল বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা পড়া অবশ্যই ত্যাগ কর, যা পড়ে তোমার হৃদয়ে কামনার উদ্রেক হয়, যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হয় দেহ-মনে। আর সেই সকল বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা পড়, যাতে এ সব পাপ ও তার শাস্তির কথা আলোচিত হয়েছে, যাতে রয়েছে আল্লাহ-ভীতির কথা।

১১- ইসলাম ও তার শরীয়তকে তোমার জীবনের সকল ক্ষেত্রে জীবন-বিধান বলে জানো ও মানো। দেখবে, সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে ইসলামে।

১২- সম্ভব হলে সত্বর বিবাহ করে ফেল। কারণ, বিবাহই হল এ সমস্যার সবচেয়ে উত্তম সমাধান। বিবাহ হল অর্ধেক দ্বীন। বিবাহ হল শান্তির মলম। বিবাহিতকে আল্লাহ সাহায্য করে থাকেন। সুতরাং চাকুরী না হলেও, নিজের পায়ে না দাঁড়ালেও, পড়া শেষ না হলেও তুমি বিবাহ কর। তোমার জন্য আল্লাহর সাহায্য আছে। আর জেনে রেখো যে, ব্যভিচারে পড়ার ভয় থাকলে তোমার জন্য বিবাহ করা ফরয।

১৩- মনের খেয়াল-খুশী ও প্রবৃত্তির ডোর নিজের হাতে ধরে থেকো এবং শয়তানের হাতে ছেড়ে দিও না। তোমার মনকে পবিত্র রেখো। কারণ, "যে তার মনকে পবিত্র করবে, সে হবে সফলকাম এবং যে তা কলুষিত করবে, সেই হবে অসফল।" *(সূরা শাম্‌স ৯-১০ আয়াত)* অতএব 'দিল হ্যায় কে মানতা নেহী' বলে মনের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলো না।

১৪- মনকে নিয়ন্ত্রিত ও সংযত করার জন্য রোযা রাখ। এই রোযা তোমার যৌন-কামনাও দমন করবে।

১৫- ব্যভিচার থেকে বাঁচার জন্য চোখের ব্যভিচার থেকে দূরে থাক। আল্লাহর হারামকৃত বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করো না। হারামের সামনে নজর ঝুঁকিয়ে চল।

১৬- সকল প্রকার যৌন-চিন্তা মন থেকে তুলে ফেল। আর এর জন্য ইসলামী ক্যাসেট শোন, বই পড়। নেক বন্ধুর কাছে গিয়ে বস এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা আলোচনা কর। একা থাকলে কুরআন ও তার অর্থ পড়।

১৭- যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী সকল উপায় ও উপকরণ থেকে দূরে থাক। ভাবী ও চাচাতো-খালাতো-মামাতো-ফুফাতো বোনরা বেপর্দা হলে তাদেরকে নিজের বোনের মত দেখো। বন্ধুর বউ বেপর্দা হলে তার সাথে বন্ধুত্ব বর্জন করো। প্রয়োজন ছাড়া বেড়াবার উদ্দেশ্যে এমন স্থানে (হাটে-বাজারে) বেড়াতে যেও না, যেখানে নেংটা মহিলা নজরে আসে। টিভি-সিনেমা, নাটক-যাত্রা-থিয়েটার দেখা বন্ধ কর। ব্যভিচারের মন্ত্র গান শোনা বর্জন কর। স্কুল-কলেজে সহপাঠিনী থেকে দূরে থাক এবং ধৈর্যের সাথে দৃষ্টি সংযত রাখ।

১৮- সৎশীল বন্ধু গ্রহণ কর এবং এমন বন্ধুর সংসর্গ ত্যাগ কর, যে যৌন ও নারীর কথা আলোচনা করে মজা নেয় ও আসর জমায়।

১৯- নির্জনতা ত্যাগ কর। বেকারত্ব দূর কর। কোন একটা কাজ ধরে নাও এবং সে কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাক।

২০- যদি তুমি এমন দেশে থাক, যে দেশে ব্যভিচার কোন পাপ বা অপরাধ নয় অথবা এমন জায়গায় চাকুরী কর, যেখানে মহিলা সহকর্মীরা অযাচিতভাবে তোমার গায়ে পড়তে আসে, তাহলে সম্ভব হলে তুমি সে দেশ, পরিবেশ ও চাকুরী ত্যাগ করে বিকল্প ব্যবস্থা নাও। অর্থের জন্য নিজের চরিত্র ও ঈমান হারায়ো না। বাকী আল্লাহ তোমার সহায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কিছু ত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে বিনিময়ে তার চেয়ে উত্তম জিনিস দান করেন।

২১- তওবা ও ইস্তিগফার করতে থাক। নারীর ফিতনা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। আল্লাহ তোমাকে নোংরামি থেকে রক্ষা করবেন।

"অবশ্যই যাদের মনে আল্লাহর ভয় রয়েছে, তাদেরকে শয়তান কুমন্ত্রণা দেওয়ার সাথে সাথে তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনা-শক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে। (তারা হয় আত্মসচেতন মানুষ।) *(সূরা আ'রাফ ২০১ আয়াত)*

সমকাম

যৌবনের জ্বালা মিটাবার জন্য এক শ্রেণীর যুবক তারই মত একজন যুবক অথবা কিশোরকে ব্যবহার করে থাকে, যেমন যুবতী করে থাকে তারই মত কোন যুবতী অথবা কিশোরীকে ব্যবহার! এ কাজও বড় অশ্লীল এবং রুচিবিরুদ্ধ নোংরা। যৌবনের উন্মাদনায় অথবা নিছক খেয়াল-খুশী ও কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে নীচরা এমন নীচতা অবলম্বন করে থাকে। অথচ তা হল ব্যভিচারের মত একটি কাবীরা গোনাহ।

এই পাপের জন্য হযরত লূত (আঃ) এর সম্প্রদায়কে চার প্রকার আযাব ও শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল।

প্রথমতঃ তাদেরকে কানা করে দেওয়া হয়েছিল। *(সূরা ক্বামার ৩৭ আয়াত)*

দ্বিতীয়তঃ তাদের মাঝে ভীষণ এক শব্দ প্রেরণ করা হয়েছিল। *(সূরা হিজ্‌র ৭৩ আয়াত)*

তৃতীয়তঃ তাদের গ্রাম-শহরকে উল্টে দিয়ে ঊর্ধ্বভাগকে নিম্নে করে দেওয়া হয়েছিল।

চতুর্থতঃ তাদের উপর ক্রমাগত কাঁকর-পাথর বর্ষণ করে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। "যার প্রতিটি তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল। আর তা সীমালংঘন-কারীদের থেকে দূরেও নয়।" *(সূরা হূদ ৮২-৮৩ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা উক্ত নোংরা জাতিকে ফাসেক ও সীমালংঘনকারী বলে অভিহিত করেছেন। তিনি নবী লূত (আঃ) এর উক্তি উল্লেখ করে বলেন, "তোমরা সারা জাহানের মানুষের মধ্যে কেবল পুরুষদের সাথে যৌন-মিলন কর এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন- তা বর্জন কর? বরং তোমরা হলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।" *(সূরা শুআরা ১৬৫- ১৬৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, "লূতকে আমি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তাকে এমন এক জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম, যার অধিবাসীরা অশ্লীল কাজে লিপ্ত ছিল। ওরা ছিল মন্দ ও ফাসেক সম্প্রদায়।" *(সূরা আম্বিয়া ৭৪ আয়াত)*

আর মহানবী ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে ব্যক্তি লূত (আঃ) এর সম্প্রদায়ের মত সমকাম করে।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে ৫৮৯১ নং)*

তিনি আরো বলেন, "তোমরা যে ব্যক্তিকে লূত নবীর উম্মতের মত সমকামে লিপ্ত পাবে সে ব্যক্তি ও তার সহকর্মীকে হত্যা করে ফেলো।" *(আহমদ, আবূ দাউদ ৪৪৬২, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ২৫৬১, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে' ৬৫৮৯নং)*

তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ আয্যা অজাল্ল (কিয়ামতের দিন) সেই ব্যক্তির দিকে চেয়েও দেখবেন না, যে ব্যক্তি কোন পুরুষের মলদ্বারে অথবা কোন স্ত্রীর পায়খানা-দ্বারে সঙ্গম করে।" *(তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, নাসাঈ, সহীহুল জামে' ৭৮০১নং)*

পায়ু-মৈথুন বা সমকামগ্রস্ত যুবক এমন নিকৃষ্ট ও বিকৃত-চরিত্রের যে, সে হালাল যৌন-মিলনে তৃপ্তি পায় না, হারাম ছাড়া তার আশা মিটে না, নোংরামি না করে তার মনে শান্তি আসে না, স্বস্তি আসে না। এই জন্য এর অভ্যাসী বিয়ের পরেও স্ত্রীর পায়ুমৈথুন ছাড়া সাধারণ সহবাসে ততটা তৃপ্তি পায় না। অথচ স্ত্রীর পায়ুমৈথুন হল এক প্রকার কুফরী কাজ। বাস্তবপক্ষে এমন অতৃপ্তিবোধ হল তার জন্য এক প্রকার শাস্তি। এ ছাড়া এড্‌স প্রভৃতি যৌনরোগ তো আছেই।

সুতরাং জ্ঞানী যুবককে সতর্ক হওয়া উচিত, যাতে সে অনুরূপ কোন হতভাগ্যদের দলভুক্ত না হয়ে পড়ে।

পশুগমন

এক শ্রেণীর নীচমনা মানুষ আছে, যাদের পশুবৃত্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে উন্মাদনায় ফেটে পড়ে কাম-চরিতার্থ করার জন্য কোন এক প্রকার পশু ব্যবহার করে থাকে! পশুর মত মনে পশু নিয়েই যৌন-তৃপ্তি উপভোগ করে এমন পশু-মার্কা যুবকরা!!

মহানবী ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে ব্যক্তি পশুর সাথে যৌন-মিলন করে।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে ৫৮৯১ নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তিকে কোন পশু-সঙ্গমে লিপ্ত পাবে সে ব্যক্তি ও সে পশুকে তোমরা হত্যা করে ফেলবে।" *(তিরমিযী, হাকেম, সহীহুল জামে' ৬৫৮৮-নং)*

উল্লেখ্য যে, যৌন-ক্ষুধা উপশমের জন্য পুতুল বা অন্য কোন জড়-বস্তুর মাধ্যমে যৌন-মিলন ঘটিয়ে বীর্যপাত করাও অশ্লীলতার পর্যায়ভুক্ত। যে সকল অশ্লীলতা থেকে মুসলিম যুবককে পবিত্র থাকা একান্ত জরুরী।

হস্তমৈথুন

মিলনের স্বাদ উপভোগ করার জন্য কোন উপযুক্ত উপকরণ না পাওয়া গেলে অথবা তা ব্যবহার করার সুযোগ না থাকলে, দুধের সাধ ঘোলে মিটাবার উদ্দেশ্যে প্রায় অধিকাংশ যুবক নিজের হাতকেই কৃত্রিম বিবি বানিয়ে থাকে! আর এ কাজ যেহেতু নিজের দেহ ও দেহাঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেহেতু অনেকেই তা খারাপ বা অশ্লীল ভাবে না, বিধায় হালাল বা বৈধ মনে করে।

পক্ষান্তরে এ কাজও এক প্রকার নৈতিকতা ও রুচি-বিরুদ্ধ গুপ্ত অশ্লীল কাজ; যা ইসলামে অবৈধ। কোন মুসলিম নিজের বিবাহিতা স্ত্রী এবং অধিকারভুক্ত (ক্রীত বা কাফের যুদ্ধবন্দিনী) দাসী ছাড়া অন্য কারো বা কিছুর মাধ্যমে কাম-তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন, "বিশ্বাসীরা অবশ্যই সফলকাম হবে---- যারা নিজেদের যৌন-অঙ্গকে সংযত রাখে। তবে নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসিগণের ক্ষেত্রে অন্যথা কামনা করলে তারা নিন্দনীয় হবে না। আর কেউ এদের ব্যতীত অন্যকে কামনা করলে, তারাই হবে সীমালংঘনকারী।" *(সূরা মু'মিনূন ৫-৭, সূরা মাআরিজ ২৯-৩১ আয়াত)*

সুতরাং সকল প্রকার যৌনক্রিয়া স্ত্রীর মাঝে সীমাবদ্ধ। স্ত্রী না থাকলে তা হারাম ও অবৈধ। সে ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ পালন করা মুসলিম যুবকের জন্য অবধার্য। তিনি বলেন, "যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে।" *(সূরা নূর ৩৩ আয়াত)*

আর মহানবী ﷺ বিবাহে অসমর্থ যুবকদলকে রোযা রাখার মাধ্যমে সংযম অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। *(বুখারী, মুসলিম)* পরন্তু হস্তমৈথুন বৈধ হলে নিশ্চয় তার কোন ইঙ্গিত তিনি

দিয়ে যেতেন।

'হ্যান্ড-প্র্যাক্টিস্' বা হাত দ্বারা বীর্যপাত করা এক প্রকার নেশা ও কুঅভ্যাস, যা সত্বর ত্যাগ করে নিজের কাম-শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত না করতে পারলে ঐ ক্ষণিকের সুখের বদলায় অপেক্ষা করছে বিরাট লাঞ্ছনা ও স্বাস্থ্যহানির ধ্বংসকারিতা।

যৌবন যুবকের এক অমূল্য সম্পদ। এ সম্পদের অপচয় ঘটালে, অপচয়কারী অবশ্যই একদিন পস্তাবে। উঠ্‌তি যৌবনেই যৌন-স্বাদের অপূর্ব তৃপ্তির কথা আবিষ্কৃত হওয়ার সাথে সাথেই যদি তার অপব্যবহার করে, তবে নিশ্চয় সে তার জীবনে অকাল-বার্ধক্য ডেকে আনবে। হাতের কাছে পেয়ে কোন জিনিসই যাচ্ছেতাই করে খেয়ে শেষ করা জ্ঞানীর কাজ নয়। রয়ে-বসে ধৈর্যের সাথে যথাসময়ে খেলে, তবেই তার প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যায়।

সুতরাং যুবকের উচিত নয়, নিজের হাতে অমূল্য যৌবনকে ধ্বংস করা। এমনিতেই 'ধন-জন-যৌবন জোয়ারের পানি, আজ আছে কাল নেই, জানে সব জ্ঞানী।' তার উপর কৃত্রিম মৈথুনের মাধ্যমে বীর্যক্ষয় করে যৌবন ফুরিয়ে যাওয়ার বহু পূর্বেই তা হারিয়ে ফেলা নির্বোধদের কাজ। আজ এসব কথায় হয়তো কেউ কর্ণপাত না করলেও কাল অবশ্যই বুঝতে পারবে, যখন বিবাহের পর বাসর রাতেই ফুলশয্যায় সুসজ্জিতা সুরভিতা দিলরুবা স্ত্রীর পাশে মাথায় হাত রেখে বসে পস্তাতে হবে! যখন ধ্বজভঙ্গ হয়ে পুরুষাঙ্গ শিথিল থাকলে অথবা সঞ্চালন মাত্র দ্রুতপতন ঘটলে ঐ অতিরিক্ত যৌন-পাগলামির জন্য বারবার আক্ষেপ করবে। কিন্তু তখন কি আর আক্ষেপ কাজে দেবে? সময়ে 'সোনা চেন নাই, খুঁটে বাঁধ নাই।' তখন 'সোনা ফেলে আঁচলে গিঁড়ে দিয়ে লাভ কি?'

হাত দ্বারা কৃত কৃত্রিম মৈথুনের ফলে পুরুষাঙ্গের কোষবৃদ্ধি (হাইড্রোসিল) রোগ হয়। শুক্রক্ষরণ রোগেরও সূত্রপাত হয় এই অতিরিক্ত হস্ত-সঙ্গমের ফলে। এতে বীর্য পাতলা হয়ে যায়। ফলে স্ত্রী-সহবাসের সময় দ্রুত বীর্যস্খলন ঘটে যায়।

হস্তমৈথুনের ফলে কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ সৃষ্টি হয়। মেজাজ খিট্‌খিটে হয়ে যায়, অল্প কথায় রাগ ধরে বেশী, ধৈর্যশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, স্নায়বিক দুর্বলতা দেখা দেয়, দেহ-মন থেকে স্ফূর্তি চলে যায়, মন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়, শারীরিক দুর্বলতা প্রকাশ পায়, সুন্দর স্বাস্থ্য ধ্বংস হয়ে যায়, দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়, পিঠ কুঁজিয়ে যায়, পিঠে এক প্রকার ব্যথা অনুভূত হয়।

হস্তমৈথুনের ফলে স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়, পড়াশোনায় প্রচন্ড প্রভাব ফেলে এই গুপ্ত যৌনাচার।

হস্তমৈথুনের ফলে খাদ্য হজমে গোলযোগ দেখা দেয়। কর্তব্যে ত্রুটি প্রকাশ পায়, আল্লাহর ইবাদতে ঔদাস্য সৃষ্টি হয়, রোযা নষ্ট হয়ে যায়।

হস্তমৈথুনের ফলে মনের কাছে সব সময় নিজেকে একজন অপরাধী বলে অনুভূত হলে লোক-সমাজেও তার আচরণে সে ভাব ফুটে ওঠে। সর্বদা নির্জনে থাকতে ইচ্ছা হয়।

অনেক সময় এ কু-অভ্যাসের প্রভাব অভ্যাসীর চেহারায় পরিস্ফুট হয়।

বলা বাহুল্য, এমন কুপ্রবৃত্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করা এবং অতিশয় কামাসক্ত হয়ে পড়া মানুষের -বিশেষ করে কোন মুসলিমের- উচিত নয়। যথাসম্ভব এমন উত্তেজনা ও কু-অভ্যাসকে দমন করা অবশ্যকর্তব্য। মন্দ-প্রবণ মন ও শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং তাতে জয়লাভ করা মু'মিনের কর্তব্য।

দুর্বল মনের বন্ধু আমার! এমন কু-অভ্যাসের ফাঁদ থেকে রক্ষা পেতে নিম্নোক্ত উপদেশমালার অনুসরণ করঃ-

১- হস্তমৈথুনে অভ্যাসী যুবক ঈমান ও দ্বীনদারী তথা আল্লাহ-ভীতির ব্যাপারে বড় দুর্বল হয়। তাই তো সে মনের খাহেশ ও চাহিদার কাছে পরাজয় স্বীকার করে। অথচ তার উচিত, ঈমান সবল ও তাজা করা, আল্লাহর ভয় মনে-প্রাণে সর্বদা জীবিত রাখা। এমন হলে নিশ্চয় সে কু-অভ্যাসের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারে।

২- এ কাজ তুমি যদি অভ্যাসগতভাবে করে থাক, তাহলে এমনও হতে পারে যে, বিবাহের পর স্ত্রী-মিলনে কোন তৃপ্তি পাবে না। বরং তার চাইতে ঐ কুকাজে তৃপ্তি পাবে অধিক। তখন দুইভাবে বীর্যক্ষয় হবে এবং যার ফলে তুমি নিজের জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে। যখন সামান্য যৌন-চিন্তায় অভ্যাসগতভাবে যখন-তখন বীর্য নষ্ট করবে এবং ক্ষণিকের তৃপ্তি লাভের আশায় নিজের হাতে নিজের যৌবন-মধুকে গেলে সত্বর নষ্ট করে ফেলবে। সুতরাং কু-অভ্যাসের আঁধার কারাগার থেকে মুক্তি পেতে তোমার দরকার হল দৃঢ়-সংকল্পের। সুদৃঢ় মনোবল এবং যথোচিত ধৈর্য ছাড়া এমন দলদল থেকে বের হওয়ার কোন অন্য উপায় নেই। অতএব মনকে শক্ত কর এবং কাম অনুভূতির সময় ধৈর্য ধর।

৩- এমন গুপ্ত অভ্যাসের একটি কারণ হল চোখের দর্শন-তৃপ্তি উপভোগ। যে জিনিস দেখলে যৌন-উত্তেজনা আসে বা বাড়ে, সে জিনিস দেখার ফলে লৈঙ্গিক ভোগের নেশা মাথায় চড়ে বসে। অতএব তুমি কোন বেপর্দা নারীর দিকে সকাম দৃক্‌পাত করো না। অর্ধনগ্না নারীর প্রতি দৃষ্টি তুলো না। সিনেমা, ভিডিও বা টিভিতেও ফিল্‌ম্‌ দেখা অবশ্যই বন্ধ কর। নোংরা পত্র-পত্রিকায় নগ্ন ও অর্ধনগ্ন রূপসীদের, হিরোইন ও মডেল কন্যাদের ছবি দেখা ত্যাগ কর। নচেৎ কুঁয়োতে বিড়াল রেখে বালতি-বালতি পানি তুলে ফেললেও পানি পাক হবে না। আর তুমিও তোমার ঐ কু-অভ্যাস ছাড়তে পারবে না।

৪- এমন স্থানে বেড়াতে বা অপ্রয়োজনে যেও না, যেখানে অধিকাধিক মহিলা নজরে পড়ে। অতএব মেলা-খেলা, সৌখিন বাজার, পার্ক ও সমুদ্র-সৈকতে বেড়াতে যাবে না। নচেৎ এ অভ্যাস তোমার জন্য ছাড়া দায় হবে।

৫- নারী অথবা যৌবন নিয়ে সর্বপ্রকার কুচিন্তাকে তোমার মন থেকে সমূলে তুলে ফেল।

৬- আর এর পরিবর্তে তুমি তোমার সুচিন্তাকে যত্নের সাথে মনে স্থান দাও। মন এমন এক চলন্ত আটা-চাকির মত যে, তা সব সময় ঘুরে কিছু না কিছু পিষতেই থাকে। যে চাকিতে গম দিলে গম পিষে এবং ইঁট-পাথর দিলে, তাও পিষে। ভালো-মন্দ যাই হোক, মনের চাকিতে কোন না কোন রকমের চিন্তা পিষাই হতেই থাকে। আর এ চাকির কোন বিরতি নেই। অতএব মনকে চিন্তাশূন্য করা অসম্ভব। তাই তাকে পিষার জন্য সুচিন্তা দিতে হবে। আর শয়তান কুচিন্তার ইঁট-পাথর পিষার জন্য নিয়ে এলেও তোমাকে সজাগ থেকে তোমার আটা-চাকি থেকে তাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করতে হবে। অতঃপর কোন ভালো জিনিস নিয়ে গবেষণা করতে হবে।

৭- মনকে ব্যস্ত রাখার জন্য কোন এক ব্যস্ততাময় কাজ বেছে নাও। কিছু একটা কর। একটা বই পড়। অর্থসহ কুরআন পড়। কুরআন অথবা ইসলামী বক্তৃতার ক্যাসেট শোন। কোন

একটা বৈধ খেলা খেল। পরের উপকার কর। ইত্যাদি।

৮- গান শোনা অবশ্যই ত্যাগ কর। গান হল ব্যভিচারের মন্ত্র। অতএব তা তোমাকে ঐ কাজে আরো উদ্বুদ্ধ করবে। মনকে 'ফ্রি' করতে গিয়ে আরো 'জ্যাম' হয়ে যাবে।

৯- নোংরা পত্র-পত্রিকা, প্রেম-কাহিনীমূলক উপন্যাস, রতিশাস্ত্র খবরদার পড়ো না। ঐ সকল পত্রিকা বা বই-পুস্তকে কিছু ভাষাজ্ঞান বা অন্যান্য সাধারণ জ্ঞান থাকলেও তা হল জুয়া ও মদের মত। যার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, "বল, উভয়ের মাঝে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও আছে। কিন্তু উভয়ের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।" *(সূরা বাক্বারাহ ২১৯)*

পক্ষান্তরে উল্লেখিত জ্ঞান অর্জন করার জন্য উপযুক্ত পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তক ভূরিভূরি বিদ্যমান। তা বেছে নিয়ে পড়।

১০- একাকী থেকো না। বিশেষ করে পূর্বে কোন যৌন-উত্তেজক কিছু নজরে পড়ে থাকলে নির্জনে বসো না। কারণ, শয়তান তোমাকে সেই দেখা জিনিস বারবার মনে করিয়ে দিবে। সুতরাং নেক বন্ধু বা দ্বীনী ভাই-এর নিকটে গিয়ে বসে একাকীত্ব দূর কর এবং সম্ভব হলে রাত্রেও তারই নিকট কবর, পরকাল, মুসলিমদের বর্তমান দুরবস্থা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করতে করতে ঘুমিয়ে যাও।

১১- হ্যাঁ, তবে একাকীত্ব দূর করতে কোন খারাপ বন্ধুর কাছে বসো না বা রাত্রি যাপন করো না। নচেৎ সে বন্ধু তোমার ব্রণ গেলে বিষ-ফোঁড়াতে পরিণত করে দেবে।

১২- সম্ভব হলে সত্বর বিবাহ করে মনের মত সঙ্গিনী নিয়ে এসে জীবন ও যৌবন ঠান্ডা করে ফেল। তখন হালাল উপায়ে যৌনসুখ প্রাণ ভরে লুটতে কোন বাধা থাকবে না।

১৩- বিবাহ করার সামর্থ্য না থাকলে অথবা বিবাহে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকলে পূর্ণ সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত তোমার যৌবনের গুপ্ত জ্বালাকে প্রশমিত করার জন্য আল্লাহর ওয়াস্তে রোযা পালন কর।

১৪- যে খাদ্য গ্রহণ করলে শরীরে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় বা শরীরকে গরম করে, সে খাদ্য বর্জন করে বেছে বেছে ঠান্ডা খাদ্য গ্রহণ কর।

১৫- প্রত্যহ স্বাভাবিক ঠান্ডা পানিতে গোসল কর। শরীরকে ঠান্ডা রাখতে চেষ্টা কর। হ্যাঁ, আর কোন বধু-সরোবরে গোসল করতে যেও না।

১৬- রাত্রে শোবার সময় ওযু করে শোও। ডান কাতে শুয়ে বিভিন্ন দুআ পাঠ কর। যতক্ষণ না ঘুম এসেছে ততক্ষণ কুরআন মুখস্থ পড়তে থাক। স্কুল-কলেজে বা মাদ্রাসায় পড়লে মনে মনে পাঠ্যালোচনা কর। আর কোন সময় উবুড় হয়ে শুয়ো না। এতে যৌন-উত্তেজনা বাড়ে। তাছাড়া "এমন ঢঙের শয়নকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।" *(আহমাদ ২/২৮৭, হাকেম ৪/২৭১, সহীহুল জামে' ২২৭০ নং)*

১৭- এ কুকাজ ও পাপ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ কর।

যুবক বন্ধু! এ কাজ এমন যে, তা একবার করে তৃপ্তি পায় না কামুকরা। উত্তেজনা কমলেও তা সাময়িকভাবে কমে। পরক্ষণেই অভ্যাসের নেশা আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সুতরাং ব্যভিচার বা সমকামের ভয় থাকলে এ কাজ করা বৈধ বলে যে ফতোয়া পড়ে বা শুনে থাক, তা গ্রহণ করে ধোকা খেও না। নচেৎ অভ্যাস ধরে গেলে অপ্রয়োজনে করেও দ্বীন ও দুনিয়া

বরবাদ করে বসবে।

হ্যাঁ, আর এই সর্বনাশী অভ্যাস থেকে বাঁচার জন্য খবরদার নযর অথবা কসম ব্যবহার করো না। কারণ, তা কিছু দিনের জন্য ফলদায়ক হলেও, হয়তো এমন সময় আসবে যখন কাম-উত্তেজনায় ফেটে পড়ে নযর ও কসমের কথা ভুলে বসবে অথবা হাল্কা মনে করবে। আর তাতে ক্ষতি হবে দ্বিগুণ। নযর বা কসম ভাঙ্গা যাবে এবং কাফ্‌ফারা তো লাগবেই। পক্ষান্তরে সবল মনের ভিতর দৃঢ় সংকল্প থাকলে, সেটাই হল সবচাইতে বড় ওষুধ।

এ ছাড়া কাম-উত্তেজনা রোধ বা হ্রাস করার জন্য কোন ড্রাগ (ভেষজ পদার্থ) ব্যবহার করো না। কেন না, এতে হিতে বিপরীত হয়ে যৌন-ক্ষমতাই চিরদিনের জন্য ক্ষীণ হয়ে যেতেও পারে। অতএব ধৈর্যের হাতুড়ি দিয়ে 'কাম'-এর মাথায় ঘা মেরে তা দমিত রাখ। এ ছাড়া বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত আর অন্য কোন উপায় নেই।

স্বপ্নদোষ

স্খলনের দিক থেকে মানুষের দেহে বীর্য হল পেশাবের মত; যা প্রয়োজন মত তৈরী হয় এবং সময় মত বের হয়ে যায়। বীর্য মানবদেহে একটি অমূল্য বস্তু। কিন্তু তা দেহের ভিতরেই থেকে গেলে ক্ষতিকর। তাই কুদরতের নিয়ম হল, অবিবাহিত যুবকেরও বীর্য স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগতভাবে দেহ থেকে যথা সময়ে নির্গত হয়ে যায়। বিশেষ করে স্বপ্নের মাধ্যমে যৌন-উত্তেজনামূলক কিছু দেখলে বা করলে বীর্যপাত হয়। আর তাকেই বলে স্বপ্নদোষ। যদিও তা দূষনীয় নয়, যদি তা বেশী আকারে না হয়। দোষের হয় তখনি, যখন মাসে ৪ থেকে ৫ বারের অধিক হতে থাকে। আর তখনই প্রয়োজন হয় চিকিৎসা ও আনুষঙ্গিক প্রতিব্যবস্থার।

অতএব স্বাভাবিকভাবে স্বপ্নদোষ হওয়াতে যুবকের ঘাবড়াবার কিছু নেই। এতে কোন ক্ষতি আছে, এমন ধারণা করে চিন্তিত হওয়ারও কোন কারণ নেই। বীর্য বেশী হলে তা তরল হয়ে স্খলন হবে এটাই প্রকৃতির নিয়ম। অতএব স্বপ্নদোষে বীর্যক্ষয় হয়ে সে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, এমন দুশ্চিন্তা মনে এনে নিজেকে দুর্বল করা ঠিক নয়। অবশ্য অতিরিক্ত মাত্রায় হলে চিন্তার কারণ বটে।

তোমার স্বপ্নদোষ যদি বেশী হয়ে থাকে, তাহলে নিম্নলিখিত উপদেশমালা গ্রহণ কর; ইনশাআল্লাহ তা কম হয়ে যাবেঃ-

১- যৌন-উত্তেজনামূলক কিছু দেখা, শোনা ও পড়া থেকে দূরে থাক।

২- মন থেকে সকল যৌন ও বিবাহ-চিন্তা দূর করে দাও। আর তার জন্য ব্যস্ততাময় কাজ খুঁজে নাও, দ্বীন ও আখেরাতমূলক বক্তৃতা শুনে, আলোচনা করে অথবা পড়ে অবসর সময়কে কাজে লাগাও।

৩- নির্জন বা একাকী বাস ও কুসংসর্গ ত্যাগ কর। পরহেজগার বন্ধুর সাথে সময় কাটাও।

৪- গুরুপাক ও উত্তেজক খাদ্য গ্রহণ করো না। বিশেষ করে রাত্রে এমন খাদ্য অবশ্যই খাবে না।

৫- নিয়মিত ঠান্ডা পানিতে গোসল কর।

মনে রাখবে যে, সিনেমা, ভিডিও, টিভি বা নোংরা পত্র-পত্রিকায় নারীর অর্ধনগ্ন দেহের ছবি অথবা মেলা-খেলা ও হাটে-বাজারে বেপর্দা মহিলা দেখে তা মানসপট থেকে দূর করতে না পারলে তুমি রাত্রে স্বপ্নদোষ থেকে বাঁচতে পারবে না। কারণ, বুঝতেই তো পারছ, উঠতি বয়সের তরঙ্গায়িত এমন যৌবন-জ্বালাকে দমন করতে প্রয়োজন হল পরহেযগারীর। আল্লাহ-ভীতির শীতল পানি দিয়ে সে আগুন যদি না নিভাতে পার, তাহলে স্বাস্থ্যহানি অবধার্য।

হ্যাঁ, আর স্বপ্নদোষের জ্বালাতন থেকে বাঁচতে গিয়ে কোন প্রকার শির্কে পতিত হয়ো না। যেমন, কোন প্রকার তাবীয বা অষ্টধাতুর মাদুলী ইত্যাদি হাতে বা কোমরে বেঁধে স্বপ্নদোষ বন্ধ করার বেকার অপচেষ্টা করো না। এতে লাভ তো হবে না। উল্টে ডবল ক্ষতি; পয়সাও যাবে এবং শির্কও হবে।

তবে শয়নের বিভিন্ন শরয়ী আদব পালন করে স্বপ্নদোষ বন্ধ করতে পার। অতএব শোবার সময় আগে ওযু করে নেবে। অতঃপর ডান কাতে শুবে। উবুড় হয়ে শুবে না। ঘুমাবার পূর্বে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে। সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়ে দুই হাতে ফুঁক দিয়ে সমস্ত শরীরে বুলিয়ে নেবে এবং এরূপ ৩ বার করবে। যতক্ষণ না ঘুম এসেছে ততক্ষণ দুআ, কুরআন অথবা মুখস্থ পাঠ পড়তে থাকবে। আর ভুলেও এ সময়ে যৌন বা বিবাহের চিন্তা মনেও আনবে না।

খারাপ স্বপ্ন দেখে জেগে উঠলে বাম দিকে তিনবার থুথু মার, শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে শোও।

আর তোমার জানা আছে যে, বীর্যপাত হলে গোসল ফরয। অবশ্য খারাপ স্বপ্ন দেখলে এবং জেগে উঠে কাপড় ভিজে না দেখলে গোসল ফরয নয়। তবে কাপড় ভিজে দেখলে এবং স্বপ্ন মনে না থাকলেও গোসল ফরয। রাত্রে হলে ফজরের আগেই গোসল সেরে জামাআতে ফজরের নামায পড়বে। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহর ফরয আদায়ে লজ্জা করা হারাম।

উত্তেজনার পর পুরুষাঙ্গে পাতলা আঠালো পানি দেখা দিলে তা ধুয়ে কেবল ওযু যথেষ্ট। তাতে গোসল ফরয হয় না। আর সব সময়ের জন্য ধাতু ঝরার রোগ থাকলে প্রত্যেক নামাযের জন্য (কাপড় বদলে) ওযু জরুরী।

যুবক বন্ধু! যৌবনের যৌন-জ্বালার অন্ধকারে বিভ্রান্ত না হয়ে ধৈর্য ধর। অতঃপর যথাসময়ে একটি মনের মত সঙ্গিনী খুঁজে বিবাহ করে নাও। যত তাড়াতাড়ি বিবাহ করবে, তত তাড়াতাড়ি তোমার মন ও জীবন আলোকিত হবে। তারপর নিয়মিত যৌন-মিলন কর, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে। মনের সকল দুশ্চিন্তা দূরীভূত হবে। এমন নৈতিকতাপূর্ণ জীবনে তুমি অবশ্যই বেহেশ্তের ছায়া পাবে।

যুবক ও বিবাহ-সমস্যা

যুব-সমাজের চরিত্রহীনতা ও ভ্রষ্টতার অন্যতম কারণ হল বিবাহ-সমস্যা। বিবাহের বয়স হওয়া সত্ত্বেও বিবাহ না হলে, চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বিবাহ না করলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেতে বাধ্য। প্রত্যেক জিনিসের নির্দিষ্ট সীমা আছে; ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে। সে সীমা অতিক্রান্ত হলে বিপদ অনিবার্য। পক্ষান্তরে বিবাহে আছে জীবনের পবিত্রতা ও সচ্চরিত্রতা। বিবাহে আছে চরিত্রহীনতার বিভ্রান্তি-জাল থেকে মুক্তির উপায়। আর এ জন্যই সমাজ-বিজ্ঞানী নবী ﷺ যুব-সমাজকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, "হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যার সঙ্গম ও ভরণপোষণ করার ক্ষমতা রয়েছে, সে যেন বিবাহ করে নেয়। কারণ, বিবাহ অধিকরূপে দৃষ্টিকে (হারাম থেকে) সংযত করে এবং লজ্জাস্থানকে অধিকরূপে (হারাম থেকে) রক্ষা করে। আর যার এ সামর্থ্য নেই, সে যেন রোযা পালন করে। কারণ, তা হল যৌন উত্তেজনা দমনকারী। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩০৮০ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "বান্দা যখন বিবাহ করে তখন সে তার অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করে নেয়। অতএব তাকে তার অবশিষ্ট অর্ধেক দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা উচিত।" *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে' ৪৩০ নং)*

বলা বাহুল্য, যুবক যথাসময়ে বিবাহ করলে তার দ্বারা অপকর্ম ঘটার আশঙ্কা থাকে না। হালাল পেয়ে হারামের পথে পা বাড়ায় না। জীবন-সঙ্গিনী পেয়ে তার চক্ষু শীতল হয়। ফলে অবৈধ সৌন্দর্যের প্রতি আর দৃক্‌পাত করে না। আল্লাহ তার ঐ দাম্পত্যে তাকে স্থিরচিত্ত করে দেন।

বিবাহে রয়েছে জ্বালাময়তার স্থলে মানসিক শান্তি এবং চিত্ত-চাঞ্চল্যের স্থলে হৃদয়ের স্থিরতা। সৃষ্টিকর্তা নারীকে পুরুষের জন্য শান্তিদায়িনীরূপে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন, "তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা ওদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মাঝে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও স্নেহ সৃষ্টি করেছেন।" *(সূরা রূম ২১ আয়াত)*

অতএব আল্লাহর চিরন্তন এ বিধানের কাছে কোন সমস্যাকে সমস্যা মনে করা উচিত নয়।

প্রথম যৌবনে বিবাহ করলে অধ্যয়ন ও বিদ্যার্জনের পথে বাধা পড়ে -এ কথা যুক্তিযুক্ত নয়। বরং এর বিপরীতটাই সঠিক। যেহেতু বিবাহের পর যৌনক্ষুধা নিবৃত্ত হলে, চক্ষুদ্বয় শীতল হলে, মানসিক শান্তি ও প্রবোধ লাভ হলে তো তাতে শিক্ষার্থী শিক্ষায় অধিক সহায়তা পাবে। কারণ, মস্তিষ্ক যখন প্রশান্ত থাকবে, কুচিন্তা থেকে মন যখন পরিষ্কার থাকবে, তখন তো অতি সহজভাবে পাঠ উপলব্ধ হবে, কঠিন পড়া অনায়াসে বুঝে আসবে এবং অধ্যয়নে অধিক অভিনিবেশ করা সম্ভবপর হবে। বৈষয়িক কোন কাজকর্মে মনে ব্যাকুলতা সৃষ্টি হলে স্ত্রী তা দূরীকরণে সহায়িকা হবে, শোকে-দুঃখে সান্ত্বনা দান করবে এবং অধিক উত্তমরূপে অধ্যয়নরত হওয়ার ব্যাপারে স্বামীকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করবে।

'পুরুষে এনেছে দিবসের জ্বালা তপ্ত রৌদ্রদাহ,
কামিনী এনেছে যামিনী-শান্তি, সমীরণ, বারিবাহ।
দিবসে দিয়াছে শক্তি-সাহস, নিশীথে হয়েছে বধূ,
পুরুষ এসেছে মরুতৃষা লয়ে -নারী যোগায়েছে মধু।'

তবে দুর্ভাগ্যক্রমে যদি স্ত্রী তেমন না হয়, অথবা স্বামীর মনে যদি অঞ্চল-প্রভাব পড়ে, অথবা উভয়ের মধ্যে কেউ যদি ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয়, তবে নিশ্চয় সে আশা করা যায় না। এমন যুবক সত্যই যে দুর্বল, তাতে সন্দেহ নেই। আর আল্লাহর নিকট দুর্বল অপেক্ষা সবল মু'মিনই অধিকতর পছন্দনীয়। যুবকের মনে স্বামীত্ব ও কর্তব্য-জ্ঞান না জন্মালে পদস্খলনের আশঙ্কাই বেশী থাকে। স্ত্রী ও সংসারের ভারসাম্য রক্ষা করে পড়াশোনা করা কোন কর্তব্যপরায়ণ ও উন্নয়নাভিলাষী যুবকের নিকট কঠিন নয়।

চরিত্রহীন দেশে চরিত্রহীনরা ইচ্ছামত অবৈধ প্রেম করে তারই জোয়ার-ভাটার মাঝে দোটানায় পড়েও পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে। অথচ তুমি বৈধভাবে একজন পবিত্রা নারীকে ভালোবেসে তার নির্মল প্রেম-নির্ঝরে নিমজ্জিত থেকে তা পারবে না কেন? অবশ্য সংসারের দায়িত্ব ও বোঝা এসে যাওয়ার যদি ভয় কর, তাহলে ভেবে দেখ, পাপের ভয় তদপেক্ষা অধিক কি না?

'চাকরী না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে করব না, বাড়ি না করে বিয়ে করব না, নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে বিয়ে করব না, বিয়ে করলে খাওয়াব কি?' ইত্যাদি ওজরও খোঁড়া ওজর। ভেবে দেখ, তুমি কি খাও? তাছাড়া তুমি যে পজিশনের ঠিক সেই পজিশনের মেয়ে বিয়ে কর। পরন্তু রুযীর ভার আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও। তদবীর করে যাওয়া তোমার কাজ, রুযী দান করা তাঁর কাজ। আর বিশেষ করে বিবাহ মঙ্গল বয়ে আনে। কারণ, তা হল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য। এ আনুগত্যে আছে তোমার বহু সমস্যার সমাধানের পথ।

মহান আল্লাহ বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত (নরনারী), তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ -তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" *(সূরা নূর ৩২ আয়াত)*

আর মহানবী ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব; আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী মুজাহিদ, সেই ক্রীতদাস যে নিজেকে স্বাধীন করার জন্য তার প্রভুকে কিস্তিতে নির্দিষ্ট অর্থ দেওয়ার চুক্তি লিখে সেই অর্থ আদায় করার ইচ্ছা করে এবং সেই বিবাহকারী যে বিবাহের মাধ্যমে (অবৈধ যৌনাচার হতে) নিজের চরিত্রের পবিত্রতা কামনা করে।" *(আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, বাইহাক্বী, হাকেম, সহীহুল জামে ৩০৫০ নং)*

বিবাহের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল পিতামাতার অসম্মতি। যুবকের বিবাহ-সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উপর ভরসা আছে, রুযীর যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে এবং তার সঙ্গিনীর একান্ত প্রয়োজন আছে, তা সত্ত্বেও কোন স্বার্থবশে অভিভাবক বিবাহ দিতে রাজী নয়। অথবা মন মত পণ না পাওয়ার ফলে বিবাহে দেরী করে। অথবা ছেলের বিয়ে দিলে সংসারের কাজ ঠিক মত দেখবে না অথবা সংসার থেকে পৃথক হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে চায় না। এ সব

ক্ষেত্রে অভিভাবকের উচিত, আল্লাহকে ভয় করা এবং ছেলের নৈতিকতা ও সৎ পথে প্রতিবন্ধক তথা তার পাপকাজের কারণ না হয়ে বসা। আর জেনে রাখা উচিত যে, তাদের এ বাধার ফলে ছেলে যদি পাপ করে বসে, তাহলে ঐ পাপের জন্য তারাও পাপী হবে এবং আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তাছাড়া বিবাহ-কার্যে এইভাবে বাধ সাধলে সমাজ, পরিবেশ ও পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। ফাসাদ ও চরিত্রহীনতা ছড়িয়ে পড়বে।

সমাজ-বিজ্ঞানী নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তির দ্বীন ও চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট, সে ব্যক্তি তোমাদের কাছে বিবাহের পয়গাম দিলে, তার বিবাহ দাও। এমন না করলে পৃথিবীর বুকে ফিতনা ও ব্যাপক ফাসাদ ছড়িয়ে পড়বে।" *(তিরমিযী, মিশকাত ৩০৯০ নং)*

কিন্তু যুবকের সকল সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এবং পছন্দ মত দ্বীনদার পাত্রী পাওয়া সত্ত্বেও যদি অভিভাবক বিবাহে খামাখা বাধা দেয় এবং সে বিবাহ না করলে ব্যভিচার বা অন্য পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ার সত্যই আশঙ্কা করে, তাহলে সে ক্ষেত্রে অভিভাবকের মনমত চলা বৈধ নয়। এমন সংকট মুহূর্তে আল্লাহর উপর ভরসা করে বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে বিবাহ করে ফেলা একান্ত জরুরী।

পরন্তু তোমার মন যদি খোদ লোভাতুর হয় এবং মোহর দিয়ে বিয়ে করার বদলে মোটা টাকা নিয়ে বিয়ে করার পরিকল্পনা থাকে, অথবা কোন এমন ঘরের খোঁজে থাক, যেখানে ফারাযী অংশ বেশী পাবে বলে নিশ্চয়তা আছে, আর এর কারণে বিয়ে করতে দেরীও কর, আবার পাপ থেকেও বাঁচতে পার না, তাহলে জেনে রেখো যে, এ ডবল পাপের সাজা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। আখেরাতে তো আছেই, পরন্তু দুনিয়াতেও তুমি তার কিছু প্রত্যক্ষ করতে পার।

অর্থলালসার এ পাপ হল কুরআন-বিরোধী মহাপাপ। এমন পণ বা যৌতুক নেওয়ার মত পাপ ও যুলুম অন্ততঃ একজন ন্যায়পরায়ণ মুসলিম যুবক করতে পারে না। ইসলাম যে মর্যাদা একজন নারীকে দিয়েছে, সে মর্যাদা যৌতুক দাবী করে, বধুনির্যাতন, বিবাহ-বিচ্ছেদ, এমন কি পিটিয়ে খুন পর্যন্ত করে কোন মুসলিম ক্ষুন্ন করতে পারে না।

সমাজে প্রচলিত আরো একটি বিবাহ-সমস্যা হল, বড় থাকতে ছোটর বিয়ে, অথবা বোন থাকতে ভায়ের বিয়ে। বড়র বিয়ে করতে যদি কোন অসুবিধা বা বাধা থাকে, অথবা বোনের বিবাহ-প্রস্তাব আসতে যদি দেরী হয়, অথবা তার জন্য উপযুক্ত ঘর-বর না পাওয়া যায়, তাহলে যার বিবাহের প্রয়োজন আছে এবং উপযুক্ত পাত্রীও আছে, তার বিবাহে অভিভাবক বা অন্য কারো বাধা দেওয়ার অধিকার নেই।

বোনের যদি পাঁচ বছর বিবাহ ঠিক না হয়ে ওঠে, তা বলে কি তার থেকে বয়সে বড় ভাইকে তারই জন্য অপেক্ষা করতে হবে? তাছাড়া এ আশঙ্কাও উচিত নয় যে, ছেলের বিয়ে দিয়ে দিলে ছেলে হয়তো পৃথক হয়ে যাবে, অথবা তার মতিগতি ভিন্ন হয়ে যাবে এবং তখন সে আর মেয়ের বিয়েতে সহায়তা করবে না। কিন্তু মেয়ে যদি বয়সে আরো ছোট হয়, তাহলে কি এ আশঙ্কা থাকে না? আর তা যদি সঙ্গত হয় তাহলে পাঁচ বছরের মেয়েটি বড় হয়ে বিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত কোন অভিভাবকের ২০/২৫ বছর বয়সী ছেলের বিয়ে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু কৈ, তা তো কেউ করে না। তা করলে তো, মেয়ের বিয়ের সময় হতে হতে ছেলে বুড়িয়ে যাবে!

অতএব এমন ওজর একটি খোঁড়া ওজর। এ ওজুহাতে উপযুক্ত ছেলের বিয়ে পিছিয়ে দিয়ে তাকে পাপের পথে ঠেলে দেওয়া অভিভাবকের জন্য আদৌ উচিত ও বৈধ নয়।

যুবক বন্ধু আমার! বয়স হলে বিবাহ কর এবং স্ত্রীর সাথে প্রেম কর। তাকে দাও ভালোবাসার ডালি খালি করে প্রণয়ের রাশিরাশি ফুল। তাকেই লিখ ভাবের আবেগে লিখা প্রেমপত্র। বিবাহের প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে উভয়ে চিরসুখী হও।

আর হ্যাঁ, 'বউ-পাগলা' বা 'আঁচল-ধরা' স্ত্রৈণ হয়ে পড়ো না। নচেৎ বহু কল্যাণ থেকে তুমি চিরবঞ্চিত রয়ে যাবে।

যুবক ও মনের আঁধার

মৃত অন্তরে দ্বীনের পরিপন্থী কোন প্রকারের কুমন্ত্রণা ও কুচিন্তা আসে না। যেহেতু সে হৃদয় তো মৃত ও ধ্বংসগ্রস্ত, শয়তান এর চেয়ে বেশী আর কিছু চায় না। এই জন্যই ইবনে মসঊদ অথবা ইবনে আব্বাস ﷺ কে যখন বলা হল যে, 'ইয়াহুদীরা বলে, তারা তাদের নামাযে কোন কুমন্ত্রণা অনুভব করে না। অর্থাৎ, নামাযে তাদের মনোযোগ নষ্ট হয় না।' তখন তিনি বললেন, 'ঠিকই তো বলেছে। শয়তান পতিত হৃদয়ে (কুমন্ত্রণা দিয়ে) কি করবে?'

সত্যই তো যে বাঘ মরেই আছে, তাকে মারার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করা অবশ্যই প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে হৃদয় যদি জীবিত হয় এবং তাতে সামান্য পরিমাণও ঈমান থাকে, তাহলে শয়তান তার প্রতি এমন অভিযান ও আক্রমণ শুরু করে যে, অবিরাম ও অবিচলভাবে তা চলতেই থাকে। দ্বীন-বিরোধী নানা কুচিন্তা ও কুমন্ত্রণা তার মনে প্রক্ষিপ্ত করতে থাকে। বান্দা যদি তার নিকট পরাজয় স্বীকার করে, তাহলে বিরাট সর্বনাশে আপতিত হয়। এমন কি শয়তান তার দ্বীন, আকীদাহ ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বিষয়েও নানা সংশয় ও সন্দেহ তার মনে সৃষ্টি করে। এতে যদি সে তার হৃদয়ে দুর্বলতা ও পরাভব লক্ষ্য করে, তাহলে তাকে বশীভূত করে ফেলে এবং অবশেষে দ্বীন থেকে খারিজ করে ফেলে। কিন্তু যদি সে তার হৃদয়ে সবলতা ও বিজয়-ভাব লক্ষ্য করে, তাহলে পরাস্ত, লাঞ্ছিত ও হীনতাগ্রস্ত হয়ে পলায়ন করে।

পরন্তু মুসলিম যদি রসূল ﷺ কর্তৃক নির্দেশিত চিকিৎসার সাহায্য নেয়, তাহলে শয়তানের দেওয়া ঐ কুমন্ত্রণা তার হৃদয়-মনে কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে না।

এক ব্যক্তি মহানবী ﷺ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল, 'আমার মনে এমন কথা আসে, যা মুখে উচ্চারণ করার চেয়ে আমি যদি জ্বলন্ত আঙ্গার হয়ে যাই, তাহলে সেটাই আমার কাছে অধিকতর পছন্দনীয়!' এ কথা শুনে নবী ﷺ বললেন, "সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা, যিনি তার চক্রান্তকে প্রতিহত করেছেন।" অর্থাৎ, শয়তানের কুমন্ত্রণা বাতিল করে দিয়েছেন। *(আবূ দাঊদ)*

অনুরূপভাবে কিছু সাহাবা (রাঃ) তাঁর নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের

মনের ভিতর এমন কথা পাই, যা আমাদের কেউ তা মুখে আনতে মারাত্মক মনে করে! মহানবী ﷺ বললেন, "তোমরা কি তা পেয়েছ?" তাঁরা বললেন, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "এটাই তো স্পষ্ট ঈমান।" *(মুসলিম ১৩২নং)*

এখানে স্পষ্ট ঈমানের অর্থ এই যে, তোমাদের মনে ঐ প্রক্ষিপ্ত কুমন্ত্রণা এবং তোমাদের তা অগ্রাহ্যকরণ, হার্দিক প্রতিবাদ ও তা মুখে উচ্চারণ করতে ভীষণ খারাপ ভাবা, তোমাদের ঈমানের কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করে না। বরং এইরূপ হওয়াটা তোমাদের প্রকট ও উজ্জ্বল ঈমানেরই পরিচায়ক।

তিনি আরো বলেন, "তোমাদের মধ্যে কারো নিকট শয়তান হাজির হয়ে বলে, 'এটা কে সৃষ্টি করেছে? ওটা কে সৃষ্টি করেছে?' শেষ পর্যন্ত সে বলে যে, (সব তো আল্লাহ সৃষ্টি করেছে কিন্তু) তোর রবকে কে সৃষ্টি করেছে?!' অতএব যখন কেউ এই পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, তখন সে যেন আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং (এ ধরনের চিন্তা থেকে) বিরত হয়।" *(বুখারী, মুসলিম ১৩৪নং)* অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, "তখন সে যেন বলে, 'আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছি।' আবূ দাউদের বর্ণনায় সূরা ইখলাস পড়তে এবং তারপর বাম দিকে ৩ বার থুথু মারতে ও বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাইতে বলা হয়েছে।

উপরোল্লেখিত হাদীসসমূহে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) মহানবী ﷺ এর নিকট রোগের নানা লক্ষণ বর্ণনা করলে তিনি তার চিকিৎসা-পদ্ধতি চারভাবে বর্ণনা করলেনঃ-

১। ঐ কুমন্ত্রণায় ধ্যান না দিয়ে কুচিন্তা থেকে বিরত হওয়া। অর্থাৎ, ঐ ধরনের চিন্তা মন থেকে সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলা এবং এমনভাবে বিস্মৃত হওয়া, যেন ঐ চিন্তা মনেই ছিল না। অতঃপর কোন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়া অথবা কোন উত্তম ও মার্জিত চিন্তায় অভিনিবেশ করা।

২। ঐরূপ কুচিন্তা ও কুমন্ত্রণা এবং বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করা।

৩। 'আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান এনেছি' বলা।

৪। সূরা ইখলাস পাঠ করা। *(মিন মুশকিলাতিশ শাবাব ২৬-২৮পৃঃ দ্রঃ)*

তকদীরে হয়রান

যুবকের হৃদয়-মনে আগত জটিল সমস্যাবলীর মধ্যে আল্লাহর লিখিত নিয়তি বা ভাগ্যের ব্যাপারে বিহ্বলতা ও বিমূঢ়তা অন্যতম। যেহেতু তকদীরের ভালো-মন্দের উপর ঈমান ঈমানের এক রুক্ন। যার উপর বিশ্বাস ব্যতীত কোন মু'মিনের ঈমান পূর্ণ হতে পারে না। (বরং তা অস্বীকার করলে কাফের হতে হয়।) *(মিশকাত ১০৪নং দ্রঃ)*

তকদীরে বিশ্বাস রাখার মানে এই দৃঢ় প্রত্যয় যে, আল্লাহ তাআলা আকাশমন্ডলী ও

পৃথিবীতে যা কিছু হবে তা জানেন এবং সে সবের তিনি নিয়ন্তা। যেমন তিনি বলেন, “তুমি কি জান না যে, আকাশ-পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা অবগত আছেন? এ সবই এক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এ আল্লাহর নিকট সহজ।” *(সূরা হজ্জ ৭০ আয়াত)*

নবী করীম ﷺ তকদীর নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ও বাদানুবাদ করতে নিষেধ করেছেন। আবূ হুরাইরা ؓ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ (বাড়ি হতে) বের হয়ে আমাদের নিকট এলেন। তখন আমরা তকদীর নিয়ে বিতর্ক করছিলাম। তা শুনে তিনি এমন রুষ্ট হলেন যে, তাঁর মুখমন্ডল বেদানার দানার মত লাল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, “তোমরা কি এই করতে আদিষ্ট হয়েছ? কিংবা আমি কি এরই জন্য তোমাদের মাঝে প্রেরিত হয়েছি? তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তখনই ধ্বংস হয়েছিল, যখন তারা এই বিষয়ে বিতর্ক করেছিল। আমি তোমাদের উপর কসম করছি যে, এ বিষয়ে তোমরা তর্ক করো না।” *(তিরমিযী, মিশকাত ৯৮-নং)*

তকদীর বিষয়ে তর্কালোচনা করা, তার রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করার বৃথা চেষ্টা করা এবং তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করার ফলে মানুষ এমন গোলক-ধাঁধায় পড়ে যায় যে, সেখান হতে বের হয়ে আসা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

অবশ্য নিরাপদের পথ এই যে, তুমি সৎকার্যের অভিলাষী ও প্রয়াসী হবে এবং যে কাজ করতে তুমি আদিষ্ট হয়েছ, তা যথাসাধ্য পালন করতে সচেষ্ট হবে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা তোমাকে জ্ঞান ও বোধশক্তি দান করেছেন, তোমার পথ-প্রদর্শনের জন্য, আম্বিয়া প্রেরণ করেছেন এবং তাঁদের উপর তাঁর পবিত্র গ্রন্থাবলী অবতীর্ণ করেছেন, “যাতে রসূল (আসার) পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” *(সূরা নিসা ১৬৫ আয়াত)*

পক্ষান্তরে মহানবী ﷺ যখন সাহাবাকে এ কথা বর্ণনা করেন যে, “প্রত্যেক মানুষেরই বাসস্থান জান্নাত অথবা জাহান্নাম নির্ধারিত ও লিখিত হয়ে আছে।” তখন তাঁরা বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! তাহলে আমরা আমাদের লিখিত (নিয়তির) উপর নির্ভর করে আমল ত্যাগ করব না কি?’ উত্তরে তিনি বললেন, “তোমরা আমল কর, যেহেতু প্রত্যেকেই যার জন্য সৃষ্ট হয়েছে তার প্রতি তাকে সহজ-পটু করা হবে।” অতএব যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান হবে তার পক্ষে সৌভাগ্যবানদের আমল সহজ করা হবে এবং যে ব্যক্তি দুর্ভাগ্যবান হবে তার পক্ষে দুর্ভাগ্যবানদের আমল সহজ করে দেওয়া হবে। অতঃপর রসূল ﷺ এই আয়াত পাঠ করলেন, “সুতরাং যে দান করবে, পরহেযগার হবে এবং উত্তম (অর্থাৎ, কলেমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’কে) সত্য জানবে, আমি তার জন্য সুখদ পরিণামের পথ সহজ করে দিব। আর যে ব্যয়কুণ্ঠ হবে, নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করবে এবং উত্তম (অর্থাৎ, কলেমা)কে মিথ্যা জানবে, আমি তার জন্য কঠোর পরিণামের পথ সহজ করে দিব।” *(সূরা লাইল ৫-১০ আয়াত)* *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮৫নং)*

সুতরাং মহানবী ﷺ তাঁদেরকে আমল বা কর্ম করে যেতে আদেশ করলেন এবং ভাগ্যের লিখনের উপর নির্ভর ও ভরসা করাকে বৈধ করলেন না। যেহেতু ‘জান্নাতী’ বলে লিখিত ব্যক্তি তখনই জান্নাতী হবে, যখন সে জান্নাতবাসীর আমল করবে এবং ‘জাহান্নামী’ বলে লিখিত ব্যক্তি তখনই জাহান্নামী হবে, যখন সে জাহান্নামবাসীর আমল করবে। আর আমল

মানুষের নিজস্ব সামর্থ্য ও ইচ্ছা অনুসারে হয়ে থাকে। যেহেতু সে নিজের ব্যাপারে জানে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে আমল করার এখতিয়ার ও শক্তি দিয়েছেন। যে দুয়ের দ্বারা সে যে কোন আমল করতে ইচ্ছা করলে করতে পারে, নচেৎ ত্যাগ করতে পারে।

যেমন মানুষ সফরের জন্য মনস্থ করে ও তারপর সফর করে। ঘরে থাকার সংকল্প করে ঘরে থাকে। কাছে আগুন দেখলে পলায়ন করে, কোন প্রিয় বস্তু দেখলে তার প্রতি অগ্রসর হয় ইত্যাদি। অনুরূপভাবে আনুগত্য ও অবাধ্যাচরণ মানুষ নিজের এখতিয়ারেই করে এবং নিজের এখতিয়ারেই বর্জন করে; আল্লাহ তাকে কোন কাজেই বাধ্য করেন না।

তকদীরের ব্যাপারে কিছু মানুষের মনে সাধারণতঃ দু'টি জটিলতা দেখা যায়ঃ-

১- মানুষ যদি বিশ্বাস করে যে, সে যা করে তা নিজের এখতিয়ারে করে, যা করে না তা নিজের এখতিয়ারেই করে না এবং তাকে কোন কাজ করতে বা ছাড়তে মজবুর ও বাধ্য করা হয় না, তাহলে এই বিশ্বাস এবং ঈমানের ঐ বিশ্বাসের মাঝে মিল বা সামঞ্জস্য থাকে কি করে, যেখানে বলা ও মানা হয়েছে যে, প্রত্যেক বস্তুই আল্লাহর নির্ধারিত নিয়তি লিখা অনুপাতে ঘটে থাকে?

এর জবাবে বলা যায় যে, আমরা যদি বান্দার আমল ও আচরণের প্রতি লক্ষ্য করি তাহলে বুঝতে পারি যে, তা দু'টি জিনিসের ফলে সম্পন্ন হয়ে থাকে; ইচ্ছা, অর্থাৎ কিছু করার এখতিয়ার এবং সামর্থ্য। যদি এই দু'টি জিনিস না থাকত তাহলে কোন কর্মই সম্পন্ন হতো না। আর ইচ্ছা ও সামর্থ্য উভয়ই আল্লাহর সৃষ্টি। যেহেতু ইচ্ছা হল এক ধীন্দ্রিয় শক্তি এবং সামর্থ্য হল এক দৈহিক শক্তি। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে মানুষের নিকট হতে ঐ ধীশক্তি বা বিবেক ছিনিয়ে নিতে পারেন; আর তখন মানুষের কোন ইচ্ছা বর্তমান থাকতে পারে না। অনুরূপ তিনি ইচ্ছা করলে তার সামর্থ্য ছিনিয়ে নিতে পারেন; আর তখন সে কোন কাজ করতে একেবারে অসমর্থ হয়ে পড়ে।

অতএব মানুষ যখন কোন কাজের সংকল্প করার পর তা সম্পাদিত করে, তখন আমরা সুনিশ্চিতরূপে জানতে পারি যে, আল্লাহ তা চেয়েছেন এবং তার ভাগ্যে নির্ধারিত করেছেন। যদি তা না হতো তাহলে মানুষের সংকল্পকে সেই কাজ হতে ফিরিয়ে দিতেন অথবা এমন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতেন, যা তার ও তার কর্ম-সামর্থ্যের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করত।

একজন বেদুইনকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'তুমি আল্লাহকে চিনলে কিরূপে?' বলল, উদ্যম ভেঙ্গে পড়ায় এবং সংকল্প ফিরে যাওয়ায়।'

২- পাপ করলে মানুষকে শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু যে পাপ তার ভাগ্যে লিখা ছিল, আর লিখনের বাইরে কিছু ঘটা সম্ভব নয়, তাহলে তাতে তাকে শাস্তি ভুগতে হবে কেন?

এর উত্তরে বলা যায় যে, যদি তাই বল, তাহলে এ কথাও বল যে, পুণ্যকাজ করলে মানুষকে তার সুফল দান করা হবে। কিন্তু যে পুণ্যকাজ তার ভাগ্যে লিখা ছিল, আর লিখনের বাইরে কিছু হওয়া বা ঘটা সম্ভব নয়, তাহলে তাকে সুফল দেওয়া হবে কেন? ন্যায় ও সুবিচার এই নয় যে, তকদীরের লিখনকে পাপের ক্ষেত্রে দলীল মনে করবে এবং পুণ্যের ক্ষেত্রে ধরবে না।

দ্বিতীয়তঃ মহান আল্লাহ এই অভিযোগ ও দলীলকে কুরআন মাজীদে নাকচ করেছেন এবং

'না জেনে বলা'র শামিল করেছেন। তিনি বলেছেন, "যারা মুশরিক তারা বলবে, 'আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ শির্ক করতাম না এবং কোন কিছুই হারাম করতাম না।' এভাবে তাদের পূর্ববর্তীগণও প্রত্যাখ্যান করেছিল, অবশেষে তারা আমার শাস্তি ভোগ করেছিল। বল, 'তোমাদের নিকট কোন জ্ঞান (বা যুক্তি) আছে কি? থাকলে আমার নিকট তা পেশ কর। তোমরা শুধু কল্পনারই অনুসরণ কর এবং শুধু মিথ্যাই বলে থাক।" *(সূরা আনআম ১৪৮ আয়াত)*

সুতরাং মহান আল্লাহ এ কথাই বর্ণনা করেন যে, যারা নিজেদের পাপ শির্কের সমর্থনে তকদীরকে দলীল ও প্রমাণ মনে করেছিল, তাদের পূর্ববর্তীরাও তাদের অনুরূপ ছিল। যারা তাদের মতই সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং মিথ্যাজ্ঞান করেছিল। আর আল্লাহর শাস্তি ভোগ করা পর্যন্ত তারা তাতেই অবিচল ছিল। অতএব তাদের ঐ যুক্তি ও প্রমাণ যদি সঠিক হত, তাহলে আল্লাহর শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতে হত না। অতঃপর মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ কে সঠিক যুক্তির মাধ্যমে তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ করতে আদেশ করে বলেন যে, তাদের ঐ কথায় কোন দলীল বা যুক্তি নেই। তারা যা মনে করে, তা কেবল ধারণা ও অলীক মাত্র।

তৃতীয়তঃ তকদীর আল্লাহর এক গুপ্ত রহস্য। সংঘটিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছাড়া আর অন্য কেউ তার তত্ত্ব জানতে পারে না। সুতরাং পাপী কিরূপে জানতে পারে যে, তার তকদীরে পাপ লিখা আছে এবং সেই ভিত্তিতে সে পাপে অগ্রসর হয়? এটা কি সম্ভব নয় যে, তার ভাগ্যে আনুগত্য লিখা আছে? অতঃপর পাপের পরিবর্তে আনুগত্যের পথে অগ্রসর হয়ে কেন বলে না যে, আল্লাহ আমার ভাগ্যে পুণ্য লিখেছিলেন?

চতুর্থতঃ বলা যায় যে, (আল্লাহ তাআলা পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দ উভয়ই সৃষ্টি করেছেন এবং) তিনি মানুষকে জ্ঞান-বিবেক ও ভালো-মন্দ বিচার করার শক্তি দান করে সকল জীব-জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। তার উপর দ্বীনের পথ-নির্দেশিকা গ্রন্থাবলী অবতীর্ণ করেছেন এবং সুপথের দিশারী স্বরূপ রসূল ও আম্বিয়া প্রেরণ করেছেন তাদের প্রতি। তাঁদের মাধ্যমে মানুষকে উপকারী ও অপকারী বিষয়ে সতর্ক করেছেন। মানুষকে এমন ইচ্ছাশক্তি ও সামর্থ্য দান করেছেন, যদ্দ্বারা ভালো অথবা মন্দ বেছে নিয়ে সে যে কোন পথে চলতে পারে। সুতরাং কেন এই পাপী ভালো পথ ত্যাগ করে মন্দ পথকে বেছে নেয়? অথচ এই যুবক সফরে গেলে যদি দু'টি রাস্তা পায়; যার একটি সহজ ও নিরাপদ এবং অপরটি কঠিন ও বিপদসঙ্কুল, তাহলে তো সে সুনিশ্চিতভাবে প্রথম রাস্তাটিকেই গ্রহণ করে এবং দ্বিতীয়টিকে অবশ্যই বর্জন করে। আর তখন বলে না যে, আল্লাহ আমার ভাগ্যে এই পথে চলা লিখেছেন। বরং এই যুক্তিতে যদি সে বিপজ্জনক পথে চলে, তাহলে লোকে তাকে পাগল ও বেওকুফ বলবে।

তদনুরূপই ধর্ম ও অধর্মের পথ। তাই মানুষের উচিত, ধর্ম ও কল্যাণের পথ বেছে নিয়ে তাতে চলা। 'আল্লাহ ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন'- এই যুক্তিতে অধর্ম ও মন্দের পথ ধরে নিজেকে ধোকা দেওয়া উচিত নয়। তাই তো আমরা দেখি যে, প্রত্যেক সক্ষম উপার্জনশীল মানুষ রুযী-রুটীর সন্ধানে তার প্রত্যেক রাস্তায় পদক্ষেপ করে থাকে এবং রোজগার ত্যাগ করে এই কথার দোহাই দিয়ে ঘরে বসে থাকে না যে, তকদীরে থাকলে পয়সা হবে।

অতএব পার্থিব ও সাংসারিক প্রচেষ্টা ও আল্লাহর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টার মাঝে পার্থক্য কি? কেন আনুগত্য ত্যাগ করার সমর্থনে তকদীরকে তোমার জন্য দলীল মনে করছ, অথচ পার্থিব কোন কাজ ত্যাগ করার সমর্থনে তা দলীল মনে কর না? যথাস্থানে ব্যাপারটি খুবই স্পষ্ট। কিন্তু কুপ্রবৃত্তি মানুষকে অন্ধ ও বধির করে তোলে। *(মিন মুশকিলাতিশ শাবাব ২৯-৩৪পৃঃ দ্রঃ)*

যুবক ও অন্ধ-গোঁড়ামি

যৌবন এমন একটা কাল, যে কালে মানুষের মাঝে প্রায় সর্ববিষয়ে এক প্রকার জোশ থাকে; যে জোশে অনেকে হুঁশও হারিয়ে বসে। অতি আবেগে আপ্লুত হয়ে প্রায় সকল ব্যাপারে অতিরঞ্জন করে থাকে। দ্বীনী-চেতনায় চৈতন্যপ্রাপ্ত যুবকের মাঝেও অনুরূপ অতিরঞ্জন আসা অস্বাভাবিক নয়। তাই দ্বীনের জন্য নিবেদিত-প্রাণ যুবকও কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কিছুকে প্রয়োজনের অধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে এমন বাড়াবাড়ি করে থাকে, যা সত্যই ক্ষতিকর; দ্বীনের জন্য এবং তার নিজের জন্যও।

মহান আল্লাহ তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে অতিরঞ্জন পছন্দ করেন না। তাই পূর্ববর্তী ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল, "হে কিতাবধারিগণ! তোমরা স্বীয় ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ সম্বন্ধে সত্যই বল---।" *(সূরা নিসা ১৭১ আয়াত)* "হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরা ধর্ম সম্বন্ধে সীমা অতিক্রম করো না এবং সেই সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা পূর্বে বিপথগামী হয়েছিল, ফলে তারা অনেককেই পথভ্রষ্ট করেছিল। আর তারা নিজেরাও ছিল সরল পথ হতে বিভ্রান্ত। *(সূরা মাইদাহ ৭৭ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "সাবধান! তোমরা ধর্ম-বিষয়ে অতিরঞ্জন করো না। কারণ, এই অতিরঞ্জনের ফলে তোমাদের পূর্ববর্তীগণ ধ্বংস হয়েছে।" *(আহমাদ ১/২১৫, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ৩০২৯নং)*

সুতরাং কোন বিষয় বা ব্যক্তিত্বের প্রশংসা অথবা নিন্দায় অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি করা ইসলামে নিষিদ্ধ। যার যথা মান তাকে তথাস্থানে রাখাই হল মধ্যম-পন্থা। চরম-পন্থা ইসলামে আদৌ স্বীকৃত নয়।

মহান আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে বলেছিলেন, "তোমাদেরকে যে উপজীবিকা দান করেছি, তা হতে পবিত্র বস্তু আহার কর এবং এ বিষয়ে সীমালংঘন করো না, করলে তোমাদের উপর আমার গযব (ক্রোধ) নেমে আসবে। আর যার উপরে আমার গযব নেমে আসে, সে তো ধ্বংস হয়ে যায়।" *(সূরা ত্বাহা ৮১ আয়াত)*

তিনি মহানবী ﷺ ও তাঁর অনুসারীদেরকে সম্বোধন করে বলেন, "সুতরাং তুমি ও তোমার সাথে যারা তওবা করেছে তারা সবাই সরল পথে স্থির থাক -যেমন তোমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর সীমালংঘন করো না। তোমরা যা কর, নিশ্চয় তিনি তার প্রতি দৃষ্টি রাখেন।" *(সূরা হূদ ১১২ আয়াত)*

কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে শরীয়ত আমাদের সর্ববিষয়কে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। সে সীমা অতিক্রম করাই হল শরীয়তের উপর বাড়াবাড়ি করা। মহান আল্লাহ বলেন, "ওদের জন্য এ কি যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার (নবীর) উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছি; যা ওদের নিকট পাঠ করা হয়? এতে অবশ্যই বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য অনুগ্রহ ও উপদেশ আছে।" *(সূরা আনকাবূত ৫১ আয়াত)*

শরীয়তের নির্ধারিত সীমারেখার ভিতরেই রয়েছে মানুষের সার্বিক মঙ্গল। অবশ্য যারা এর উপদেশ গ্রহণ করে না অথবা তাতে বাড়াবাড়ি করে, তারা সে মঙ্গল ও আল্লাহর অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত থেকে যায়।

আমাদের দয়ার নবী ﷺ ও কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না। তিনি নিজের ব্যাপারে বলতেন, "তোমরা আমাকে নিয়ে (আমার তা'যীমে) বাড়াবাড়ি করো না, যেমন খ্রিষ্টানরা ঈসা বিন মারয়্যামকে নিয়ে করেছে। আমি তো আল্লার দাস মাত্র। অতএব তোমরা আমাকে আল্লাহর দাস ও তাঁর রসূলই বলো।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৮৯৭ নং)*

একদা তিনে খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় দেখলেন, এক ব্যক্তি রোদে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে লোকেরা বলল, 'আবূ ইসরাঈল, সে এই নযর মেনেছে যে, দাঁড়িয়ে থাকবে এবং বসবে না, ছায়া গ্রহণ করবে না, কথা বলবে না এবং রোযা পালন করবে!' এ কথা শুনে নবী ﷺ বললেন, "ওকে আদেশ কর, যেন ও কথা বলে, ছায়া গ্রহণ করে, বসে যায় এবং রোযা পূরণ করে।" *(বুখারী, মিশকাত ৩৪৩০ নং)*

একদা তিনি দেখলেন, এক বৃদ্ধ তার দুই ছেলের কাঁধে ভর করে (মক্কার দিকে) হেঁটে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলেন, "ওর ব্যাপার কি?" বলল, 'পায়ে হেঁটে কা'বা-ঘর যাওয়ার নিয়ত করেছে!' তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলার এমন প্রাণকে কষ্ট দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। ওহে বৃদ্ধ! তুমি সওয়ার হয়েই মক্কা যাও। কারণ, আল্লাহ তুমি ও তোমার নযরের প্রতি মুখাপেক্ষী নন।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩৪৩১-৩৪৩২ নং)*

মক্কা বিজয়ের দিনে এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি আল্লাহর কাছে এই নযর মেনেছি যে, তিনি যদি আপনার হাতে মক্কার বিজয় দান করেন, তাহলে আমি 'বাইতুল মাক্বদিস' (জেরুজালেমের মসজিদে) ২ রাকআত নামায আদায় করব।' এ কথা শুনে নবী ﷺ তাকে ২ বার বললেন, "তুমি এখানেই (কা'বার মসজিদেই) নামায পড়ে নাও।" *(আবূ দাঊদ, দারেমী, মিশকাত ৩৪৪০ নং)*

একদা তিন ব্যক্তি মহানবী ﷺ এর ইবাদত সম্পর্কে জানার জন্য তাঁর বিবিদের নিকট উপস্থিত হল। যখন তাঁর ইবাদতের কথা তাদেরকে বলা হল, তখন তারা তা কম মনে করল এবং বলল, নবী ﷺ এর সাথে আমাদের তুলনা কোথায়? তাঁর তো পূর্বাপর সমস্ত গোনাহ আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। অতঃপর একজন বলল, 'আমি সর্বদা সারা রাত্রি নামায পড়তে থাকব। দ্বিতীয়জন বলল, আমি সর্বদা রোযা রাখতে থাকব; কখনও রোযা ত্যাগ করব না। তৃতীয়জন বলল, আমি সর্বদা স্ত্রী থেকে দূরে থাকব; কখনো বিবাহ করব না।

মহানবী ﷺ এর নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি তাদেরকে বললেন, "তোমরা কি সেই সকল লোক, যারা এই এই কথা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের থেকে

অধিকরূপে ভয় করে থাকি এবং তাঁর জন্য অধিক সংযম অবলম্বন করে থাকি। এতদ্সত্ত্বেও আমি কোন দিন রোযা রাখি এবং কোন দিন রোযা ছেড়েও দিই। (রাত্রে) নামাযও পড়ি, আবার ঘুমিয়েও থাকি এবং স্ত্রী-মিলনও করি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার তরীকা থেকে বিমুখতা প্রকাশ করে, সে আমার দলভুক্ত নয়।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৪৫নং)*

মহানবী ﷺ এর সাহাবাগণও দ্বীনের ব্যাপারে কোন প্রকার বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না। একদা হজ্জে গিয়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) আহমাস গোত্রের যয়নাব নামক এক মহিলাকে লক্ষ্য করলেন, সে মোটেই কথা বলে না। তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার, ও কথা বলে না কেন?' লোকেরা বলল, 'ও নীরব থেকে হজ্জ পালন করার নিয়ত করেছে।' তিনি সেই মহিলাকে সরাসরি বললেন, 'তুমি কথা বল। এমন কর্ম বৈধ নয়। এমন কর্ম জাহেলিয়াত যুগের!' এ কথা শুনে মহিলা কথা বলতে শুরু করল। *(বুখারী ৩৮৩৪ নং)*

চরমপন্থা কোন বিষয়েই ভালো নয়, যেমন ভালো নয় একেবারে নরম, ঢিলে ও এলো পন্থা। প্রত্যেক ব্যাপারে মধ্যমপন্থাই হল একজন পূর্ণ আদর্শবান মুসলিমের অনুসরণীয় পথ। পক্ষান্তরে চরম ও নরমপন্থীরাই হল ক্ষতিগ্রস্ত। হযরত আলী ؓ বলেন, 'আমার ব্যাপারে দুই ব্যক্তি ধ্বংস হবে। প্রথম হল, আমার ভক্তিতে সীমা অতিক্রমকারী ভক্ত এবং দ্বিতীয় হল, আমার বিদ্বেষে সীমা অতিক্রমকারী বিদ্বেষী।' *(শাইবানীর কিতাবুস সুন্নাহ ৯৭৪ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "আমার উম্মতের দুই শ্রেণীর লোক আমার সুপারিশ লাভ করতে পারবে না; বিবেকহীন অত্যাচারী রাষ্ট্রনেতা এবং প্রত্যেক সত্যত্যাগী অতিরঞ্জনকারী।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ৩৭৯৮ নং)*

তিনি আরো বলেন, "অতিরঞ্জনকারীরা ধ্বংস হয়েছে।" *(আহমাদ, মুসলিম, আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ৭০৩৯ নং)*

ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করার নাম হল 'গোঁড়ামি।' যার জন্য 'গোঁড়া' কথার অর্থই হল, কঠোর অন্ধভক্ত, অযৌক্তিক অন্ধবিশ্বাসী, অত্যধিক পক্ষপাতী, অতিভক্তি বা অন্ধভক্তির আবেগে আপ্লুত ব্যক্তি। আর এ জন্যই অতিরিক্ত টকজাতীয় এক প্রকার লেবুকে 'গোঁড়া লেবু' বলা হয়।

এই অর্থেই অনেকে বলেছেন যে, 'ধর্ম নিয়ে যারা গোঁড়ামি করে, ধর্মের মর্ম তারা বোঝে না।'

নামাযে দাঁড়িয়ে সাজু তার পাশের নামাযী মাজুর পায়ে পা লাগিয়ে দিল। মাজু চট্ করে তার পা সরিয়ে নিল। পুনরায় সাজু তার পা বাড়িয়ে মাজুর পায়ে লাগিয়ে দিল। মাজু আবারও পা সরিয়ে নিল। এবারে সাজু মাজুর পা ধরে টেনে এনে তার পায়ের সঙ্গে লাগিয়ে দিল! কিন্তু মাজু আবারও তার পা সরিয়ে নিয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়াল।

তুমি নিশ্চয়ই বলতে বাধ্য হবে যে, এখানে সাজু ও মাজু উভয়েই গোঁড়া। কারণ, মহব্বতের সাথে পায়ে পা মিলিয়ে কাতার বেঁধে দাঁড়ানো সুন্নত। মহানবী ﷺ এর পশ্চাতে সাহাবাগণ অনুরূপই দাঁড়াতেন। কিন্তু কেউ বেআদবী মনে করে অথবা ঘৃণা বা অহংকারবশে সেই সুন্নতকে পছন্দ না করলে জোরপূর্বক তার পায়ে বারবার পা লাগিয়ে নামাযের ভিতরে পা-লড়াই অবশ্যই সুন্নত নয়; বরং অতিরঞ্জন। অবশ্য সাজুর প্রথমবার পা লাগানোটা সুন্নত ছিল। বাকী মাজুর সবটাই ছিল গোঁড়ামি।

অনুরূপভাবে অনেক মানুষ আছে যাদের বিবির মাথায় কাপড় না থাকলেও নিজেদের মাথায় টুপি রাখার জন্য বাড়াবাড়ি করে থাকে। মুস্তাহাবকে ফরজের দর্জা দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে ফরয ছেড়ে সুন্নত নিয়ে টানাটানি করে থাকে। এরা একদিকে যেমন নরমপন্থী, তেমনি অপরদিকে চরমপন্থীও।

প্রত্যেক বিষয়েই তিন অবস্থা হতে পারে; অবজ্ঞা, স্বাভাবিকতা ও অতিরঞ্জন। অথবা নরমপন্থা, মধ্যমপন্থা ও চরমপন্থা। এখন অবজ্ঞা ও অতিরঞ্জন তথা নরম ও চরমপন্থা কি - তা জানতে ও নির্ণয় করতে হলে পূর্বে অবশ্যই উভয়ের মাঝামাঝি পথ স্বাভাবিকতা ও মধ্যমপন্থাকে চিনতে হবে। নচেৎ এমনও হতে পারে যে, যে আসলে চরমপন্থী ও 'গোঁড়া' নয় তাকে চরমপন্থী ও 'গোঁড়া' বলে গালি দেওয়া হবে। সাধারণ এই চায়ের মজলিসে চা খাওয়ার কথাই ধর। একই কেটলির চা খেতে খেতে কেউ বলে, 'মিষ্টি হাল্কা হয়েছে।' কেউ বলে, 'কড়া মিষ্টি' আবার কেউ বলে, 'আরে না-না, ঠিকই তো হয়েছে!' এখন চায়ের এই মিষ্টি-বিচারে এমনও হতে পারে যে, যার মিষ্টি হাল্কা খাওয়া অভ্যাস, সে ঐ চা-কে 'কড়া মিষ্টি' বলে আখ্যায়িত করছে। আর যার 'কড়া মিষ্টি' খাওয়া অভ্যাস, সে বলছে 'হাল্কা মিষ্টি।' সুতরাং এমন এক সালিস লোকের বিচার মানতে হবে, যে খায় স্বাভাবিক মিষ্টি।

কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপারে ঐ স্বাভাবিকতা বা মধ্যমপন্থা বিচারের মাপকাঠি কি? ধর্মীয় কোন ব্যাপারে স্বাভাবিকতা অথবা বাড়াবাড়ি, নাকি ঢিলেমি -এ কথা কে বলতে পারে? যারা ধর্মের ধার ধারে না এবং ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান রাখে না তারা, নাকি এর বিপরীত? নিঃসন্দেহে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, যে যে বিষয়ে জ্ঞান রাখে না, তার সে বিষয়ে ঐ শ্রেণীর কোন মন্তব্য বা উক্তি করা মূর্খামি। যেমন হাল্কা মিষ্টি খায় বা ডায়োবেটিস্ আছে এমন রোগীর স্বাভাবিক মিষ্টির চা-কে 'কড়া মিষ্টি' বলা বোকামি।

উদাহরণ স্বরূপ, পরিবেশের স্বাভাবিকতা হল পর্দাহীনতা। কিন্তু যাঁরা কুরআনী আইন মানেন তাঁরা নিজেদের মহিলাদেরকে বোরকা পরান এবং পর্দার সাথে বাসে-ট্রেনে চড়ে শিক্ষা বা চাকুরীস্থলে যেতে দেন। কিন্তু আরো কিছু ধার্মিক লোক আছেন, যাঁরা মহিলাদের বাসে-ট্রেনে চড়া হারাম মনে করেন। পর্দার সাথে তারা যে বাইরে যেতে পারে -এ কথা মানতে চান না। এখন ধর্মের মর্ম যাঁরা বোঝেন, তাঁরা যদি ধর্মের স্বাভাবিকতা ও নির্দেশ অনুযায়ী বিচার করেন, তাহলে নিশ্চয় তাঁরা পর্দাহীনতাকে ঢিলে ও নরমপন্থা বলবেন। যাঁরা বোরকা ব্যবহার করে পর্দার আদেশ পালন করেন, তাঁদেরকে মধ্যমপন্থী বলবেন এবং 'গোঁড়া' বলতে পারবেন না। অবশ্য যাঁরা 'অবরোধ'-প্রথায় বিশ্বাসী তাঁদেরকে 'গোঁড়া' বলতে দ্বিধা থাকবে না। কারণ, যা হারাম নয়, তা হারাম করা হল, অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি। অতএব নিঃসন্দেহে তা গোঁড়ামি। পক্ষান্তরে শরীয়তের স্বাভাবিক নির্দেশ পালন করাকে গোঁড়ামি বলাও বোকামি।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, যারা এ বিচারের যোগ্য নয়, তারাই এ বিচারভার গ্রহণ করে আল্গা জিভে যাকে তাকে 'গোঁড়া' বলে গালি পেড়ে মূর্খের পরিচয় দিয়ে থাকে।

যাদের সংরক্ষণে রয়েছে সমস্ত প্রচার-মাধ্যম, তারা গোঁড়া ও মৌলবাদী এবং উদার ও সংস্কারপন্থী আখ্যায়ন করে মুসলিম সমাজকে দু'ভাগে ভাগ করে রেখেছে। প্রশংসা করেছে তথাকথিত উদারপন্থীদের এবং উপহাস ও কটাক্ষ করেছে মৌলবাদী নিয়ে। উদারপন্থী হল

তারা, যারা মোটেই বা সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে চলা জরুরী মনে করে না। যে স্বামী তার স্ত্রীকে বন্ধুদের সাথে অবাধ মিলামিশা করতে দেয়, সে স্বামী উদারপন্থী। যে দেয় না সে গোঁড়া মৌলবাদী। আর যে নৈতিকতা মানে না এবং 'ফ্রি-সেক্স'-এ বিশ্বাসী সে হল উদারপন্থী। আর যে তা মানে সে হল গোঁড়া রক্ষণশীল। যে পশুর মত জীবন-যাপন করে সে উদারপন্থী এবং যে আল্লার দেওয়া জীবন-ব্যবস্থা অনুযায়ী সুন্দর জীবন-যাপন করে সে ওদের নজরে রক্ষণশীল!

পক্ষান্তরে ওরাও এক শ্রেণীর একগুঁয়ে রক্ষণশীল গোঁড়া। ওরাও বাতিল পথে থেকে এক-গুঁয়েমির সাথে কুফরী-জিন্দেগীকে প্রাধান্য দেয়। ধর্মহীন জীবন গড়তে ওরাও বেশ বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন প্রদর্শন করে থাকে। মাতালকে তার অমাতাল বন্ধু বারবার মদ খাওয়া ছাড়তে বললে মাতাল তাকে গোঁড়া বলে ব্যঙ্গ করে। অথচ মাতাল নিজেও মাতলামিতে সেই একই পর্যায়ের গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতা প্রদর্শন করে, তা হয়তো সে বুঝেও বুঝে না। তাহলে আসল গোঁড়া ও রক্ষণশীলটা কে?

বাহুবলে বলিয়ান্ নও-জোয়ান বন্ধু আমার! ইসলামের জন্য তোমার প্রাণ উৎসর্গ হোক, এটা তোমার মন অবশ্যই চাইবে। কিন্তু জেনে রেখো, ত্রাস ও ভীতি সৃষ্টি করে ধর্মপ্রচার ইসলামে নেই। নেই ভীতিমূলক রাজদ্রোহবাদ বা সন্ত্রাসবাদ। ইসলাম পছন্দ করে উদারতা, সরলতা, নম্রতা ও কোমলতাকে এবং পছন্দ করে না গরম ও চরম কিছুকে। দ্বীনের নবী দয়ার সাগর ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি সহজ-সরল ও কোমল হবে, সে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ দোযখ হারাম করে দেবেন।" *(সহীহুল জামে' ৬৪৮৪ নং)*

"যে ব্যক্তি নম্রতা থেকে বঞ্চিত, সে ব্যক্তি সর্বপ্রকার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।" *(আহমাদ, মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৬৬০৬ নং)*

"অবশ্যই আল্লাহ কৃপাময়। তিনি কোমলতা পছন্দ করেন। আর কোমলতার উপর যা প্রদান করেন, তা কঠোরতার উপর, বরং এ ব্যতীত অন্য কিছুর উপর প্রদান করেন না।" *(মুসলিম ২৫৯৩ নং)*

"নম্রতা যে বিষয়ে থাকে সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যমন্ডিত করে তোলে। আর যে বিষয়কে নম্রতা থেকে খালি করা হয়, সে বিষয় সৌন্দর্যহীন হয়ে যায়।" *(আহমাদ, মুসলিম, সহীহুল জামে' ৫৬৫৪ নং)*

একদা মা আয়েশা এক ব্যক্তিকে কঠোরতার সাথে কিছু বললে তিনি বললেন, "থামো হে আয়েশা! কোমলতা অবলম্বন কর এবং কঠোরতা ও অশ্লীলতা হতে দূরে থাক---।" *(বুখারী, সহীহুল জামে' ৬৬২৭ নং)*

"হে মানব সকল! আমি যে কর্মের আদেশ করি, তার প্রত্যেকটাই পালন করতে তোমরা কক্ষণই সক্ষম হবে না। তবে তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর এবং সুসংবাদ নাও।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ৭৮৭১ নং)*

"(দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে) তোমরা সরলতা ব্যবহার কর, কঠোরতা ব্যবহার করো না, মানুষের মনকে খোশ কর এবং তাদের মনে ঘৃণা সৃষ্টি করো না।" *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, সহীহুল জামে' ৮০৮৬ নং)*

"ঈমান হল সহিষ্ণুতা ও উদারতার নামান্তর।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ২৭৯৫ নং)*

দ্বীন-দরদী জোয়ান বন্ধু আমার! দ্বীনের ব্যাপারে তোমার মন কষ্ট পাবে, তা পাওয়া ভালো। দ্বীনের দুশমনদের প্রতি তোমার মন বিষময় হবে, তা হওয়া ভালো। কিন্তু তোমার মনে সহিংসতা স্থান পাবে, এমন ভালো নয়। দাওয়াতের যে পদ্ধতি আমাদের মহনবী ﷺ অবলম্বন করে গেছেন, কেবল সেই সেই পদ্ধতিই তোমার দ্বীন মানা ও প্রচার করার ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ, তাতেই আছে সার্বিক কল্যাণ। নচেৎ আবেগবশে খেয়াল-খুশীর অনুসারী হয়ে যথেচ্ছাচারিতা প্রয়োগ করাতে কোন প্রকার কল্যাণ নেই। বরং অকল্যাণ আছে। তাছাড়া সে প্রয়োগে তোমার অধিকারও নেই। ঐ দেখ না, নবীর প্রতি মহান আল্লাহর কি নির্দেশ। তিনি তাঁকে সম্বোধন করে বলেন, "তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে। তবে ওরা নয়, যাদের প্রতি তোমার প্রতিপালক দয়া করেন এবং তিনি ওদেরকে এ জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আমি জ্বিন ও মানুষ উভয় দ্বারা দোযখ পূর্ণ করবই, তোমার প্রতিপালকের এই কথা পূর্ণ হবেই।" *(সূরা হূদ ১১৮ আয়াত)*

"তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে, তারা সমবেতভাবে সকলেই ঈমান আনত; তবে কি ঈমান আনার জন্য তুমি মানুষের উপর জবরদস্তী করবে?" *(সূরা ইউনুস ৯৯ আয়াত)*

"তোমরা আহলে কিতাবদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে, কিন্তু সৌজন্যের সাথে। তবে তাদের সাথে নয়, যারা ওদের মধ্যে সীমালংঘনকারী।" *(সূরা আনকাবূত ৪৬ আয়াত)*

"তুমি মানুষকে জ্ঞান ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর এবং ওদের সাথে সদ্ভাবে বিতর্ক কর। তোমার প্রতিপালক জ্ঞাত আছেন -কে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথগামী হয় এবং এও জ্ঞাত আছেন -কে সুপথগামী। যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণই করো, তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দেবে, যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য তাই তো উত্তম। ধৈর্য ধারণ কর, তোমার ধৈর্য তো আল্লাহরই সাহায্যে হবে, ওদের আচরণে দুঃখ করো না এবং ওদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুন্ন হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সংযমীদের সাথে আছেন এবং তাদের সাথে যারা সৎকর্মপরায়ণ।" *(সূরা নাহল ১২৫- ১২৮ আয়াত)*

"ভালো এবং মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা, এর ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত হয়ে যাবে।" *(সূরা ফুসসিলাত ৩৪ আয়াত)*

আশা করি এ কয়টি আয়াত অনুধাবন করে তোমার মনের উগ্রভাব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়ে যাবে এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমার মন খুব সান্ত্বনা পাবে। তবে আরো একটি মহাবাণী শোন, তিনি মহানবী ﷺ কে বলেন, "আল্লাহর রহমতে তুমি তাদের প্রতি কোমল-চিত্ত হয়েছিলে, অন্যথা যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর-হৃদয় হতে, তাহলে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। আর তুমি কোন সংকল্প করলে আল্লাহর উপর নির্ভর করো; আল্লাহ তাঁর উপর নির্ভরকারী বান্দাগণকে ভালোবাসেন।" *(সূরা আলি ইমরান ১৫৯ আয়াত)*

দুঃসাহসী বন্ধু আমার! সন্ত্রাসী তৎপরতার মাঝে নিরপরাধ মানুষদেরকে খুন করার অধিকার তোমার নেই। এমন কি জিহাদেও নারী-বৃদ্ধ-শিশু প্রভৃতি বেসামরিক মানুষকে হত্যা

করার অনুমতি ইসলামে নেই। একজন পাপ বা অপরাধ করলে, তার শাস্তি অপরে কেন ভোগ করবে? মহান আল্লাহ তো বলেন, "যে ব্যক্তি কোন পাপ করে, তা তারই দায়িত্বে থাকে। (তার জন্য সেই দায়ী) এবং কেউ অপরের পাপভার বহন করবে না।" *(সূরা আনআম ১৬৪ আয়াত)* অতএব ওয়াজেদ মিঞার বোনকে যদি সাজেদ মিঞা (নিজের স্ত্রীকে) মারধর করে, তবে ওয়াজেদ মিঞার উচিত নয়, (নিজের স্ত্রী) সাজেদ মিঞার বোনকে মারধর করা। বিবেকও বলে না, অপরাধীদের পরিবর্তে নিরপরাধ মানুষদেরকে খুন করতে।

কোন জাতির কিছু লোক অথবা গ্রামের কিছু লোক তোমার রক্ত-পিপাসু শত্রু হলেও তুমি ঐ জাতির বা ঐ গ্রামের সকল লোককে তোমার রক্ত-পিপাসু ধারণা করে ব্যাপকভাবে ধ্বংস করতে পার না।

আর শোন মহান আল্লাহ কি বলেন, "এ কারণেই বানী ইসরাঈলকে এ বিধান দিয়েছিলাম যে, যে কেউ প্রাণের বদলে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজের বদলা নেওয়া ছাড়া কাউকে (অন্যায়ভাবে) হত্যা করে সে যেন (পৃথিবীর) সকল মানুষকেই হত্যা করে এবং যে কারো প্রাণ রক্ষা করে সে যেন (পৃথিবীর) সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করে।" *(সূরা মায়েদাহ ৩২ আয়াত)*

"আর যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার শাস্তি হবে জাহান্নাম, সেখানেই সে চিরকাল থাকবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করে রাখবেন।" *(সূরা নিসা ৯৩ আয়াত)*

অস্ত্র নিয়ে মানুষের মনে-প্রাণে ত্রাস সৃষ্টি করা মুসলিমের কাজ নয়। এমন কি অস্ত্র উঁচিয়ে কাউকে ভয় দেখানোও বৈধ নয় ইসলামে। কথায় কথায় 'খুন করে দোব, কেটে দোব, শুট্ করে দোব, মেরে ফেলব' ইত্যাদি উগ্র হুমকিও কোন মুসলিম দিতে পারে না।

আবুল কাসেম ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভায়ের প্রতি কোন লৌহদন্ড (লোহার অস্ত্র) দ্বারা ইঙ্গিত করে সে ব্যক্তিকে ফিরিশ্তাবর্গ অভিশাপ করেন; যদিও সে তার নিজের সহোদর ভাই হোক না কেন।" (অর্থাৎ, তাকে মারার ইচ্ছা না থাকলেও ইঙ্গিত করে ভয় দেখানো গোনাহর কাজ।) *(মুসলিম ২৬১৬নং)*

কথিত আছে যে, "একদা লুকমান হাকীম তাঁর পুত্রকে বললেন, বৎস! যারা বলে, 'মন্দকে মন্দ দ্বারা দূর করা উত্তম পন্থা' তারা মিথ্যা ও ভুল বলে। আর যদি তারা এ কথায় সত্যবাদী হয়, তাহলে পাশাপাশি দু'টি আগুন জ্বালিয়ে দেখুক না; একটি আগুন অপর আগুনকে নিভাতে পারে কি না?"

অতএব সত্য ও বাস্তব এই যে, মন্দকে ভালো দ্বারা দূর করা যায়; যেমন আগুনকে নিভানো যায় পানি দ্বারা। পেশাব দ্বারা পায়খানা পরিষ্কার হলেও নাপাকী যায় না, প্রয়োজন হয় পবিত্র পানির। বলা বাহুল্য হিংসাকে হিংসা দ্বারা দূর করা যায় না, প্রয়োজন আছে প্রেমের।

সন্ত্রাস ও সহিংসতায় লাভ হয় বিপক্ষের বেশী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল হয় না তাতে। বরং ফল হয় বিপরীত। অনেক ক্ষেত্রে সাপ মারতে গিয়ে ছিপ ভেঙ্গে বসে থাকে। কখনো বা 'জলের ছিটা দিয়ে লগির গুঁতো' খেতে হয়। কখনো হাত বোমা ছুঁড়ে মিযাইলের আঘাত খেতে হয়।

যৌবন-উন্মত্ত বন্ধু আমার! দেহের শক্তিমত্তা নিয়ে অহংকার প্রদর্শন করো না। কারণ মহান প্রতিপালক আল্লাহ অহংকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আর অহংকার হল সত্য প্রত্যাখ্যান ও মানুষকে ঘৃণা করার নাম। অপরকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছজ্ঞান করার মাধ্যমে মানুষকে অহমিকা প্রদর্শন করো না। বংশ-গৌরব, জনশক্তি, ধনগর্ব, শিক্ষা ও জ্ঞানের আত্মম্ভরিতা, রূপ ও রঙের অহংকার, পদ ও গদির অহংকার প্রভৃতির প্রকাশ কোন সময়ই কোনভাবেই বৈধ নয়। অতএব ধর্মের নামে এ সবে অহমিকা প্রদর্শন যে তোমার জন্য আদৌ বৈধ নয়, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং তুমি যদি তোমার ঐ উন্মত্ততা ও অহংকারের মাধ্যমে মানুষকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর দ্বীনের ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ করে তোল, তাহলে জেনে রেখো যে, মানুষকে আল্লাহর পথে আসতে বাধাদানকারীর মত বড় জালেম আর অন্য কেউ নেই।

ধর্মপ্রাণ যুবক বন্ধু! ধর্মীয় অনুভূতি অধিক জাগ্রত হলে জোশে নয়, বরং হুশ দ্বারা কাজ নিতে হবে। সুতরাং নিশ্চয়ই 'মশা মারতে কামান দাগা' চলবে না। 'ধরে আনতে বললে, মেরে আনা' অবশ্যই বৈধ হবে না।

হজ্জ করতে গিয়ে কুরবানীর দিন তথা তার পরের আরো ৩ দিন পাথর মারার স্থানে পাথর মারতে হয়। কিন্তু আবেগবশে অনেকে যেন শয়তানকে সামনে পেয়ে জোশে ও রোষে নির্দিষ্ট সংখ্যার অধিক অথবা নির্দিষ্ট সাইজের অধিক বড় পাথর মারে। কেউ কেউ পায়ের জুতা এবং মাথার ছাতাও ছুঁড়ে মারে! আর সেই সাথে অন্যান্য হাজীদের প্রতিও 'যুদ্ধং দেহি' ভাব দেখিয়ে কঠোরতা ও বলবত্তা প্রদর্শন করে থাকে।

অথচ কুরবানীর দিন পাথর মারার সময় মহানবী ﷺ পাথর কুড়াতে আদেশ দিলে সাহাবাগণ তাঁকে সাতটি পাথর কুড়িয়ে দিলেন। তিনি বড় বড় পাথর না মারার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, "তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা থেকে দূরে থাক। কারণ ঐ বাড়াবাড়িই তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে।" *(আহমাদ ১/২১৫, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ৩০২৯ নং)*

মামুলী ধরনের ছোটখাট ইজতেহাদী মসলা-মাসায়েল নিয়েও দ্বন্দ্বের সাথে উগ্র মনোভাব দেখা যায় বহু যুবকের। অন্ধ পক্ষপাতিত্ববশে প্রতিপক্ষের আলেম বা লোকেদেরকে 'পিটিয়ে দাও, মার ছাড়া ওষুধ নেই' ইত্যাদি বলে অনেক সময় তা কাজেও পরিণত করা হয়। প্রতিপক্ষ হকপন্থী হলেও তা মানতে চায় না মারমূর্তি গর্বিত কিছু যুবক দল।

১৪১৮ হিজরী সনে বোম্বাই মাহিমের বেলালী মসজিদে একবার ইমামতি করতে গিয়ে মাগরিবের নামাযে প্রথম রাকআতে সূরা মাউন এবং পরের রাকআতে ভুলক্রমে সূরা ফীল পড়ে ফেলে নামায শেষ করেছি। সালাম ফিরতেই সকলে এক বাক্যে বলে উঠল, 'নামায নেহী হুই। দুহরাকে পঢ়ী জায়ে!' আমি বললাম, 'মুসহাফের তরতীব অনুযায়ী কিরাআত জরুরী নয়। অতএব নামায শুদ্ধ। ইমাম সাহেব মেম্বরের উপরে রাখা 'বেহেশ্তী যেওর' নিয়ে খুলে এক জায়গায় পড়ে বললেন, 'আপকো সিজদায়ে সহু কর্ লেনা চাহিয়ে থা। ওয়াজিব ছুটনে সে সিজদায়ে সহু জরুরী হোতা হ্যায়।' আমি বললাম, 'মুসহাফের তরতীব অনুযায়ী সূরাগুলো নামাযে পাঠ করা যে ওয়াজিব, তা আগে প্রমাণ করুন, তবেই তো।'

যাই হোক, ইমাম সাহেব পরিশেষে মেনে নিয়ে সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, 'কোয়ী বাত নেহী, নামায হো গয়ী হ্যায়।'

মসলাটির ব্যাপারে আমার ভিতরে এবং বাহ্যিক কথাবার্তায় এমন জোর ছিল যে, আমি হেরে যাব বা আমি ভুল করেছি, তা আমি ভাবি ও প্রকাশ করিনি। কিন্তু কি যেন এক ভয়ে আমার জানটা টিপ্‌টিপ্ করছিল কতক উদীয়মান যুবকের ভাবমূর্তি ও ফিস্‌ফিসানি দেখে। অবশেষে সকলে প্রস্থান করলেও এক রাগমূর্তি যুবক ব্যাপারটা এত সহজে মানতে না পেরে আমাদের রুমে এল। আমার এক বন্ধু তাকে বুঝিয়ে বলতে গেলে চোখ রাঙা করে হিরোর মত 'ঘুসি' দেখিয়ে বলে উঠল, 'তু কিয়া সমঝতা হ্যায় বে! তু চুপ, অরনা মার দুঙ্গা!' অতঃপর কোন রকম তাকে সামলানো হয়েছিল।

সশব্দে 'আমীন'-বিরোধী কোন মসজিদে জোরে 'আমীন' বললেও প্রায় ঐ একই পরিস্থিতির উদ্ভব হয় বহু জায়গায়। এতে নাকি তাদের মসজিদ নাপাক হয়ে যায়। তাই জোরপূর্বক ধোয়াও করায় অনেক জায়গায়! আর এই রূপই ছোটখাট বহু মসলা-মাসায়েল নিয়ে দাঙ্গা বাধাতে চায় বহু সন্ত্রাসমনা উগ্র যুবকদল। কাদা ছুড়াছুড়ি করে সেই নিয়ে গৃহদ্বন্দ্ব বাধায় এক শ্রেণীর বাতিল পন্থীও।

ইসলামের ভিতরেও নানা মত, নানা দ্বন্দ্ব। কিন্তু যুবক ও সত্যানুসন্ধানীরূপে তোমার কর্তব্য হল, ঠান্ডা মাথায় সত্য অনুসন্ধান করে তার অনুসরণ করা। মহান আল্লাহ বলেন, "অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাগণকে, যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে অতঃপর যা উত্তম তা গ্রহণ করে। ওরাই হল তারা, যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত করেছেন এবং ওরাই হল জ্ঞানী লোক।" *(সূরা যুমার ১৭- ১৮ আয়াত)*

আর প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "মুফতীরা তোমাকে ফতোয়া দিলেও তুমি তোমার হৃদয়ের কাছেও ফতোয়া নাও।" *(মিশকাত ২৭৭৪ নং)* অর্থাৎ, বিতর্কিত বিষয়ে তোমার বিবেককেও জিজ্ঞাসা কর যে, কোন্ বা কার ফতোয়াটি সঠিক হতে পারে?

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর ছাড়া সমস্ত রকমের অন্ধ-ভক্তি ও অন্ধ-পক্ষপাতিত্ব বর্জন করে প্রয়োজনে বিপক্ষের সাথে সৌজন্যমূলক তর্কে লিপ্ত হতে পার। কিন্তু তাতে গরম হয়ে 'মারামারি' কেন সৃষ্টি হবে? দলীল ও যুক্তির কাজ কি হাত বা লাঠি করতে পারবে?

সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান কালেও হিকমত নিয়ে চলা জরুরী। কারণ, "নিজেকে লাঞ্ছিত করা কোন মুমিনের উচিত নয়। ক্ষমতার অধিক কষ্ট বরণ করা তার জন্য অনুচিত।" *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৭৭৯৭ নং)*

অতএব কোন কুকাজ বন্ধ করার সময়ে যে পর্যায়ক্রম আছে তা পালনীয়। হাত ও ক্ষমতা দ্বারা না পারলে মুখ দ্বারা, হিকমতের সাথে উপদেশ দ্বারা কুকাজ বন্ধ কর। তাতে সমর্থ না হলে, সেখানে তোমার অপমান হওয়া বা জীবন যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে অথবা ঐ পাপের চাইতে বড় পাপ সংঘটিত হওয়ার ভয় থাকলে, সে ক্ষেত্রে জোরপূর্বক বল বা বক্তৃতা প্রয়োগ করতে ইসলাম স্বীকৃতি দেয় না। যেমন গান-বাজনা বন্ধ করতে গিয়ে যদি খুনাখুনির আশঙ্কা থাকে, তাহলে অবশ্যই গান-বাজনা থেকে বড় পাপ হল খুন-দাঙ্গা। অতএব তাতে বাধা দিতে যাওয়া তোমার আদৌ উচিত নয়। নচেৎ, তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও হবে আরো গুরুতর।

পক্ষান্তরে যেখানে প্রাণ হত্যার অনুমোদন বা আদেশ আছে, সেখানেও যে কেউ সেই 'দন্ডবিধি' প্রয়োগ করতে পারে না। কারণ, শাসন কর্তৃপক্ষ (সরকার) ছাড়া সে 'দন্ড'

কার্যকর করাতে রয়েছে বিপরীত ফল।

তাছাড়া কোন মুসলিম যদি অসৎ কাজ করে, তবে তা দেখেই তাকে 'কাফের' বলে আখ্যায়ন করা বৈধ নয়। বৈধ নয় তার সাথে 'কাফের' মনে করে ব্যবহার। কারণ, কোন মুসলিমকে কাফের বলার ব্যাপার ততটা সহজ নয়, যতটা সহজে মানুষ তার বিষ-জিভ প্রয়োগ করে থাকে। কেন না, সে প্রকৃতপক্ষে কাফের না হলে, বক্তা নিজে কাফেরে পরিণত হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, কাফের জ্ঞান করেই কোন মুসলিম ইমাম বা রাষ্ট্রনেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা এবং তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা আদৌ বৈধ নয়।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, তথাকথিত বহু ইসলামী চিন্তাবিদ্‌ই ইসলামে মানসিক সন্ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছে। যার ফলে আজ ইসলামের আসল রূপ চাপা পড়ে বহু মানুষ এ দ্বীনকে সন্ত্রাসের দ্বীন বলে মনে করে। এই মানসিক সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়েছে ইসলামের ইতিহাসের প্রারম্ভেই সাহাবাবর্গের প্রতি। ইসলামের নামে ইসলামের দুশমন ও মুনাফিকরা উক্ত সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করে ঘটিয়েছে কত অশুভ ও অবাঞ্ছিত সংঘর্ষ ও গৃহযুদ্ধ। শহীদ হয়েছেন ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার ﷺ, তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান ﷺ এবং চতুর্থ খলীফা হযরত আলী ﷺও।

হযরত আলী ﷺকে এক অতিরঞ্জনকারী দল ভক্তির আতিশয্যে নিজেদের 'ইলাহ' (উপাস্য) মেনে নিয়েছিল। অপর দিকে আর একটি দল নিজেদের অতিরঞ্জিত দ্বীনদারীর ফলশ্রুতিতে তাঁকে 'কাফের' মনে করে বসেছিল!

উক্ত দলটির ব্যাপারে মহানবী ﷺ অহীলব্ধ ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন যে, "অচিরেই শেষ যামানায় একটি নির্বোধ যুব-দল হবে, যারা লোক সমাজে সবার চাইতে উত্তম কথা বলবে। কিন্তু ঈমান তাদের গলদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা এদেরকে যেখানেই পাবে, সেখানেই হত্যা করে ফেলবে। যারা তাদেরকে হত্যা করবে, তারা কিয়ামতে পুরস্কৃত হবে।" *(বুখারী ৩৬৫৪, মুসলিম, মিশকাত ৩৫৩৫ নং)*

এই দল হযরত আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। তাদের যে তিনটি সন্দেহ ও অভিযোগ ছিল হযরত ইবনে আব্বাস তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিলে তাদের মধ্যে চার হাজার লোক হক পথে ফিরে আসে। অবশিষ্ট লোকেরা যুদ্ধ বরণ করে নেয় এবং আমীরুল মু'মিনীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অনেকে প্রাণ হারায়।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি শাসকের আনুগত্য থেকে বের হয়ে এবং জামাআত থেকে পৃথক হয়ে মারা যাবে সে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের মরণ মরবে।

যে ব্যক্তি অন্ধ ফিতনার পতাকাতলে (হক-নাহক না জেনেই) যুদ্ধ করবে, অন্ধ পক্ষপাতিত্ব বা গোঁড়ামির ফলে ক্রুদ্ধ হবে অথবা অন্ধ পক্ষপাতিত্বের প্রতি আহ্বান করবে অথবা অন্ধ পক্ষপাতিত্বকে সাহায্য করবে, অতঃপর সে খুন হলে তার খুন জাহেলিয়াতের খুন।

আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের বিরুদ্ধে তরবারি বের করে ভালো-মন্দ সকল মানুষকে হত্যা করবে এবং তার মুমিনকেও হত্যা করতে ছাড়বে না, চুক্তিবদ্ধ মানুষের চুক্তিও পূরণ করবে না, সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয় এবং আমিও তার দলভুক্ত নই।" *(মুসলিম ১৮৪৮ নং)*

বর্তমান বিশ্বেও বহু চিন্তাবিদ্ রয়েছেন যাঁদের কলমের খোঁচায় অথবা বক্তৃতার ফিন্‌কিতে এমন মানসিক সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়ে আছে, যার ফলে মৃত সাহাবাদের কবর উড়িয়ে দিতে এবং বহু ইসলামী রাষ্ট্রকে উৎখাত করতে সন্ত্রাসীরা আনন্দবোধ করবে; বরং এতে আল্লাহর নিকট বৃহৎ প্রতিদানের আশাও করবে!

এই তো সেদিনকার কথা। এক উগ্র যুবক একজন দ্বীনের হকপন্থী আলেমকে তাঁর বাসাতে প্রবেশ করে নৃশংসভাবে হত্যা করার পর 'শহীদ' (?) হওয়ার আশায় পুলিসের হাতে আত্মসমর্পণ করে তাকেও হত্যা করে দিতে বলে। কারণ, কোন সন্ত্রাসী জামাআতের এই শিক্ষা ছিল যে, একজন ওয়াহাবীকে খুন করতে পারলে বা তার হাতে খুন হতে পারলে জান্নাতী ও 'শহীদ' হওয়া যায়!

সন্ত্রাসকে এমনভাবে সুশোভিত করা হয় যে, যুবক তা বুঝে উঠতে না পেরে শামিল হয়ে যায় সেই দলে ইসলামের খাতিরে। অথচ সে পথ যে, ইসলামকে রক্ষা করার পথ নয়; বরং তা আরো ধ্বংস করার পথ তা বিভিন্ন আড়ম্বরের ফলে বুঝে উঠতে পারে না।

বলা বাহুল্য ইসলাম সন্ত্রাস থেকে বহু দূরে। সন্ত্রাসের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং যদি কোন মুসলিম ধর্মের নামে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে থাকে, তাহলে এ কথা মানতেই হবে যে, সে সরল ও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত এবং সালাফী চিন্তাধারা ও দাওয়াত-পদ্ধতি হতে বহু দূরে অবস্থিত।

ইসলামে জিহাদ আছে। তবে জিহাদ ও সন্ত্রাস এক নয়। যেখানে সেখানে ২/ ১টি ঢিল মেরে দিয়ে কয়েকটা মশা-মাছি মারার নাম জিহাদ নয়। এখানে-ওখানে ২/ ১টি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কিছু সংখ্যক নিরপরাধ মানুষকে খুন করার নামও জিহাদ নয়। যেমন ব্যক্তিগত, গ্রামগত, পার্টিগত, মাঠগত বা খেলাগত কোন বিবাদকে সাম্প্রদায়িকতার রূপ দিয়ে দাঙ্গা করার নামও জিহাদ নয়।

জিহাদ হল তা-ই, যা একমাত্র ইসলামের কলেমাকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে করা হয়। ধন ও নেতৃত্ব লোভ ও লাভের উদ্দেশ্যে যা করা হয়, তা জিহাদ নয়।

জিহাদের জন্য মুসলিম ইমাম (নেতা, ফাসেক হলেও) জরুরী। ইমাম ছাড়া ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোন লড়াই লড়া ঐ জিহাদ নয়। মহানবী ﷺ বলেন, "ইমাম তো ঢাল স্বরূপ; তারই আড়ালে থেকে লড়াই লড়া হয়।" *(বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, সহীহুল জামে' ২৩২১, ২৩২২ নং)*

জিহাদ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে ফরয করা হয়েছে ইসলামে। জিহাদ জিহাদের ময়দানেই সীমাবদ্ধ থাকবে। বেসামরিক লোকদেরকে হত্যা করা যাবে না জিহাদে। কোন দূত হত্যা করা যাবে না তাতে। বৃদ্ধ, নারী ও শিশু হত্যা করা যাবে না। শত্রু পক্ষের ফসল নষ্ট করা যাবে না। অপ্রয়োজনে বাড়ি-ঘর জ্বালানো যাবে না এবং উপাসনালয় নষ্ট করা যাবে না।

সুতরাং যে মার-দাঙ্গাতে ইসলামী উদার-নীতির লংঘন হয়, তা জিহাদ নয়।

পক্ষান্তরে আত্মরক্ষার নাম সন্ত্রাস নয়। ইসলামী রাষ্ট্রকে যালেমদের যুলুম থেকে রক্ষাকল্পে রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিরক্ষামূলক তৎপরতার নাম সন্ত্রাস নয়। শির্ক, অরাজকতা, স্বৈরাচার, অনাচার এবং অনধিকার বিদ্রোহ দমন করার নাম সন্ত্রাস নয়। সন্ত্রাসবাদ, আগ্রাসনবাদ, আল্লাহ-দ্রোহিতা দমন ও নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে এবং মুসলিম জাতির সম্মান ও সম্পদ

রক্ষার্থে কৃত সংগ্রামের নাম সন্ত্রাস নয়। স্বাধীনতার স্বাধিকার আদায় করার পথে কৃত সংগ্রামের নাম সন্ত্রাস নয়। এ ছাড়া পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস-ঝড় সৃষ্টি করে মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দিলে তার জন্য দায়ী মুসলিমরা নয়।

বিপ্লবী যুবক বন্ধু আমার! তবে আবারো জেনে রাখ যে, এই শ্রেণীর জিহাদ মুসলিম নেতৃত্ব ছাড়া হয় না। ব্যক্তিগতভাবে পার্টিগত দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে অস্ত্র নিয়ে দাঙ্গা করার নাম জিহাদ নয় এবং রাজনৈতিক গদি-দখলের লড়াই-এ হত ব্যক্তি আল্লাহর নিকট 'শহীদ' নয়।

হয়তো বলবে, ইসলামে কি রাজনীতি নেই? হ্যাঁ, ইসলামে রাজনীতি অবশ্যই আছে। তবে ইসলামে আছে ইসলামী রাজনীতি; কোন অনৈসলামী রাজনীতি নয়।

ইসলামে নবী-রসূলগণও রাজ্য-শাসন করে গেছেন। রাজ-কার্য পরিচালনা করে গেছেন বেহেশ্তের সুসংবাদ-প্রাপ্ত খলীফা ও সাহাবাগণ। আর সে রাজনীতির নীতি-রচয়িতা ও আইন-প্রণেতা হলেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। এর নীতি-শাস্ত্র হল কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ। কারণ, আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম ও বিধান চলতে পারে না। তাঁর আইন ছাড়া আর কারো আইন -কোন মানব-রচিত আইন- নির্ভুল, নির্ভরযোগ্য ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। "সকল কর্তৃত্ব আল্লাহরই।" *(সূরা আনআম ৫৭ আয়াত)* "সতর্ক হও! সুবিচার তাঁরই এবং তিনি সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।" *(ঐ ৬৩ আয়াত)* "বিধান দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই।" *(সূরা ইউসুফ ৪০ আয়াত)*

হযরত ইয়াকূব (আঃ) তাঁর পুত্রদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি না। বিধান আল্লাহরই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং যারা নির্ভর করতে চায় তাদেরও উচিত, তাঁরই উপর নির্ভর করা।" *(ঐ ৬৭)*

মহান আল্লাহ বলেন, "তবে কি ওরা অজ্ঞ (জাহেলী) যুগের বিচার-ব্যবস্থা কামনা করে? নিশ্চিত বিশ্বাসী (মু'মিন) সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ অপেক্ষা কে অধিকতর উত্তম মীমাংসাদাতা আছে?" *(সূরা মাইদাহ ৫০ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহই হলেন মীমাংসাদাতা (বিধানকর্তা) এবং যাবতীয় নির্দেশ ও বিধান তাঁরই।" *(আবূ দাউদ ৪৯৫৫, নাসাঈ ৫৪০২, হাকেম, সহীহুল জামে' ১৮৪৫ নং)*

ইসলামে মুনাফেকীর রাজনীতির অস্তিত্ব নেই। সাম, দান, ভেদ ও দন্ড -এই চার প্রকার নীতি নিয়ে অন্যায়ভাবে অসঙ্গত সমতা সাধন, অন্যায় ও অসৎভাবে অর্থ দান বা ব্যয়করণ, অন্যায় ও অবৈধভাবে একটি সংহতিপূর্ণ গোষ্ঠীর মাঝে বিবাদ সৃষ্টি করে ভেদ আনয়ন এবং অন্যায় ও স্বৈরাচারিতার সাথে কোন সম্প্রদায়কে দন্ড প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে গদি টিকাবার রাজনীতি ইসলামে নেই।

আমেরিকান, ইউরোপীয় বা কোন মানব-রচিত নীতির রাজনীতি ইসলামে নেই। ইসলামে কোন দলাদলি নেই, নেই কোন জাতীয়তাবাদ। এক দল অপর দল বা বিরোধী দলের উপর খামাখা দোষ চাপিয়ে নিজের ফায়দা লুটার রাজনীতি, কাদা ছুঁড়াছুঁড়ির রাজনীতি, আত্মহত্যা, খুন ও ভাঙ্-চুরের রাজনীতি, বিক্ষোভ প্রদর্শনে ধ্বংসলীলা ও ধর্মঘট বা হরতালে জন-জীবন ব্যাহত ও অচল করার রাজনীতি ইসলামে নেই, কোন সভ্য সমাজে নেই।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পার্টাপার্টি করে অন্তর্দ্বন্দ্বে ও আত্মকলহে লিপ্ত হয়ে মুসলিম জাতি

নিজেকে ছিন্নভিন্ন করতে পারে না। ভোটাভোটির সাথে লাঠালাঠি করে দেশ ও দশের তথা স্বজাতির ক্ষতি করতে কোন মুসলিম পারে না। এমনিতে রাজনীতির ধারাই এমন যে, কেউ দেশের স্বার্থে পার্টি করে মাটি হয়। আর কেউ নিজের স্বার্থে পার্টি করে প্রপার্টি বানিয়ে হয়ে যায় খাঁটি সোনা! কেউ নেচে মরে, আর কেউ ঝুলি ভরে। রাজনীতির এই ব্যাপক প্রভাবে আজকের যুবকরা খুব বেশী প্রভাবান্বিত।

হকপন্থী তারা, যাদের নিকট হক আছে; যদিও তারা সংখ্যালঘু। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার পূজারী নয়। কারণ, এ পূজা কুরআনে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, "যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথা মত চল, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে। তারা কেবল কল্পনারই অনুসরণ করে এবং কেবলমাত্র অনুমানই করে থাকে।" *(সূরা আনআম ১১৬ আয়াত)*

"তুমি বল, মন্দ ও ভালো এক বস্তু নয়, যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে মুগ্ধ করে। সুতরাং হে জ্ঞানবান সকল! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।" *(সূরা মাইদাহ ১০০ আয়াত)*

একটি চিরবাস্তব এই যে, এ সংসারে ভালোর সংখ্যা কম, মন্দের সংখ্যা বেশী। এ বাস্তব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে। মহান আল্লাহ বলেন, "তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই ঈমান আনবে না।" *(সূরা ইউসুফ ১০৩ আয়াত) এ মর্মে আরো দেখ, (২/১০০, ১১/১৭, ১২/১০৬, ১৩/১, ১৬/৮৩, ১৭/৮৯, ২৫/৫০, ৩৬/৭, ৪০/৫৯)*

"অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।" *(সূরা বাক্বারাহ ২৪৩ আয়াত) এ মর্মে আরো দেখ, (৭/১৭, ১০/৬০, ১২/৩৮, ২৭/৭৩, ৪০/৬১)*

"আমার বান্দাগণের মধ্যে কম সংখ্যক লোকই কৃতজ্ঞ।" *(সূরা সাবা' ১৩ আয়াত)*

এ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই হকের ব্যাপারে অবুঝ ও অজ্ঞ। এ প্রসঙ্গ কুরআন মাজীদে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ দেখ, *(৫/১০৩, ৬/৩৭, ৬/১১১, ৭/১৩১, ৭/১৮৭, ৮/৩৪, ১০/৫৫, ১২/২১, ১২/৪০, ১২/৬৮, ১৬/১৮, ১৬/৭৫, ১৬/১০১, ২১/২৪, ২৫/৪৪, ২৭/৬১, ২৮/১৩, ২৮/৫৭, ২৯/৬৩, ৩০/৬, ৩০/৩০, ৩১/২৫, ৩৪/২৮, ৩৪/৩৬, ৩৯/২৯, ৩৯/৪৯, ৪০/৫৭, ৪৪/৩৯, ৪৫/২৬, ৫২/৪৭)*

(আগামী হযরত ঈসার যুগ ছাড়া) প্রত্যেক যুগে পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই সত্যত্যাগী ফাসেক। এ মর্মে দেখ, *(৫/৫৯, ৪৩/৭৮, ৩/১১০, ৭/১০২, ৯/৮, ২৩/৭০)*

সুতরাং বুঝতেই তো পারছ বন্ধু! অধিকাংশ মানুষকে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী, কৃতজ্ঞ না করা পর্যন্ত, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সমঝদার ও জ্ঞানী না হওয়া পর্যন্ত এবং বেশীরভাগ মানুষ সত্যানুসারী না হওয়া পর্যন্ত বর্তমানের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা সহজ নয়।

মহানবী ﷺ বলেন, "মুষ্টিমেয় লোক নিয়ে পৃথিবীতে ইসলামের সূচনা হয়েছিল। তার সমাপ্তিও হবে অনুরূপ। সুতরাং সুসংবাদ সেই মুষ্টিমেয় লোকদের জন্য।" *(মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ১৫৮০ নং)*

যুবক বন্ধু আমার! দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের মন রক্ষা করে চলার রাজনীতি ইসলামে নেই। ইসলামের যাবতীয় নীতি হল কেবল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যম। অতএব অধিকাংশ

মানুষ বাতিলপন্থী হলে তাদের মন যোগিয়ে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করার মত দুঃসাহসিকতাপূর্ণ রাজনীতি মুসলিম করতে পারে না।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি লোকেদেরকে অসন্তুষ্ট করেও আল্লাহর সন্তুষ্ট অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তির জন্য লোকেদের কষ্টদানে আল্লাহই যথেষ্ট হন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে লোকেদের সন্তুষ্টি খোঁজে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ লোকেদের প্রতিই সোপর্দ করে দেন।" *(তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৩১১নং)*

যুবক ভাই আমার! যুবকের জীবন হওয়া উচিত তিনটি নৈতিকতার সমষ্টি। অর্থাৎ, তার জীবনে থাকবে রাব্বানী, সালাফী ও হারাকী কর্মসূচীর ভারসাম্যপূর্ণ তৎপরতা। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় দ্বীনী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার ঘটানো, যথাসাধ্য দ্বীনের খিদমত করা এবং সলফে সালেহীনদের তরীকা অনুযায়ী দ্বীন প্রতিষ্ঠাকল্পে আমরণ সংগ্রাম করার স্পৃহা ও আন্দোলন থাকবে তার হৃদয়-মনে।

পক্ষান্তরে কেবল রাব্বানিয়াত ও রূহানিয়াত থাকলে সে নিছক সূফীবাদী হয়ে পড়বে। কেবল হারাকী হলে নিছক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়ে উঠবে। অন্যথা সালাফিয়াত ছাড়া উভয়ের কোন মূল্যই নেই। আবার রাব্বানিয়াত ও সালাফিয়াত ছাড়া কোন রাজনীতি, কোন আন্দোলন সঠিক ইসলামী আন্দোলন নয়। বরং তা হয়তো ব্যক্তিপূজা ও গদিপূজার আন্দোলন।

বলা বাহুল্য উক্ত তিন উপাদান-সমষ্টির ব্যক্তিত্ব হল 'কামেল' ব্যক্তিত্ব। এমন ব্যক্তিত্বই ছিল সলফে সালেহীনদের।

তবে বন্ধু একটি কথা এখানে অবশ্যই মনে রেখো যে, রাজনীতি ত্যাগ করাও এক রাজনীতি। বরং রাজনীতি দিয়ে ইসলামী দাওয়াতের কাজ শুরু করা হিকমতের কাজ নয়; আম্বিয়াগণের তরীকাও তা নয়। মহানবী ﷺ মক্কাতে রাজা হননি। কুরাইশরা তাঁকে রাজা করতে চাইলেও তিনি জানতেন যে, তা আল্লাহর দ্বীন প্রচারে সহায়ক নয়। রাজ্য হাতে পেয়ে প্রজার উপরে জোরপূর্বক ইসলাম চাপিয়ে দিবেন -তাও সম্ভব ছিল না। আশঙ্কা ছিল বিদ্রোহ সৃষ্টির। অতএব তখন প্রয়োজন ছিল তরবিয়ত ও মানুষ তৈরীর।

নও মুসলিম ডক্টর জন পার্কস তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'ইসলাম সম্বন্ধে কাউকে বোঝাতে চাইলে ধৈর্য ধরুন, ধীরে ধীরে সময় নিয়ে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ইনফরমেশন দিন। রাজনীতিকে দূরে ঠেলে রাখবেন এ সময়ে। তাহলে ভুল বোঝাবুঝি থেকে রক্ষা পাবেন।' *(মাসিক দারুস সালাম, ফেব্রুয়ারী ২০০০, ২৪পৃঃ)*

যুবক বন্ধু আমার! সীরাতের আলোকে মুসলিমদের বিভিন্ন সমাজ আছে। মক্কী, হাবশী, মাদানী প্রভৃতি। মক্কী সমাজে বসবাস করে মাদানী সমাজের কার্যকলাপ চালাবে -তা তো হিকমতের কাজ নয় বন্ধু! ইসলামের জন্য মাথা দেওয়ার মত তোমার স্পৃহা আছে, তুমি ইসলামের জন্য মাথা দাও। কিন্তু তার আগে খতিয়ে অবশ্যই দেখে নাও যে, আসলে তোমার মাথা দেওয়াতে সত্যপক্ষে ইসলামের কোন লাভ আছে, নাকি ক্ষতি।

হ্যাঁ, আর কাফেরদের অপপ্রচারে তুমি নিরাশ হয়ো না ভাই! তাদের বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিমদের বদনাম করার জন্য যে সব শব্দ ব্যবহার করে থাকে, তাতে তোমার

বিব্রত হওয়ার কিছু নেই। দুশমন তো। তারা নখে পারলে কোদাল চায় না। তোমার মঙ্গল কোন দিন চাইবে কি তারা? 'মৌলবাদ' 'মোল্লাতন্ত্র' প্রভৃতি শব্দ তাদের তূণের এক একটি দিব্যাস্ত্র। মানুষের মাঝে আল্লাহর বিধান সম্পর্কে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তথাকথিত মুসলিম বুদ্ধিজীবীরাও এই ধরনের শব্দ বেছে নিয়ে প্রচার করে থাকে! আল্লাহর বিধানকে এরা চিরাচরিত প্রথা মনে করে। মনে করে, এ হল অশিক্ষিত মানুষের আনা কুসংস্কার! ভাবে, এ হল সামাজিক রক্ষণশীলতা!! অহীর আলোহীন তাদের ঐ পাশ্চাত্য দেমাগে মনে করে তাদের পথটাই সঠিক। মহান আল্লাহ ঐ ধরনের এক শ্রেণীর লোকের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, "তুমি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যাদেরকে গ্রন্থের এক অংশ দেওয়া হয়েছে, তারা প্রতিমা ও শয়তানকে মান্য করে এবং কাফেরদেরকে বলে যে, মু'মিনদের তুলনায় তারাই অধিকতর সুপথগামী! এদেরই প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। আর আল্লাহ যাকে অভিসম্পাত করেন, তুমি তার জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না।" *(সূরা নিসা ৫১-৫২ আয়াত)*

আর 'মৌলবাদ'-এর দু'টো দিক। প্রথম হল সব কিছুতে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি এবং তার সঙ্গে উগ্রতা ও সহিংসতাও। এমন মৌলবাদের সাথে ইসলামের নিকট অথবা দূরের কোন সম্পর্ক নেই। অবশ্য দ্বিতীয় দিকটা হল, মৌলনীতির অনুসরণ (ঈমানসহ আমল) করা। আর এ অর্থে প্রত্যেক মুসলিমকে 'মৌলবাদী' হওয়া জরুরী। নচেৎ সে মুসলিমই থাকবে না।

যুবক বন্ধু আমার! মৌলবাদী খেতাব নিয়ে তুমি গর্বিত হও। তোমার মূল আছে বলেই তুমি মৌলবাদী। আর যার মূল নেই, কেবল কান্ড ও ডাল-পাতা আছে, তার বাহ্যিক রূপ ক'দিনের? মূলহীন কান্ড ও ডাল-পাতা হল প্রাণহীন। আর প্রাণহীন হল শুষ্ক ইন্ধন। এরা দোযখের ইন্ধন। পক্ষান্তরে যার মূল আছে, তার সজীব কান্ডও আছে, তরোতাজা ডাল-পাতা, ফুল-ফলও আছে।

"তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ কিভাবে কালেমা ত্বাইয়েবা (পবিত্র বাক্যে)র উপমা দেন, যেমন উৎকৃষ্ট (পবিত্র) বৃক্ষ; যার মূল সুদৃঢ়, যার শাখা-প্রশাখা গগনস্পর্শী। তার প্রতিপালকের ইঙ্গিতে সে অহরহ ফলদান করে। আর আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

পক্ষান্তরে অপবিত্র বাক্যের উপমা অপবিত্র বৃক্ষ; যার মূল মাটি থেকে উপড়ে নেওয়া হয়েছে, যার কোন স্থিতি নেই। আল্লাহ মু'মিনদেরকে সুদৃঢ় বাক্য দ্বারা সুদৃঢ় করেন, ইহকালে এবং পরকালে। আর আল্লাহ যালেমদেরকে পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।" *(সূরা ইবরাহীম ২৪-২৭ আয়াত)*

অতএব তুমি কার প্রশংসা পছন্দ কর? বেদ্বীন কাফেরদের, নাকি তোমার সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর?

পরিশিষ্ট

যুবক বন্ধু আমার! পরিশেষে আশা করব যে, তুমি সেই যুবকদলের অন্তর্ভুক্ত হবে, যারা নিজেদের যৌবনকাল আল্লাহর আনুগত্যে অতিবাহিত করে কাল কিয়ামতের ছায়াহীন রৌদ্রতপ্ত মাঠে আল্লাহর আরশের ছায়ার নিচে স্থান পাবে।

বহু কথাই তো জানলে। এবারে দরকার হল, তা আমলে পরিণত করা, উপদেষ্টার উপদেশ গ্রহণ করা। মহান আল্লাহ বলেন, "যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং তা উপেক্ষা করবে সেই, যে নিতান্ত হতভাগ্য।" *(সূরা আ'লা ১০-১১ আয়াত)*

প্রীতিভাজন বন্ধু! এখনো সময় আছে। তওবার দরজা খোলা আছে এখনো। যদি তুমি কোন কুপথে ভ্রষ্ট থাক, তাহলে সুপথে ফিরে এস। মহান স্রষ্টা ডাক দিয়ে বলেন, "(হে নবী!) তুমি বল, যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ, তারা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেবেন, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়। তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর। শাস্তি এসে পড়লে সাহায্য পাবে না। তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে শাস্তি আসার পূর্বেই তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালক হতে যে উত্তম কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ কর। যাতে কাউকে বলতে না হয়, হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি তো শৈথিল্য করেছি এবং আমি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতাম। অথবা কেউ যেন না বলে, আল্লাহ আমাকে পথপ্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই সংযমীদের অন্তর্গত হতাম। অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেন কাউকে বলতে না হয়, আহা! যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন হত, তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হতাম। (আল্লাহ বলবেন,) বরং নিশ্চয় তোমার নিকট আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল; কিন্তু তোমরা তো তা মিথ্যা মনে করেছিলে, অহংকার করেছিলে এবং অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।" *(সূরা যুমার ৫৩-৫৯ আয়াত)*

বন্ধু আমার! আর তোমার কাছে এই আশা করব যে, তুমি সেই লোকদের দলভুক্ত হবে না, যাদের সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন, "যখন তাকে বলা হয়, তুমি আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার পাপ তাকে অহংকারে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং তার জন্য দোযখই যথেষ্ট। আর নিশ্চয় তা হল নিকৃষ্টতর আশ্রয়স্থল।" *(সূরা বাক্বারাহ ২০৬ আয়াত)*

বরং বিনয়ী হয়ে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে ক্ষমাপ্রার্থী হও এবং তাঁরই একান্ত অনুগত হয়ে যাও। আর তাঁরই পথে, তাঁরই দিকে মানুষকে আহ্বান শুরু করে দাও। ইসলামী পুনর্জাগরণের আন্দোলনে তুমিও শামিল হয়ে যাও। মৃত ও ঘুমন্ত মুসলিম সমাজকে জীবিত ও জাগ্রত করার জন্য তোমার বড় ভূমিকা তুমি পালন কর।

'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।--- '
জাগো হে যুবক ঘরে ঘরে আজি
ওঠরে জাগিয়া ওঠ,
পাপের বন্যায় ডুবিছে মানুষ
বাঁচাও চলরে ছোট।
বেঘোর ঘুমেতে থেকো না সুপ্ত
ওঠ চল ধর হাল,
সময় হয়েছে বাঁচাও ঈমান
ডাকিতেছে মহাকাল।
ঘরে ঘরে জ্বালো নূরের বাতি
ইসলামী তেল ঢেলে,
দূর কর যত শয়তানী আঁধার
ইলাহী প্রদীপ জ্বেলে।
জীবন মানুষ সমাজ গড়
গড়ে তোল তব দেশ,
গ্রাম-শহরে গড়ে তোল সবে
শান্তির পরিবেশ।
যুলুমবাজের স্বার্থ হানো
ওঠ দিয়ে হুঙ্কার,
মুখরিত হোক না'রায়ে তকবীর
'আল্লাহু আকবার।'

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

সমাপ্ত